সত্যের সন্ধানে

দৃঢ়তাই ধর্ম

সৌমিত্র বিশ্বাস

সমবেত ভক্তমণ্ডলী,

আপনাদের প্রত্যেককে আমার যথাযোগ্য প্রণাম ও প্রীতি দিয়ে আজ কিছু বলতে আগ্রহী হয়েছি। মন্দির বলতে শুধু ইট-কাঠ-পাথরের সুরক্ষিত ঘর বোঝায় না, বা মূর্তি, বিগ্রহ মানেই ঈশ্বর না। যে ঘরে বা যেখানে সাধক পরমেশ্বরের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য নিয়মিত আহ্বান করে সেই পবিত্র স্থান বা আসনকে মন্দির বলে; তা সে ঘরও হতে পারে, গাছতলাও হতে পারে। ভেবে দেখুন, শ্রীভগবান যুদ্ধের ময়দানে অর্জুনকে সর্বোচ্চ জ্ঞান দিয়েছিলেন, অর্জুনের হৃদয়ের দুর্বলতা দূর করে আত্মজ্ঞানে তাকে জাগ্রত করেছিলেন। অর্জুনের পবিত্র হৃদয়ের উপরেই শুধু তাঁর কৃপা হয়েছিল। তাই পবিত্র হৃদয় হচ্ছে পবিত্রতম মন্দির। আমি পরমপ্রিয়কে আমার হৃদয়ে আসন দিতে চাই, এই হৃদয়ে তাঁকে আহ্বান করতে চাই। প্রত্যেকে যদি তার আপন হৃদয়কে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে, ভক্তির রঙে রাঙায়িত করে তবে বাইরের এই অট্টালিকায় আর তার প্রয়োজন নেই। শুধু আমার মতো নবীনদের পাকা ঘর, সুন্দর দেয়াল ও আরামদায়ক আসনের দরকার পড়ে তাঁকে আহ্বান জানানোর জন্য। কিন্তু এই প্রয়োজন শুধু সাধনার আরো উচ্চ স্তরে উঠার জন্য, এটা প্রাথমিক সিঁড়ি মাত্র। পৃথিবীর সব মন্দির বা অট্টালিকা চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু প্রাণাধিক প্রিয়কে পাবার আহ্বান জন্ম-জন্মান্তরেও শেষ হবার নয়। কারণ যতদিন মৃত্যু বলে কিছু থাকবে ততদিন ঈশ্বরকে পাবার চেষ্টা অবশ্যই থাকবে।

তাই মন্দিরের ক্ষয়-ক্ষতিকে সাময়িক বাধা হিসেবে গণ্য করে আমরা শপথ নেব এমন মন্দির স্থাপন করার যা কেউ ভাঙ্গতে পারে না, কেউ কেড়ে নিতে পারে না। সেই মন্দিরে যে দ্বীপ জ্বলে তা কেউ নেভাতে পারে না, সেই মন্দিরের বিগ্রহকে কেউ অসম্মান করতে পারে না, সেই মন্দিরের অর্ঘ্য বাজার থেকে কিনতে হয় না, এমন মন্দিরের পূজারীকে আমি নমস্কার জানাই।

আমাদের আজ সময় এসেছে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের, নতুন করে মানদণ্ড ঠিক করার। বিগ্রহ প্রতীক মাত্র, সাধক তাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ না করলে সবচেয়ে সুন্দর বিগ্রহও জড়ত্বের চিহ্নমাত্র। যে ধর্মের নামই সনাতন তাতে যতই সময়োপযোগী পরিবর্তন করা হোক না কেন সনাতন উদ্দেশ্যের বা জীবনের অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না। মত ও পথের বিভিন্নতাই একে কালজয়ী করেছে। মোটরগাড়ীর চাকায় স্প্রিং আছে বলেই তা উঁচু-নীচু রাস্তায় চলতে পারে ও চালককে সুস্থির রাখে। তাই সময়ের দরকার হলে আমরা ঘটে-পটে-ধ্যানে ঈশ্বর কল্পনা করে পূজা করব। তিনি তো সর্বব্যাপী, তাঁকে পুরুষোত্তম এবং সর্বকারণের কারণ মনে করে ভজনা করলে তিনি আমাদের মাঝেও তাঁর কৃপা বিস্তার করবেন। জড়ের দাস না হয়ে জড়কে চেতনমুখী করে, সেবামূলক কর্মের করণ বা যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে সর্বদা আমাদের ব্যস্ত রাখতে পারলে কোন অপশক্তি বা দুর্জন আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারবে না। তাই আবারও বলছি আপনারা বুঝতে চেষ্টা করুন, বিশ্বাস যদি দৃঢ় হয় তবে কোন চোর বা আততায়ীর চুরি বা আঘাতে ব্রহ্মের কোন ক্ষয় হবে না বরং আমরা প্রার্থনা করি ঈশ্বর ওদের সুবুদ্ধি দিয়ে যজ্ঞময় কর্মে নিযুক্ত করুন।

আপনারা আমার প্রণতি গ্রহণ করুন। আমি প্রার্থনা করি, মন্দিরের এই পবিত্র চত্বরে যে মহান উদ্দেশ্যে আপনারা প্রতিনিয়ত সমবেত হচ্ছেন তা একই সাথে প্রতিদিনের জীবনমন্দিরে প্রতিফলিত হোক। ধর্ম-কর্ম করতে হয় তাই করছি এই রকম বদ্ধ ধারণা জীবন বিকশিত হওয়ার পথে অন্তরায়। অসত্য ও অধর্ম থেকে নিবৃত্তি লাভ করে সত্য ও ধর্মে প্রবৃত্তি যাতে হয় তেমন কর্মে বা কর্তব্য কর্মে যিনি নিযুক্ত তিনিই প্রকৃত সাধক। নিত্যকর্মকে অবহেলা করে নয় বরং বিদ্যার্থী বিদ্যাচর্চায় মনোযোগী হয়ে, সংসারী সংসারের কার্যাবলী সম্পন্ন করে যদি অবসর পায়, তবে তখনই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আনন্দ দিতে পারে। অন্যথায় হরিবাসরের আনন্দরূপ আয়নার উপর বকেয়া কাজের জন্য যে দুশ্চিন্তা তার ধুলো পড়বে। অর্জুনকে শ্রীভগবান তাই আগে যুদ্ধ করে কর্তব্য কর্ম পালন করতে বলেছিলেন, জীবনের প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ যেন ত্বরান্বিত হয় সে জন্যই যুদ্ধে নিহত হলেও কোন ক্ষতি হবে না এমন আশ্বাসও দিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে খাদ্যাভাব নয়, দুশ্চিন্তাই আমাদের জীবনীশক্তিকে ক্ষয় করে। তা সত্ত্বেও আমাদের বুঝতে হবে যে দুশ্চিন্তা করার কোন কারণই নেই। দুশ্চিন্তার অন্যতম কারণ হচ্ছে সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতিহীন চাহিদা। কিন্তু চাহিদা পূণরায় নতুন চাহিদার জন্ম দেয় এবং চাহিদার শেষ হিরণ্যকশিপুর মত ভগবান হতে চাওয়ায় যা অহংকারের পরিপূর্ণ রূপ। কিন্তু অহংকারের উল্টো যে বিশুদ্ধ পূর্ণতা তার আস্বাদ গ্রহণের জন্য, পূর্ণময় হওয়ার জন্যই দেহ থেকে দেহের ঘরে সচ্চিদানন্দময় জীবন নামক সুযোগ বার বার আসে। আর এই দেহান্তর জয় করার উপায় হচ্ছে নিষ্কামভাবে কর্মে নিযুক্ত থেকে নিজেকে ব্যস্ত রাখা তাই কবিগুরু বলেছেন, "মৃত্যু অর্থ অন্ধকার নয়, ভোর হয়েছে বলে ক্ষীণ বাতিকে নিভিয়ে দেয়া।" সাপ যেমন তার আপন বিষে আক্রান্ত হয় না আমরাও যেন তেমনি সংসারের মায়ার বিষ দ্বারা আক্রান্ত না হই। জন্ম-মৃত্যু সত্য, মায়া নয়, জন্মে উল্লাসিত ও মৃত্যুতে ব্যাথিত হওয়াই মায়া।

মানুষ স্বভাবের দাস, পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় শ্রম দিলে সে তার কাঙ্খিত ফল পেতে পারে। প্রত্যেকের অবস্থান ও ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আশা বা লক্ষ্য স্থির করলে আশাহতের বেদনা থাকবে না। হঠাৎ দ্রুত কোন পরিবর্তনের সাথে কেউই খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, বরং ধীরে ধীরে উত্তোরণেই জীবন মধুময় হয়। আর চরিত্র গঠন বা সফলতা বলতে এটাই বোঝায়। তাই সমবেত ভক্তমণ্ডলী, জীবন তারই সফল যিনি নিষ্কাম কর্মের আনন্দ উপভোগ করেছেন, যিনি অপরের সুখে সুখী হয়েছেন, যিনি সুস্থ্য শরীর ও মনের অধিকারী হয়েছেন, যিনি হাসিমুখে পরাজয়কে মেনে নিয়েছেন, যিনি অহংকারের কালিতে তার ব্যক্তিত্বকে মলিন করেননি। ধন-দৌলতের বা শিক্ষার বড়াই দিয়ে, অপরকে ঠকিয়ে ও মানুষের মর্যাদাকে ঘৃণা করে সম্পদের পাহাড়ের চিলেকোঠার উপর যিনি স্বগর্বে বাস করছেন তিনি নয়। ধর্ম আমাদের সেই সঠিক পথে নিয়ে যাবে যদি আমরা এই সত্য উপলব্ধি করি। এই কলি বা কলহের যুগে আমাদের ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে, সঠিক মূল্যবোধের পথে চালিত করার জন্য বৃথা তর্কে কালক্ষেপন না করে শাস্ত্রবিহিত কর্মে লিপ্ত থাকা একান্ত কর্তব্য। ভগবদ বাণী জয়যুক্ত হোক। ওঁ শান্তি। শান্তি। শান্তি।

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি

রাজশেখর বসু

যার দ্বারা নিশ্চয়জ্ঞান হয় অর্থাৎ বিশ্বাস উৎপন্ন হয় তার নাম প্রমাণ। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে নানাপ্রকার প্রমাণের উল্লেখ আছে। চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য। সাংখ্যে প্রত্যক্ষ অনুমান ও আপ্তবাক্য (বা শব্দ) এই তিন প্রকার প্রমাণই গ্রাহ্য। অন্যান্য দর্শনে আরও কয়েক প্রকার প্রমাণ মানা হয়।

প্রত্যক্ষ (perception), অনুমান (inference) এবং আপ্তবাক্য (authority) -এই ত্রিবিধ প্রমাণই আজকাল সকল দেশের বুদ্ধিজীবীরা মেনে থাকেন। আপ্তবাক্যের অর্থ- বেদাদিতে যা আছে, অথবা অভ্রান্ত বিশ্বস্ত বাক্য। অবশ্য শেষোক্ত অর্থই বিজ্ঞানী ও যুক্তিবাদীর গ্রহণীয়।

বিজ্ঞানী যখন পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ ক'রে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তথ্য নির্ণয় করেন তখন তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলম্বন করেন। যখন পূর্বনির্ণীত তথ্যের ভিত্তিতে অন্য তথ্য নির্ধারণ করেন তখন অনুমানের আশ্রয় নেন; যেমন, চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবীর গতির নিয়ম হতে গ্রহণ বা জোয়ার-ভাটা গণনা। বিজ্ঞানী প্রধানত প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর নির্ভর করেন, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে তাঁকে আপ্তবাক্য অর্থাৎ অন্য বিজ্ঞানীর সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তও মেনে নিতে হয়।

আদালতের বিচারকের কাছে বাদী-প্রতিবাদীর রেজেস্টারী দলিল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তিনি যখন সাক্ষীদের জেরা শুনে সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন তখন অনুমানের সাহায্য নেন। যখন কোনও সন্দিগ্ধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মত নেন, যেমন রাসায়নিক পরীক্ষকের সিদ্ধান্ত, তখন তিনি আপ্তবাক্য আশ্রয় করেন।

Scientific mentality- এই বহু প্রচলিত ইংরেজী সংজ্ঞাটিকে বাংলায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বলা যেতে পারে। এর অর্থ, গবেষণার সময় বিজ্ঞানী যেমন অত্যন্ত সতর্ক হয়ে এবং সংস্কার ও পক্ষপাত দমন ক'রে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, সকল ক্ষেত্রেই সেই প্রকার বিচারের চেষ্টা। বিজ্ঞানী জানেন যে তিনি যা স্বচক্ষে দেখেন বা স্বকর্ণে শোনেন তাও ভ্রমশূন্য না হতে পারে, তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ এবং অপরাপর বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষে পার্থক্য থাকতে পারে। তিনি কেবল নিজের প্রত্যক্ষ চূড়ান্ত মনে করেন না, অন্য বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষও বিচার করেন। তিনি এও জানেন যে অনুমান দ্বারা, বিশেষত আরোহ (induction) পদ্ধতি অনুসারে যে সিদ্ধান্ত করা যায় তার নিশ্চয় (certainty) সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। বলা বাহুল্য, যাঁরা বিজ্ঞানের চর্চা করেন তাঁরা সকলেই সমান সতর্ক ও সূক্ষ্মদর্শী নন।
পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যতটা ধ্রুব ও অভ্রান্ত গণ্য হত এখন আর তত হয় না। বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন যে অতি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকল্প (hypothesis) ও ছিদ্রহীন না হতে পারে এবং ভবিষ্যতে তার পরিবর্তন আবশ্যক হতে পারে। তাঁরা স্বীকার করেন যে সকল সিদ্ধান্তই সম্ভাবনা (probability) র অধীন। অমুক দিন অমুক সময়ে হবে - জ্যোতিষীর এই নির্ধারণ ধ্রুবসত্যের তুল্য, কিন্তু কাল ঝড়বৃষ্টি হবেই এমন কথা আবহবিৎ নিঃসংশয়ে বলতে পারেন না।

চার পাঁচশ বৎসর পূর্বে যখন মানুষের জ্ঞানের সীমা এখনকার তুলনায় সংকীর্ণ ছিল তখন কেউ কেউ সর্ববিদ্যাবিশারদ গণ্য হতেন। কিন্তু এখন তা অসম্ভব। যিনি খুব শিক্ষিত তিনি শুধু দু- একটি বিষয় উত্তমরূপে জানেন, কয়েকটি বিষয় অল্প জানেন এবং অনেক বিষয় কিছুই জানেন না। যিনি জ্ঞানী ও সজ্জন তিনি নিজের জ্ঞানের সীমা সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত থাকেন এবং তার বহির্ভূত কিছু বলে অপরকে বিভ্রান্ত করেন না।
বিজ্ঞানী এবং সর্বশ্রেণীর বিশেষজ্ঞের উপর জনসাধারণের প্রচুর আস্থা দেখা যায়। অনেকে মনে করে, অধ্যাপক ডাক্তার উকিল এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি নিজ নিজ বিষয়ে সর্বজ্ঞ। কোনও প্রশ্নের উত্তরে যদি বিশেষজ্ঞ 'জানি না' বলেন তবে প্রশ্নকারী ক্ষুন্ন হয়, কেউ কেউ স্থির করে এঁর বিদ্যা বিশেষ কিছু নেই। সাধারণে যেসব বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞকে প্রশ্ন করে তার অধিকাংশ স্বাস্থ্যবিষয়ক, কিন্তু জ্যোতিষ পদার্থবিদ্যা রসায়ন জীববিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেকের কৌতূহল দেখা যায়।

তুচ্ছ অতুচ্ছ সরল বা দুরূহ যেসকল বিষয় সাধারণে জানতে চায় তার কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি। - ধূমপানে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় কি না? পাতি বা কাগজি নেবু কোন্‌টায় ভাইটামিন বেশী? মিছরির ফুড-ভ্যালু কি চিনির চাইতে বেশী? রবারের জুতো পরলে কি চোখ খারাপ হয়? নূতন সিমেন্টের মেঝে ঘামে কেন? উদয়- অস্তের সময় চন্দ্র সূর্য বড় দেখায় কেন? সাপ নাকি শুনতে পায় না? কেঁচো আর পিঁপড়ের বুদ্ধি আছে কি না? দাবা খেললে আর অঙ্ক কষলে বুদ্ধি বাড়ে কি না? বাসন মাজার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে গা শিউরে ওঠে কেন?

যে প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমাধান এখনও হয় নি তার উত্তর দেওয়া অবশ্য অসম্ভব। অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হলেও তা অল্পশিক্ষিত লোককে বোঝানো যায় না, সকল প্রশ্নের উত্তরও অতি দুর্বোধ হতে পারে। যাঁকে প্রশ্ন করা হয় তিনি সবগুলির উত্তর নাও জানতে পারেন। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই প্রশ্নকারীকে যা তা বলে ভোলানো উচিত নয়। যদি উপযুক্ত উত্তর দেওয়ার বাধা থাকে তবে সরলভাবে বরা উচিত, 'তোমার প্রশ্নের উত্তর এখনও নির্ণীত হয় নি।' অথবা 'প্রশ্নটির উত্তর বোঝানো কঠিন' অথবা 'উত্তর আমার জানা নেই।' দুঃখের বিষয়, অনেকে মনে করেন, যা হয় একটা উত্তর না দিলে মান থাকবে না। উত্তরদাতার এই দুর্বলতা বা সত্যনিষ্ঠার অভাবের ফলে জিজ্ঞাসুর মনে অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হয়। আমেরিকান লেখক William Beebe তাঁর `Jungle Peace' নামক গ্রন্থে একটি অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন- These words should be ready for instant use by every honest scientist- `I don't know'

প্রত্যেক বিষয়ে মত স্থির করবার আগে যদি তন্ন তন্ন বিচার করতে হয় তবে জীবনযাত্রা দুর্বহ হয়ে পড়ে। সর্বক্ষণ সতর্ক ও যুক্তিপরায়ণ হয়ে থাকা সহজ নয়। বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানী সকলেই নিত্য নৈমিত্তিক সাংসারিক কার্যে অনেক সময় অপ্রমাণিত সংস্কারের বশে বা চিরাচরিত অভ্যাস অনুসারে চলেন। এতে বিশেষ দোষ হয় না যদি তাঁরা উপযুক্ত প্রমাণ পেলেই সংস্কার ও অভ্যাস বদলাতে প্রস্তুত থাকেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিজ্ঞানী যখন তাঁর গবেষণাক্ষেত্রের বাইরে আসেন তখন তিনিও সাধারণ লোকের মতন অসাবধান হয়ে পড়েন। বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানী সকলেই অনেক সময় কুযুক্তি বা হেত্বাভাস আশ্রয় করেন। আবার সময়ে সময়ে অশিক্ষিত লোকেরও স্বভাবলব্ধ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দেখা যায় এবং চেষ্টা করলে অনেকেই তা আরম্ভ করতে পারেন। অল্পদর্শিতা অসতর্কতা ও অন্ধ সংস্কারের ফলে সাধারণ লোকের বিচারে যেরকম ভুল হয় তার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি:---

যদুবাবু সুশিক্ষিত লোক। তিনি 'ব্ল্যাক আর্ট' নামক ম্যাজিক দেখে এসে বললেন, 'কি আশ্চর্য কাণ্ড! জাদুকর শূন্য থেকে ফুলদানি টেবিল চেয়ার খরগোশ বার করছে, নিজের মুণ্ড উপড়ে ফেলে দু'হাত দিয়ে লুফছে, একটা নরকঙ্কালের সঙ্গে নাচতে নাচতে পলকের মধ্যে সেটাকে সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত করছে। শত শত লোক স্বচক্ষে দেখেছে। এর চেয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি হতে পারে? অলৌকিক শক্তি ভিন্ন এমন ব্যাপার অসম্ভব।' যদুবাবু এবং অন্যান্য দর্শকরা প্রত্যক্ষ করেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি। রঙ্গমঞ্চের ভিতরটা আগাগোড়া কাল কাড়ড়ে মোড়া। ভিতরে আলো নেই, কিন্তু মঞ্চের ঠিক বাইরে চারিধারে উজ্জ্বল আলো, তাতে দর্শকের চোখে ধাঁধা লাগে। ভিতরে কোনও বস্তু বা মানুষ কাল কাপড়ে ঢাকা থাকলে অদৃশ্য হয়, ঢাকা খুললেই দৃশ্য হয়। জাদুকর

কাল ঘোমটা পড়লে তাঁর মুণ্ড অন্তর্হিত হয়, তখন তিনি একটা কৃত্রিম মুণ্ড নিয়ে লোফালোফি করেন। তাঁর সঙ্গিনী কাল বোরখা প'রে নাচে, বোরখার উপর সাদা কঙ্কাল আঁকা থাকে। বোরখা ফেলে দিলেই রূপান্তর ঘটে।

মহাপুরুষদের অলৌকিক ক্রিয়ার কথা অনেক শোনা যায়। বিশ্বাসী ভক্তরা বলেন,'অমুক বাবার দৈবশক্তি মানতেই হবে, শূন্য থেকে নানারকম গন্ধ সৃষ্টি করতে পারেন। আমার কথা না মানতে পার, কিন্তু বড় বড় প্রফেসররা পর্যন্ত দেখে অবাক হয়ে গেছেন, তাঁদের সাক্ষ্য তো অবিশ্বাস করতে পার না।' এইরকম সিদ্ধান্ত যাঁরা করেন তাঁরা বোঝেন না যে প্রফেসর বা উকিল জজ পুলিস- অফিসার ইত্যাদি নিজের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণবুদ্ধি হতে পারেন, কিন্তু 'অলৌকিক' রহস্যের ভেদ তাঁদের কর্ম নয়। জড় পদার্থ ঠকায় না, সেজন্য বিজ্ঞানী তাঁর পরীক্ষাগারে যা প্রত্যক্ষ করেন তা বিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু যদি ঠকাবার সম্ভাবনা থাকে তবে চোখে ধুলো দেওয়া বিদ্যায় যাঁরা বিশারদ (যেমন জাদুকর), কেবল তাঁদের সাক্ষ্যই গ্রাহ্য হতে পারে। রামায়ণে সীতা বলেছেন, 'অহিরেব অহেঃ গাদান্ বিজানাতি ন সংশয়ঃ'- সাপের পা সাপেই চিনতে পারে তাতে সংশয় নেই। কিন্তু বিচক্ষণ ওস্তাদের পক্ষেও বাব স্বামী ঠাকুর প্রভৃতিকে পরীক্ষা করা সাধ্য নয়, কারণ তাঁদের কাপড়- চোপড় বা শরীর তল্লাশ করতে চাইলে ভক্তরা মারতে আসবেন। বৈজ্ঞানিক বিচারের একটি নিয়ম- কোনও ব্যাপারের ব্যাখ্যা যদি সরল বা পরিচিত উপায়ে সম্ভবপর হয় তবে জটিল বা অজ্ঞাত বা অলৌকিক কারণ কল্পনা করা অন্যায়।

রামবাবু স্থির করেছেন যে বেলিণ্ডা জেলার লোকে চোর হয়, কারণ, তাঁর এক চাকর ওই জেলার লোক, সে ঘড়ি চুরি ক'রে পালিয়েছে। তার ভাগনে শ্যামবাবুর বাড়ি কাজ করে, সেও রোজ বাজারের পয়সা থেকে কিছু কিছু সরায়। শ্যামবাবু বলেছেন, বেলিণ্ডা জেলার লোককে বিশ্বাস করা উচিত নয়। এই অল্প কয়েকটি ঘটনা বা খবর থেকে রামবাবু আরোহ (Induction) পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত করেছেন যে ওই জেলার সকলেই চোর।

তারাদাস জ্যোতিষার্ণব বলেছেন যে এই বৎসরে গণেশবাবুর আর্থিক উন্নতি এবং মহাগুরুনিপাত হবে। গণেশবাবুর মাইনে বেড়েছে, তাঁর আশি বছরের পিতামহীও গ্রহণ। এই দুই মিল দেখে ফলিত জ্যোতিষের উপর গণেশবাবুর অগাধ বিশ্বাস জন্মেছে। জ্যোতিষগণনা কত বার নিষ্ফল হয় তার হিসাব করা গণেশবাবু দরকার মনে করেন না।

রত্নের সঙ্গে আকাশের গ্রহের সম্বন্ধ আছে, রত্নধারণে ভালমন্দ ফল হয়, অমাবস্যা পূর্ণিমায় বাত প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধি হয়, অম্বুবাচীতে অন্য দিনের তুলনায় বেশি বৃষ্টি হবেই, অশ্লেষা মঘায় যাত্রা করলে বিপদ হয়, ইত্যাদি ধারণা বহু শিক্ষিত লোকেরও আছে। কিন্তু সত্যাসত্য নির্ণয়ের যা যথার্থ উপায়--পরিসংখ্যান (statistics), তা এ পর্যন্ত কেউ অবলম্বন করেন নি।

বিপিনবাবু স্বজাতির উপর চটা। তিনি এক সভায় বললেন, বাঙালী অতি দুশ্চরিত্র। তার ফলে তাঁকে খুব মার খেতে হল। বিপিনবাবু এরকম আশঙ্কা করেন নি। পূর্বে তিনি আলাদা আলাদা কয়েকজনকে ওই কথা বলেছিলেন। কেউ তাঁকে ধমক দিয়েছিল কেউ তর্ক করেছিল, কেউ পাগল ভেবে হেসেছিল, কেউ বা বলেছিল, হাঁ মশায়, আপনার কথা খুব ঠিক। বিপিনবানু ভাবতে পারেন নি, পৃথক পৃথক লোকের উপর তাঁর উক্তির প্রতিক্রিয়া যেমন হবে, সমবেত জনতার উপর তেমন না হতে পারে। তিনি বিজ্ঞানের চর্চা করলে জানতে পারতেন, বস্তুর এক-একটি উপাদানের গুণ ও ক্রিয়া যে প্রকার, বস্তুসম্ভারের গুণ ও ক্রিয়া সে প্রকার না হতে পারে।

সাধারণ লোকের বিচার যে ভুল হয় তার একটি কারণ, প্রচুর প্রমাণ না পেয়েই একটা সাধারণ নিয়ম স্থির করা। এককালে লোকের বিশ্বস ছিল যে স্তন্যপ্রায়ী প্রাণী মাত্রেই জরায়ুজ। কিন্তু পরে ব্যতিক্রম দেখা গেল যে duck-bill (ornithorhyncus) নামক জন্তু স্তন্যপায়ী অথচ অণ্ডজ। অতএব, শুধু এই কথাই বলা চলে যে অধিকাংশ বা প্রায় সমস্ত স্তন্যপায়ী জীব জরায়ুজ। ডারউইন লক্ষ্য করেছিলেন, সাদা বেরালের নীল চোখ থাকলে সে কালা হয়। এখন পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম দেখা যায়নি, কিন্তু সাদা লোম, নীল চোখ আর শ্রবণশক্তির মধ্যে কোনও কার্যকারণসম্বন্ধও আবিষ্কৃত হয় নি। অতএব শুধু বলা চলে, যার লোম সাদা আর চোখ নীল সে বেরাল খুব সম্ভবত কালো । মিত্র আর মুখুজ্জে কুটিল, দত্ত আর চট্ট বজ্জাত, কাল বামুন কটা শূদ্র বেঁটে মুসলমান সমান মন্দ হয়--ইত্যাদি প্রবাদের মূলে লেশমাত্র প্রমাণ নেই, তথাপি অনেক লোকে বিশ্বাস করে।

এদেশের অতি উচ্চশিক্ষিত লোকের মধ্যেও ফলিত জ্যোতিষ আর মাদুলি-কবচে অগাধ বিশ্বাস দেখা যায়। খবরের কাগজে 'রাজজ্যোতিষী'রা যেরকম বড় বড় বিজ্ঞাপন দেন তাতে বোঝা যায় যে তাঁরা প্রচুর রোজগার করেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বিজ্ঞান ও দর্শনে অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ নিষ্ঠাবান হিন্দুও ছিলেন। তাঁর 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'ফলিত জ্যোতিষ' নামক প্রবন্ধটি সকল শিক্ষিত লোকেরই পড়া উচিত। তা থেকে কিছু কিছু তুলে দিচ্ছি।--

'কোনও একটা ঘটনার খবর পাইলে সেই খবরটা প্রকৃত কি না এবং ঘটনাটা প্রকৃত কি না তাহা ...জানিবার অধিকার বিজ্ঞানবিদের প্রচুর পরিমাণে আছে। এই অনুসন্ধান কার্যই বোধ করি তাঁর প্রধান কার্য। প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের জন্য তাহাকে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়। ...অবৈজ্ঞানিকের সঙ্গে বিজ্ঞানবিদের এইখানে পার্থক্য। ...তিনি অতি সহজে অত্যন্ত ভদ্র ও সুশীল ব্যক্তিকেও বলিয়া বসেন, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিলাম না। ...নিজের উপরেও তাঁর বিশ্বাস অল্প। ...কোথায় কোন্ ইন্দ্রিয় তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া ফেলিবে...এই ভয়ে তিনি সর্বদা আকুল। ফলিত জ্যোতিষে যাঁহারা অবিশ্বাসী তাঁহাদিগের সংশয়ের মূল এই। তাঁহারা যতটুকু প্রমাণ চান ততটুকু পান না। তাঁহার বদলে বিস্তর কুযুক্তি পান।... একটা ঘটনার সহিত মিলিলেই দুন্দুভি বাজাইব, আর সহস্র ঘটনার যাহা না মিলিবে তাহা চাপিয়া যাইব অথবা গণক ঠাকুরের অজ্ঞতার দোহাইদিয়া উড়াইয়া দিব এরূপ ব্যবসায়ও প্রশংসনীয় নহে।"

'একটা সোজা কথা বলি। ফলিত জ্যোতিষকে যাঁহারা বিজ্ঞানবিদ্যার পদে উন্নত দেখিতে চাহেন তাঁহারা এইরূপ করুন। প্রথমে তাহাদের প্রতিপাদ্য নিয়মটা খুলিয়া বলুন। মানুষের জন্মকালে গ্রহ নক্ষত্রের স্থিতি দেখিয়া কোন্ নিয়মে গণনা হইতেছে তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হইবে।-- ধরি মাছ না ছুঁই পানি হইলে চলিবে না। তাঁহার পর হাজার খানেক শিশুর জন্মকাল ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিতে হইবে; এবং পূর্বের প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে গণনা করিয়া তাঁহার ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিতে হইবে। ...পূর্বে প্রচারিত ফলাফলের সহিত প্রত্যক্ষ ফলাফল মিলিয়া গেলেই ঘোর অবিশ্বাসীও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসে বাধ্য হইবে। যতটুকু মিলিবে ততটুকু বাধ্য হইবে। হাজারখানা কোষ্ঠীর মধ্যে যদি নয় শ মিলিয়া যায় তবে মনে করিতে হইবে যে ফলিত জ্যোতিষে অবশ্য কিছু আছে। যদি পঞ্চাশখানা মাত্র মেলে তবে মনে করিতে হইবে, তেমন কিছুই নাই। হাজারের বদলে যদি লক্ষটা মিলাইতে পার, আরও ভাল। সহস্র পরীক্ষাগারে ও মানমন্দিরে বৈজ্ঞানিকেরা যে রীতিতে ফলাফল গণনা ও প্রকাশ করিতেছেন সেই রীতি আশ্রয় করিতে হইবে। কেবল নেপোলিয়নের ও বিদ্যাসাগরের কোষ্ঠী বাহির করিলে অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মিবে না। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়, তবে রামকান্তের জজিয়তি কেন হইবে না, এরূপ যুক্তিও চলিবে না।'

এই শ্রেণীর কুযুক্তির ইংরেজী নাম begging the question, অর্থাৎ যা প্রশ্ন তাই একটু ঘুরিয়ে উত্তর রূপে বলা। প্রশ্ন--কাঠ পোড়ে কেন? উত্তর--কারণ কাঠ দাহ্য পদার্থ। দাহ্য মানে যা পুড়তে পারে। অতএব উত্তরটি এই দাঁড়ায়--কাঠ পুড়তে পারে সেই জন্যই পোড়ে। প্রশ্নটিকেই উত্তরের আকারে সাজিয়ে বলা হয়েছে। প্রশ্ন--ডাক্তারবাবু, নিশ্বাস নিতে আমার কষ্ট হচ্ছে কেন? উত্তর--তোমার dyspnoea হয়েছে। রোগের নাম শুনে রোগীর হয়তো ডাক্তারের উপর আস্থা বেড়ে গেল, কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধি হল না; নামটির মানেই কষ্টশ্বাস। আরও উদাহরণ--গাঁজা খেলে নেশা হয় কেন? কারণ, গাঁজা মাদক দ্রব্য! রবার টানলে বাড়ে কেন? কারণ, রবার স্থিতিস্থাপক। ডি-ডি-টিতে পোকা মরে কেন? কারণ জিনিসটি কীটঘ্ন। খবরের কাগজে এবং রাজনীতিক বক্তৃতায় এই প্রকার যুক্তি অনেক পাওয়া যায়। যথা---'প্রজা যদি নিজের মতামত অবাধে ব্যক্ত করিতে না

পারে তবে রাষ্ট্রের অমঙ্গল হয়, কারণ, রুদ্ধ জনমত অশেষ অনিষ্টের মূল।'

অনেক সময় পূর্বের ঘটনাকে পরবর্তী ঘটনার কারণ মনে করা হয়। এরূপ যুক্তিই কাকতালীয় ন্যায় বা Post hoc, propter hoc । আমার ফিক ব্যথা ধরেছে, একটা বড়ি খেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে সেরে গেল। এতে ঔষধের গুণ প্রমাণিত হয় না, ব্যথা আপনিও সারতে পারে। একটা নারকেল গাছ পুঁতেছিলাম, বার বৎসরেও তাতে ফল ধরল না। বন্ধুর উপদেশে এক বোতল সমুদ্রের জল গাছের গোড়ায় দিলাম। এক বৎসরের মধ্যে ফল দেখা গেল। এও প্রমাণ নয়, হয়তো যথাকালে আপনিই ফল ধরেছে। বার বার মিল না ঘটলে কার্যকারণ-সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না।

ফলিত জ্যোতিষে যাঁদের আস্থা আছে তাঁরা প্রায়ই বলেন, যদি গণনা ঠিক হয় তবে মিলতেই হবে। হোমিওপ্যাথি-ভক্তরাও বলে থাকেন, যদি ঔষধ-নির্বাচন ঠিক হয় তবে রোগ সারতেই হবে। যদি শতবার অভীষ্ট ফল না পাওয়া যায় তাতেও তাঁরা হতাশ হন না; বলেন গণনা (বা ঔষধ) ঠিক হয় নি। যদি একবার ফললাভ হয় তবে উৎফুল্ল হয়ে বলেন, এই দেখ, বলেছিলাম কিনা? যথার্থ গণনার (বা ঔষধের) কি অব্যর্থ ফল!

সকলেরই জ্ঞান সীমাবদ্ধ সেজন্য অসংখ্য ক্ষেত্রে আপ্তবাক্য মেনে নিতে হয়, কার উপদেশ গ্রহণীয় তা লোকে নিজের শিক্ষা আর সংস্কার অনুসারে স্থির করে। পাড়ায় বসন্ত রোগ হচ্ছে। সরকার বলছেন টিকা নাও, ভটচাজ্যি মশায় বলছেন শীতলা মাতার পূজা কর। যারা মতিস্থির করতে পারে না বা ডবল গ্যারান্টি চায় তারা টিকাও নেয় পূজার চাঁদাও দেয়। বাড়িতে অসুখ হলে লোকে নিজের সংস্কার অনুসারে চিকিৎসার পদ্ধতি ও চিকিৎসক নির্বাচন করে। রেসে বাজি রাখবার সময় কেউ বন্ধুর উপদেশে চলে, কেউ গণৎকারের কথায় নির্ভর করে।

গত এক শ দেড়শ বৎসরের মধ্যে এক নূতন রকম আপ্তবাক্য সকল দেশের জনসাধারণকে অভিভূত করেছে---বিজ্ঞাপন। অশিক্ষিত লোক মনে করে, যা ছাপার অক্ষরে আছে তা মিথ্যা হতে পারে না। বিজ্ঞাপন এখন একটি চারুকলা হয়ে উঠেছে, সুরচিত হলে নৃত্যপরা অপ্সরার মত পরম জ্ঞানী লোককেও মুগ্ধ করতে পারে। একই বস্তুর মহিমা প্রত্যহ নানা স্থানে নানা ভাষায় নানা ভঙ্গীতে পড়তে পড়তে লোকের বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। চতুর বিজ্ঞাপক স্পষ্ট মিথ্যা বলে না; আইন বাঁচিয়ে, নিজের সুনাম রক্ষা ক'রে, মনোজ্ঞ ভাষা ও চিত্রের প্রভাবে সাধারণের চিত্ত জয় করে। যে জিনিসের কোনও দরকার নেই অথবা যা অপদার্থ তাও লোক অপরিহার্য মনে করে। অতি বিচক্ষণ চিকিৎসকও বিজ্ঞাপনের কবল থেকে মুক্ত হতে পারেন না, সাধারণের তো কথাই নেই। বিজ্ঞাপন দেখে লোকের দৃঢ় ধারণা হয়, অমুক ফাউন্টেন পেন না হলে চলবে না, অমুক কাপড়ের মার্ট বা শাড়ি না পরলে আধুনিক হওয়া যাবে না। এক বিখ্যাত বিলাতী ব্যবসায়ী ঘোষণা করেছেন--Beware of night starvation, খবরদার, রাত্রে যেন জঠরানলে দগ্ধ হয়ো না, শোবার আগে এক কাপ আমাদের এই বিখ্যাত পথ্য পান করবে। যিনি গাণ্ডে পিণ্ডে নৈশভোজন করেছেন তিনিও ভাবেন, তাই তো, রাত্রে পুষ্টির অভাবে মরা ঠিক হবে না, অতএব এক কাপ খেয়েই শোওয়া ভাল। চায়ের বিজ্ঞাপনে প্রচার করা হয়---এমন উপকারী পানীয় আর নেই, সকালে দুপুরে সন্ধ্যায়, কাজের আগে মাঝে ও পরে, শীত করলে, গরম বোধ হলে, সর্বাবস্থায় চা-পান হিতকর।

বিজ্ঞাপন কেমন পরোক্ষভাবে মানুষের বিচারশক্তি নষ্ট করে তার একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বহুকাল পূর্বের কথা, তখন আমি পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আমার পাশের টেবিলে একজন ষষ্ঠ বার্ষিকের ছাত্র একটা লাল রঙের তরল পদার্থ নিয়ে তার সঙ্গে নানা রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে পরীক্ষা করছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ও কি হচ্ছে?' উত্তর দিলেন, 'এই কেশতৈলে মারকিউরি আর লেড আছে কি না দেখছি।' প্রশ্ন----'কেশতৈলে ওসব থাকবে কেন'? উত্তর---'এরা বিজ্ঞাপনে লিখছে, এই কেশতৈল পারদ সীসক প্রভৃতি বিষ হইতে মুক্ত। তাই পরীক্ষা ক'রে দেখছি কথাটা সত্য কিনা।' এই ছাত্রটি যা করছিলেন ন্যায়শাস্ত্রে তার নাম কাকদন্তগবেষণা, অর্থাৎ কাকের কটা দাঁত আছে তাই খোঁজ করা। পরে ইনি এক সরকারী কলেজের রসায়ন-অধ্যাপক হয়েছিলেন।

যেমন সন্দেশ রসগোল্লায়, তেমনি কেশতৈলে পারা বা সীসে থাকবার কিছুমাত্র কারণ নেই। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য, ভয় দেখিয়ে খদ্দের যোগাড় করা। অজ্ঞ লোকে ভাববে, কি সর্বনাশ, তবে তো অন্য তেলে এইসব থাকে। দরকার কি, এই গ্যারান্টি দেওয়া নিরাপদ তেলটিই মাখা যাবে।

ধর্মমত আর রাজনীতিক মতের সত্যতা প্রমাণ করা প্রায় অসাধ্য। প্রমাণের অভাবে উত্তেজনা আর আক্রোশ আসে, মতবিরোধের ফলে শত্রুতা হয়, তার পরিণাম অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়ে ওঠে। কিন্তু অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক মত সহজেই সর্বগ্রাহ্য হতে পারে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ হলেও শত্রুতা হয় না। সোভিয়েট বিজ্ঞানী লাইসেংকোর প্রজনন-বিষয়ক মত নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে যে উগ্র বিতর্ক হয়েছে তার কারণ প্রধানত রাজনীতিক।

যিনি বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক তিনি ধীরভাবে ভ্রমপ্রমাদ যথাসাধ্য পরিহার ক'রে সত্যের সন্ধান করেন, প্রবাদকে, প্রমাণ মনে করেন না, প্রচুর প্রমাণ না পেলে কোনও নূতন সিদ্ধান্ত মানেন না, অন্য বিজ্ঞানীর ভিন্ন মত থাকলে অসহিষ্ণু হন না, এবং সুপ্রচলিত মতও অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকেন না, উপযুক্ত প্রমাণ পেলেই বিনা দ্বিধায় মত বদলাতে পারেন। জগতের শিক্ষিত জন যদি সকল ক্ষেত্রে এই প্রকার উদার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োগ কতে শেখেন তবে কেবল সাধারণ ভ্রান্ত সংস্কার দুর হবে না, ধর্মান্ধতা ও রাজনীতিক সংঘর্ষেরও অবসান হবে।

(সংগৃহীত)

দেবী! প্রপন্নার্তিহরে! প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতো খিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি। পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবী! চরাচরস্য॥

শ্রীশ্রী চন্ডী

অর্থ: হে দেবী, যে তোমার শরণাগত হয়, তুমি তার দুঃখ দূর কর। তুমি প্রসন্ন হও। হে সমগ্র বিশ্বের জননী, চরাচরের অধীশ্বরী, তুমি প্রসন্ন হও, বিশ্বকে রক্ষা কর।

হিন্দুসমাজের গড়ন

নির্মল কুমার বসু

হিন্দুসমাজের গঠনকৌশল বুঝিবার চেষ্টায় আমরা বহু তথ্যের অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। আমাদের ইতিহাস প্রাচীন, এবং বহু লোক লইয়া তাহার কারবার। অল্প কথায় বা সংক্ষেপে ভারতবর্ষের সমাজগঠনের ধারা অথবা তাহার পরিণতির আলোচনা করা দুরূহ ব্যাপার। তাহা সত্ত্বেও আমরা পাঠকবর্গকে হিন্দুসমাজের জটিলতা এবং তাহার গতির সহিত পরিচিত করাইবার জন্য যথাসম্ভব তথ্যপ্রকাশ ও আলোচনার চেষ্টা করিয়াছি। সুধী পাঠক ইহা হইতে নূতন কোনও দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পাইয়া থাকিলে, অথবা চিন্তার নূতন কোনও খোরাক পাইয়া থাকিলে নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করিব।

প্রথমেই চোখে পড়ে, ভারতবর্ষীয় সমাজ বহু জাতির সংশ্লেষের দ্বারা রচিত হইয়াছে। অপরাপর দেশেও তাহাই হয়, এবং বিজেতা জাতির প্রভাবে বিজিত জাতি অনেক ক্ষেত্রে স্বীয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে। একে অপরকে শোষণ করিয়া নূতন একটি উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা নির্মাণ করে। আবার দিন যায়, উৎপাদনের নূতন এক কৌশল অধিকৃত হওয়ার ফলে আবার মানুষে মানুষে সম্পর্কের হেরফের হয়। ভারতবর্ষে যে তেমন হয় নাই, তাহা নহে। তাহাই ঘটিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যেও ভারতবর্ষের প্রতিভা এক নূতন দিকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; যাহার ফলে নানা রাজনৈতিক উত্থানপতন ও ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও ভারতবর্ষ স্বীয় সংস্কৃতিকে মরণের অপঘাত হইতে বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

সেই কৌশলটি আমরা বর্ণব্যবস্থার মধ্যে দেখিতে পাই। প্রাচীন ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদগণের মতে বর্ণব্যবস্থা সকল সমাজেই প্রযোজ্য। যেখানেই বহু জাতি মিলিত হইতেছে, তাহাদিগকে চারি মৌলিক বর্ণে স্থান দিয়া, সংশ্লিষ্ট করিয়া একটি বৃহত্তর সমাজ গঠন করা যায়। সমাজের প্রয়োজনে, স্বীয় গুণ বা প্রতিভা অনুসারে যে যে-কাজ করে, সে-ব্যক্তি বা তাহার পরে অনুরূপ বৃত্তিধারী ব্যক্তি অনাহারে মরিবে না, সকলে পরস্পরের সহযোগিতার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করিবে, তাহা হইলে পরস্পরের বাহুবন্ধনে যে দৃঢ় সমাজ গড়িয়া উঠে, তাহার শক্তি বেশি হয়। উপরন্তু গ্রাম্য সমাজে এই সহযোগিতার অতিরিক্ত আরও একটি ব্যবস্থার দ্বারা মানুষকে পরম আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল। যে যে- সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত, তাহার কুল বা জাতির আচার যেমনই হউক না কেন, সে সেই আচার বজায় রাখিয়াও হিন্দু সমাজে স্থান পাইত। কেবল গো-হত্যা, নরবলি বা ব্রাহ্মণসমাজে ঘৃণার্হ বলিয়া গণ্য কোনও আচার থাকিলে, তাহাকে পরিমার্জিত করিয়া লওয়া হইত।

বর্ণগত সমাজের অন্তরে যে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড বর্তমান ছিল, এবং স্বধর্ম পালনের যে আশ্বাস বহু জাতি লাভ করিয়াছিল, তাহারই কারণে ভারতীয় সমাজে বিজিতের বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই; অথবা দেখা দিলেও বেশি দূর পর্যন্ত তাহা অগ্রসর হইতে পারে নাই। অথচ ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে আপত্তি বা বিদ্রোহের কোনও কারণ ছিল না, এমন মনে করিবার হেতু নাই। সকল দেশের বিজেতাগণ যাহা করিয়া থাকেন, ভারতীয় সমাজেও তাহার প্রমাণ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। বিজেতাগণ স্বীয় শ্রেণীগত স্বার্থপুষ্টির জন্য পরিশ্রমের ভার উত্তরোত্তর শূদ্রবর্ণের উপরে চাপাইয়া দিতে লাগিলেন; বিজিত জাতির পুরোহিতকুলকে ব্রাহ্মণবর্ণে স্থান দিলেও নিম্নপদবীর অধিকারী করিয়া রাখিলেন এবং নিম্নবর্ণকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ এবং যোগতপের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। অবশ্য শূদ্রকুল লুকাইয়া দ্বিজের অধিকার ভূমিতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু ফলে তাঁহাদের শম্বুকের দশালাভ করিতে হইত।

বুদ্ধদেব শূদ্র এবং স্ত্রীজাতির মুক্তির অধিকার স্বীকার করার ফলে ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে যে বিপুল প্রাণশক্তির সঞ্চার ঘটিল, যাহার ফলে স্থাপত্যে শিল্পে ধর্মান্দোলনে সৃজনী প্রতিভার প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হইল, তাহা হইতেই বুঝা যায়, কতখানি সৃজনী প্রতিভা সমাজের অবজ্ঞাতস্তরে এতদিন অনাদৃত অবস্থায় চাপা পড়িয়া ছিল।

অথচ ব্রাহ্মণদের মতলব যে কেবল খারাপই ছিল, এমন ভাবিবার কোনও হেতু নাই। তাঁহারা বর্ণব্যবস্থার অন্তর্বর্তী অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড স্থাপন এবং স্বধর্মে অধিকারের স্বীকৃতির ভিতর দিয়া যে ঔদার্য এবং গঠনকুশলতা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। দুঃখ এইখানে যে, তাঁহারা বিজিতকে ঠিক নিজেদের সমান আসন দিতে সমর্থ হন নাই। সেই ভেদবিষে সংশ্লেষমূলক সমাজের দেহ উত্তরোত্তর দুর্বল ও পঙ্গু হইয়া পড়িল। তেমন সমাজের বিভিন্ন জাতি একত্র হইয়া বাহিরের শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। সমগ্র সংশ্লিষ্ট সমাজের বৃহত্তর ঐক্য মানুষের চোখে বেশি ধরা পড়ে নাই, প্রত্যেকে স্বীয় ক্ষুদ্রতর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিয়া অবশেষে গোটা হিন্দুসমাজকে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাইয়া ছাড়িল।

সংশ্লেষের যে আদর্শ লইয়া হিন্দুসমাজ রচিত হইয়াছিল, উৎপাদন ব্যবস্থাকে একান্তভাবে কুল বা জাতিগত বৃত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা দেখা গিয়াছিল, কার্যত তাহা কিন্তু কোনদিনই ষোল আনা প্রতিপালিত হয় নাই। এক জাতি হইতে অপর জাতিতে পরিণত হওয়ার ইতিহাস আজও বিরল নহে, পূর্বকালেও বিরল ছিল না। বৃত্তির পরিবর্তন, স্থানান্তরে গমন ও বসবাস, আচারভ্রষ্ট হওয়ার কারণে অথবা শুদ্ধতর আচার গ্রহণের ফলে নূতন নূতন জাতির উদ্ভব হইয়াছে; কিন্তু সকলে মৌলিক নীতি দুইটিকে মানিয়া চলিয়াছে। দেশাচার বা লোকাচার পালনের স্বাধীনতা ও বৃত্তিতে কুল বা জাতিগত অধিকারের বিরুদ্ধে কেহ আপত্তি করে নাই।

সেইজন্য মুসলমান অধিকারকালে যখন রাজশক্তি অন্য পথে চলিল, যখন সমাজের শিক্ষিত চাকুরিজীবী মুসলমান সরকারের নিকট প্রীতিলাভের চেষ্টা করিতেছিল, তখনও গ্রাম্যসমাজে বর্ণব্যবস্থার মেরুদণ্ড অভগ্ন থাকার কারণে হিন্দুসভ্যতা টিকিয়া গিয়াছিল। যে সকল দরিদ্র, শোষিত শূদ্র জাতি অত্যাচারিত হইত, বৃত্তিমূলক বর্ণব্যবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে, পরস্পরের মধ্যে ছুৎমার্গ, উচ্চনীচ বোধ কায়েমী রাখার বিষয়ে, তাহাদেরও উৎসাহের অভাব ছিল না। আজও যখন অস্পৃশ্যতা বর্জনের আন্দেলন চলিতেছে, তখন হাড়ি, ডোম, বাগদি প্রভৃতি জাতি ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহিত মর্যাদার সমত্ব লাভে খুশি হইলেও পরস্পরের মধ্যে পুরাতন সম্পর্ক পরিবর্তন করিতে আগ্রহান্বিত হয় না। অর্থাৎ শোষিতগণের মধ্যে বর্ণব্যবস্থার প্রতি আনুগত্যের ন্যূনতা যথোপযুক্তভাবে আজও ঘটে নাই।

ইহার জন্য শুধু ব্রাহ্মণের কূটকৌশলী বুদ্ধিকে নিন্দা করিয়া লাভ নাই, বরং এই আনুগত্যের মূল ও বিদ্রোহের অভাবের মৌলিক কারণকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, উচ্চবর্ণই হউক বা নিম্নবর্ণই হউক, প্রতি জাতিই সংশ্লেষণপ্রসূত হিন্দুসমাজের মধ্যে যে আর্থিক ভাগ্যের স্থিরতা ও আচার পালনের স্থির অধিকার পাইত, তাহারই জন্য মোটের উপরে খুশি মনে থাকিত। নানক, চৈতন্যদেব অথবা রামমোহন ভেদনীতি বর্জন করিয়া যখন সামাজিক সমতা এবং জাতির পরিবর্তে ব্যক্তিগত গুণ ও কর্মকে সমধিক মর্যাদা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন শুধু ব্রাহ্মণ নহে, আপামর জনসাধারণ তাহাদিগকে বৃহৎ হিন্দুসমাজের মধ্যে নূতন একটি জাতিতে পরিণত করিয়া মহাপুরুষদের সংস্কারচেষ্টাকে পরাস্ত করিয়াছিল। বৈষ্ণবকে আমরা 'বোষ্টম' নামক এক জাতিতে পরিণত করিয়াছি। শিখ এবং ব্রাহ্ম সমাজকেও আমরা প্রায় একটি 'জাতি'তে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিলাম, যাহার বিবাহ একান্তভাবে স্বীয় সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ।
ইহার মূলে শুধু ব্রাহ্মনের শঠতা অথবা শূদ্রগণের অন্ধ কুসংস্কার আছে বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। জগতের অন্যত্র যেরূপ সামাজিক বিদ্রোহ ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষে তাহা শুধু জাতীয় নির্বীর্যতার কারণে ঘটে নাই বলিলে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দায় হইতে খালাস পাওয়া যায় না। মূলে রহিয়াছে, আপামর সাধারণের মনে বর্ণব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য। বর্ণব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভারকেন্দ্রের স্থৈর্যের বশেই ভারতীয় সংস্কৃতির স্থৈর্য সম্ভব হইয়াছিল।
এই মৌলিক সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপের নূতন উৎপাদনব্যবস্থার সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতের পুরাতন ধনতন্ত্রের পরাজয় আরম্ভ হইয়াছে। আজও বৃত্তিতে কুলগত অধিকার অভ্যাসবশত স্বীকৃত হইলেও অধিকাংশ জাতির বেলায়, এবং দেশের প্রায় সকল গ্রামে, প্রাচীন উৎপাদনব্যবস্থা কমবেশি ওলটপালট হইয়া গিয়াছে এবং এই বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পূর্বে বর্ণব্যবস্থার প্রতি যে আনুগত্য ছিল, আজ তাহা দ্রুত ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারেই যে আমাদের মধ্যে সমাজসংস্কারের বুদ্ধি আসিয়াছে তাহা নহে। এ কথা শুধু আংশিকভাবেই সত্য। যদি পুরাতন বৃত্তির আশ্রয়ে মানুষ আজও সুখে স্বচ্ছন্দে খাওয়াপরা চালাইতে পারিত তবে ইংরেজি শিখিয়াও তাহারা বর্ণব্যবস্থাকে ভাঙিতে চাহিত না। ভারতবাসী শিক্ষিত সমাজ এক সময়ে ফারসীনবিশ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার দ্বারা সমাজের উপরস্তরে কিছু পরিবর্তন সাধিত হইলেও গভীরস্তরে সে প্রভাব পৌঁছায় নাই। শুধু তাহাই নহে। অনেকের ধারণা, হিন্দু সমাজের শোষণ এবং অবমাননা নীতির ফলেই নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বহু মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এই যুক্তি আমার নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যাহারা জাতিগত বৈষম্যের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ধর্মান্তরিত হইল, তাহারা মুসলমান হইয়াও উচ্চনীচ ভেদাভেদ এবং ব্যবসায়ে কুলগত অধিকার গ্রাম্য সমাজে বজায় রাখিল কেন? সম্ভবত অন্য কারণে তাহারা মুসলমান হইয়াছিল। তাই মনে হয়, মুসলমানী আমলেও হিন্দুসমাজের অন্তর্গত আর্থিক সংগঠনের স্থৈর্যই ধর্মান্তরিত হিন্দুর মধ্যে ইসলামের সমতাবুদ্ধিকে সম্যকভাবে বিকীর্ণ হইতে দেয় নাই। পারিতেছে না, শুধু আজ। এবং তাহার কারণও বলা হইয়াছে, পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরাজয়।

গীতায় একটি কথা আছে- সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ। আমরা ইউরোপীয় ক্যাপিট্যালিজমের আজ প্রভূত নিন্দা করিতেছি; তাহার মধ্যে যে সামাজিক বৈষম্য ও শোষণ রহিয়াছে, সেই পাপ হইতে মানবসমাজকে আমরা বাঁচাইতে চাই। কিন্তু ইউরোপীয় ধনতন্ত্র মানুষের লোভ এবং স্বার্থবুদ্ধির পোষণকে আশ্রয় করিয়াও জগতের উৎপাদনব্যবস্থাকে আরও অধিক ফলপ্রসূ করিয়াছে, ইহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার দোষ কাটাইতে হইলে আমরা ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের যন্ত্রগুলিকে গ্রহণ করিয়া হয়তো তাহার পরিচালনব্যবস্থায় সংস্কার আনিতে পারি, আনুষঙ্গিক দোষগুলি কাটাইতে পারি। কিন্তু তাহার মূলে যদি স্বর্ণসম্ভার থাকে, সে স্বর্ণকে উপেক্ষা করিব না; বরং পুরাতন সোনার অলঙ্কারকে গলাইয়া নূতন রূপে তাহাকে ঢালিয়া লইব।

বর্ণব্যবস্থার সম্বন্ধেও সে কথা বলা চলে। শোষণ, মনুষ্যত্বের অবমাননা, সবই ইহার সহিত জড়িত ছিল। কিন্তু বর্ণব্যবস্থার মূলে একটি বুদ্ধি ছিল, মানুষ সমাজের দাস। সমাজের জন্য নির্ধারিত সেবা করিয়া কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষী স্বীয় জীবনযাপন করিয়া থাকে। সমাজকে তাহারা দেখে এবং সমাজও তাহাদের দেখে। অধিকার এবং দায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তদুপরি, বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন কুলের, এমন কি বিভিন্ন মানুষের স্বধর্ম পালনের অধিকার আছে। এই দুইটি মূলনীতির উপরে রচিত হিন্দুসমাজ সংশ্লেষের দ্বারা ভারতবর্ষকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে কোনও সংশয় নাই।

সে সংশ্লেষে কোথায় দোষ, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু দোষ ছিল বলিয়া গুণের প্রতি আমরা দৃক্‌পাত করিব না, ইহাও উচিত নহে। শ্রেণী-শোষণ ভিন্ন ভারতীয় উৎপাদনব্যবস্থা জড়তা দোষযুক্তও হইয়া পড়িয়াছিল। হয়তো ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের প্রভাবে, মানুষের মৌলিক স্বার্থবোধ আজ সুযোগ পাইয়া পুরাতন ব্যবস্থার জড়তাকে ভাঙিয়া ফেলিতেছে। কাঁটা দিয়াই কাঁটা তোলা যায়। রজোগুণ মিশ্রিত তামসিকতার অসির দ্বারাই জাতিভেদের তমোমূলক জড়তার বন্ধন ছিন্ন হইতেছে। কিন্তু আজ ধনতন্ত্রপ্রদত্ত মুক্তি ও উৎপাদনব্যবস্থার অধিক ফলপ্রসব করিবার ক্ষমতা দেখিয়া আমরা যেন না ভাবি, যাহা পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহার সবই ধূলা, সবই বালি। তাহার মধ্যেও যে সোনার দানা আছে, এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার উদ্দেশ্য।

ধনতন্ত্রের অপভ্রংশের উপর রচিত অধুনাতন ভারতীয় সমাজে আবার আমাদের নূতন করিয়া শিখাইতে হইবে যে, মানুষ সমাজের নিকট ঋণী। সে ঋণ প্রাচীনেরা যেভাবে স্বীকার করিতেন আমরা সেভাবে স্বীকার না করিয়া হয়তো নূতনভাবে স্বীকার করিব। কিন্তু দায় আমাদের আছে; এবং

সেই দায়ের উপরেই আমাদের অধিকারও প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এই পুরাতন সত্যটি যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির স্বাধীনতা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে স্বধর্মে অধিকার দিয়া প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণ এই অধিকারের স্বীকৃতি করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা অত্যাশ্চর্য এক ব্যবস্থার প্রবর্তনও করিয়াছিলেন। মানুষ যতক্ষণ সমাজে থাকে ততক্ষণ সে সম্পূর্ণ সমাজের দাস। কুলাচার ও লোকাচার পালন করিবার স্বাধীনতা অবশ্য তাহার আছে; কিন্তু বৃত্তি পরিহারের স্বাধীনতা তাহার নাই। কিন্তু এই বন্ধনের উর্ধ্বে আরও একটি নীতি প্রাচীন হিন্দুগণ স্বীকার করিতেন। যে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করে, পরিব্রাজক হয়, তাহাকে গৃহস্থের শেষ কর্তব্য অগ্নিরক্ষণের দায় হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। সে বিরজা হোম করিয়া আত্মার প্রতি শেষ নৈবেদ্যও স্বহস্তে সারিয়া ফেলে। অতঃপর তাহার পূর্বাশ্রমের সঙ্গে যোগসেতু বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, নামগোত্র লুপ্ত হয়, এবং সে নিকেতনবিহীন হইয়া চলে। সমাজ তাহার উপরে কোন দাবি রাখে না। সেও সমাজের প্রদত্ত ভিক্ষান্ন ভিন্ন অপর কিছু গ্রহণ করিতে পারে না।

অর্থাৎ প্রাচীন বর্ণব্যবস্থাযুক্ত হিন্দুসমাজে আমরা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ সমাজের দাসে পরিণত করিবার যে বুদ্ধি দেখি, তৎসহ ইহাও দেখি, ব্যক্তি যাহাতে বিনষ্ট না হয়,তাহার মৌলিক প্রতিভা বিকাশের জন্য, সন্ন্যাসের খিড়কি দরজা দিয়া মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়াইবার একটা ব্যবস্থাও প্রাচীনগণ নির্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন।

প্রাচীন সমাজের বিচারে আমরা তাহার শোষণের দিকে কেবল না দেখিয়া, বরং যদি বৈজ্ঞানিকদৃষ্টি লইয়া শোষণকে শোষনই বলি, কিন্তু উদ্ধারের যোগ্য কোনও অমূল্য সম্পদ থাকিলে তাহাকে সংগ্রহ করিতে লজ্জিত না হই, তবেই আমরা প্রকৃত লাভবান হইব।

ইউরোপীয় ধনতন্ত্রকে গালি দিব না। তাহা যেখানে মানবসমাজের বৈষয়িক সম্পদবৃদ্ধির ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছে, সেখানে তাহার যোগ্য প্রশংসা করিব। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অতিশয্যের দ্বারা তাহা যে ক্ষতিসাধন করিয়াছে, সে সম্বন্ধেও আমরা অবহিত থাকিব। তেমনই আবার প্রাচীন বর্ণব্যবস্থার মধ্যে যেখানে দোষের যাহা আছে, তাহাকে ক্ষমা করিব না। কিন্তু প্রাচীন উৎপাদনব্যবস্থা ও জাতিসংশ্লেষ, অথবা সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে যদি কিছু ভাল পাই, যাহা আজও আমাদের প্রয়োজনে লাগিতে পারে, তবে অবশ্যই তাহা গ্রহণ করিব।

আজ ধনতন্ত্রের মৌলিক আত্মকেন্দ্রিকতার প্রতিক্রিয়ায় আমরা সমাজকেন্দ্রিকতার অভিমুখে ছুটিয়াছি। ইহার উৎসাহে আজ পৃথিবীতে ব্যক্তিত্বকে অত্যধিক সঙ্কুচিত করিয়া পিপীলিকার মত সমাজরচনার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। কিন্তু পঙ্গু ব্যক্তিত্বের বনিয়াদের উপরে রচিত সমাজ সত্যসত্যই মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে সহায় হইতে পারে না। হয়তো, প্রাচীন ভারত হইতে আমরা এইরূপ অপঘাত হইতে বাঁচিবার একটি বিধি সংগ্রহ করিতে পারি। এইরূপে, বৈজ্ঞানিকপন্থায় ইতিহাস পর্যালোচনার ফলে যদি আমরা স্থিরবুদ্ধি হইয়া, ভাববিলাসী না হইয়া, স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার অভ্যাস করি, তবে যে ধূম সকল কর্মের সহিত সংযুক্ত থাকে সেই ধূমের আবরণের নিম্নে সত্যের জলন্ত অগ্নিশিখাকে আবিষ্কার করিতে শিখিব।

বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে, মানুষ নানা পরীক্ষা, নানা সমাজব্যবস্থা রচনা করিয়াছে, তাহা লইয়া পরীক্ষা করিয়াছে, স্থায়ী সমাজরচনার চেষ্টার দ্বারা মানুষকে সুখী করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ভারতের পুরাতন সমাজে যাহা ধূম তাহাকে পরিহার করিয়া যদি আমরা সেই অগ্নিকে আজিকার দিনে মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের জ্ঞান সার্থক হইবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে একসময়ে নদীর কূল বৃক্ষরাজিতে আচ্ছন্ন ছিল। সে বনানী আজ নাই, কিন্তু বৃক্ষদেহের অভ্যন্তরে যে দাহ্য পদার্থ সঞ্চিত থাকে তাহা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়া অবশেষে কয়লার আকারে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রাচীন গাছের অবশেষ বলিয়া তাহাকে আমরা উপেক্ষা করি না, সেই কয়লার সাহায্যে আজ সভ্য জগতের অনেক কার্যসিদ্ধি হয়। পুরাতন বর্ণব্যবস্থা যে সময়ে গঠিত হইয়াছিল, সে দিন আর ফিরিয়া আসিবে না। ফিরিয়া আসিলেও সুবিধা হইবে না; কারণ মানুষের সংখ্যা আজ বাড়িয়াছে। অন্তত ভারতে জনপিছু ভূমির পরিমাণ অসম্ভবরকম কমিয়া গিয়াছে। তবু সেই সময়কার ব্যবস্থার অন্তরে যদি বর্তমানের প্রয়োগযোগ্য কোনও নীতি, কোনও বুদ্ধি, আমরা আবিষ্কার করিতে পারি, তবে তাহা বর্তমানকালের উপযোগী হইলে সে ব্যবস্থাকে প্রয়োগ না করিলে আমরা মূর্খতার পরিচয় দিব।

মানবজাতিকে দেশ এবং কালের ব্যবধানের দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা যায় না। একমেবাদ্বিতীয়ম্।

(সংগৃহীত)

নমস্তে শর্বানী, ঈশানী ইন্দ্রাণী,
ঈশ্বরী ঈশ্বর-জায়া।
অপর্ণা অভয়া, অন্নপূর্ণা জায়া
মহেশ্বরী মহামায়া॥

উগ্রচন্ডা উমা আশুতোষরমা
অপরাজিতা উর্বশী।
রাজরাজেশ্বরী রমা-রণকরী
শংকরী শিবে ষোড়শী।

হে মা পার্বতী আমি দীন অতি
আপদে পড়েছি বড়।
সর্বদা চঞ্চল পদ্মপত্রজল
ভয়েভীত জড়সড়।

বিপদে আমার না হয় তোমার
বিড়ম্বনা করা আর,
মম প্রতি দয়া কর গো অভয়া
ভবার্ণবে কর পার।

(লঙ্কাকান্ড, কৃত্তিবাসী রামায়ণ)

প্রসঙ্গ:
সনাতন ধর্ম
মানবতার বিকাশে হিন্দুধর্ম

সনাতন ধর্ম

রনজিৎ কর

পৃথিবীতে বহু ধর্মের সৃষ্টি এবং অবলুপ্তির পর বর্তমানে যে চারটি ধর্মের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে সবগুলোর উৎসস্থল এশিয়া মাহাদেশ। সমাজবিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী প্রতিটি ধর্মই মানবজাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত। তৎকালীন সমাজের বৃহৎ অংশ তাদের স্বীয় ধর্মের বিধিবিধান নিঃশর্তভাবে মেনে চলতো। এই সুযোগে কিছু কিছু স্বার্থপর শাসক বা সমাজপতি স্বকল্পিত বিষয়াদি ধর্মের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করার সুযোগ নেয়। রাষ্ট্রীয় প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে প্রক্ষিপ্ত কালাকানুন পরবর্তী কালে ধর্মীয় বিধান হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রোমিলা থাপারের মতে কম পক্ষে পাঁচ হাজার বছর আগে বহিরাগত অসভ্য, বর্বর, কুচিল, কলহপ্রিয় ও যুদ্ধবাজ যাযাবর আর্যরা সিন্ধু অববাহিকায় পদার্পণ করে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা মাতৃপ্রধান সমাজের সুসভ্য আদিবাসী অনার্যদের পরাভূত করে তাদের প্রভাব বিস্তারের পত্তন করে। বিজয়ী আর্যরা বিজিতদের সবকিছু দখল করেই ক্ষান্ত হয়নি-তারা আনার্যদের দীর্ঘদিনের মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থারও প্রচলন করে। প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদের কারণেই হোক কিংবা ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতার কারণেই হোক কিছুদিনের মধ্যে দখলদার আর্যদের অভ্যন্তরীণ কলহ শুরু হয়ে ক্রমে তা ব্যাপক আকার ধারণ করে। ফলে একটি অংশ পশ্চিমে এবং অপর অংশটি পূর্বদিকে অর্থাৎ উত্তর ভারতের দিকে চলে যায়। এককালের পশুপালক যাযাবর আর্যরা পরবর্তী সময়ে ব্যবসায়ী হয়ে ওঠায় তারা ভারতের সরস্বতী নদীর তীরে বসতি স্থাপন করে। অপরদিকে সিন্ধু তীরে রয়ে যাওয়া নগণ্য সংখ্যক আর্যরা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে এক সুন্দর ও সৃষ্টিশীল সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করে-যে সভ্যতার নিদর্শন এখনো মহেঞ্জোদারো-হরপ্পাতে বিদ্যমান। বলা আবশ্যক উক্ত শহর দুটি অনার্য তথা দ্রাবিড়িয়ানরাই নির্মাণ করেছিল। সম্মিলিত আর্য-দ্রাবির জাতির পরিপালিত ধর্মই সনাতনধর্ম নামে প্রতিষ্ঠা পায়। পরবর্তীকালে আর্যরা শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে এই সুসংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে নেয়। এক্ষণে সিদ্ধান্তে পৌছানো কষ্টকর নয় যে, এতদঅঞ্চলে সনাতনধর্মই আদি এবং তৎকালীন সমাজব্যবস্থাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার একমাত্র মাধ্যম ছিলো।

সনাতন শব্দের অর্থ: (১) প্রাচীন, পুরানো (২) নিত্য, চির বর্তমান, শাশ্বত, বহুকাল প্রচলিত এবং (৩) সনাতনধর্ম বলতে বুঝায় চিরস্থায়ী ধর্ম (দ্র. সংসদ বাংলা অভিধান)। প্রশ্ন হতে পারে সনাতনধর্ম কখন কীভাবে হিন্দু ধর্মে নামান্তরিত হলো? উত্তর দেওয়ার আগে অনুসঙ্গ হিসেবে কিছু তথ্যের সন্নিবেশ প্রয়োজন। তদানীন্তন ভারতবর্ষ অনেক ছোট বড় স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিলো। শাসকগন নিজেদেরকে ফলাও করার জন্য রাজা, মহারাজা, রাজাধিরাজ, সম্রাট ইত্যাদি উপাধি নিজেরাই গ্রহণ করতো। যেনতেন প্রকারে অন্যরাজ্য দখল করা ছিলো তাদের পেশা ও নেশা। অধিক সৈন্যবল ছিলো রাজশক্তির প্রধান নিয়ামক। খ্রিস্টপূর্বকাল হতেই সৈন্য শক্তির সঙ্গে পশুশক্তি বিশেষ করে হাতি এবং ঘোড়া সংযোজনের প্রচলন ছিলো। ক্ষীপ্রতা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা সর্বোপরি প্রগাঢ় প্রভুভক্তির কারণে যুদ্ধে হাতির চেয়ে অশ্বশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধবাজ শাসকগণ দেশীয় দুর্বল ঘোড়ার চেয়ে বর্ণিত গুনাবলী সমৃদ্ধ সবল আরব্য ঘোড়া সেনাবাহিনীতে সংযোজনে অধিক আগ্রহী ছিলো। ফলে সৃষ্টি হয় একটি অশ্ব ব্যবসায়ী শ্রেণীর, যদিও পরে ব্যবসাটি শুধু পশ্চিম দেশীয়দের (ইন্দো-ইউরোপিয়ান) দখলে চলে যায়।

এইভাবে পশ্চিম ভারতের সঙ্গে পশ্চিমের সামুদ্রিক অঞ্চল, পারস্য উপসাগরীয় এবং লোহিত সাগরীয় অঞ্চলগুলোর যোগাযোগ গড়ে ওঠে। সমুদ্রপথের বিপদসংকুল দীর্ঘযাত্রায় ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধভাবে যাতায়াত করতো। অবাধ যাতায়াতের ফলে সিন্ধু অঞ্চলে সারা বছরই এই সমস্ত ব্যবসায়ীদের কোনও না কোনও দলে উপস্থিতি থাকতো। বেশির ভাগ অশ্ব ব্যবসায়ী ইন্দো-ইরাণীয় হওয়ায় তাদের ফার্সি কথ্যভাষার প্রভাব সিন্ধু অঞ্চলে কমবেশী বিস্তার লাভ করে। প্রাক ইসলামি যুগের এই সমস্তত ইরাণীয় অশ্ব ব্যবসায়ীরা জরথুষ্ট্র ধর্মাবলম্বী ছিলো। বহিরাগতদের উচ্চারণগত বিভ্রাটের কারণেই হিন্দু শব্দের উদ্ভব বলে ধারণা করা যায়। কারণ কথ্য ফার্সিতে 'স' শব্দের উচ্চারণ বাংলায় 'হ' শব্দের অনুরূপ। বহিরাগতরা সিন্ধু অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদেরকে হিন্দু বলে ডাকতো। ক্রমে তাদের আচরিত ধর্মও হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিতি পায়।

অপর মতে, হিন্দুকুশ পর্বত থেকে সিন্ধুনদ তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে হিন্দু বলে উল্লেখের তথ্য পাওয়া যায়। আবার অনেকের মতে, সম্ভবত ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা প্রথম হিন্দু কথাটির দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী বেশিরভাগ মানুষের পরিচয় দিতে শুরু করে এবং ৩ হাজার বছরের বেশি সময়ব্যাপী ভারতীয় সভ্যতাকে এই নামে অভিহিত করে। আবার প্রাচীন মুসলিম আরবি ও ফার্সি সাহিত্যে সিন্দ হিন্দ দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানের আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও সিন্ধু প্রদেশ 'সিন্দদেশ' নামে এবং পূর্বদিকের অঞ্চলকে অর্থাৎ বর্তমান ভারত ভুখণ্ডকে 'হিন্দদেশ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'হিন্দু' নামকরণটির উৎস যাই হোক না কেন, একথা স্পষ্ট যে বেদে বা উপনিষদে, কিংবা কোনও মুণি-ঋষি বা দেবতাদের মুখ থেকে হিন্দু নামকরণটি হয়নি। হিন্দু হিসেবে যারা পরিচিত, তারা এ নামটি পেয়েছে বিদেশী বহিরাগতদের কাছ থেকেই।

এতে অবশ্য দোষের কিছু নেই। বর্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ধর্ম খ্রিস্টান। শুরুতে খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তক যীশুর অনুগামীদেরকে 'নাজারিণ' নামে ডাকা হতো। বিরূদ্ধবাদীরা ব্যঙ্গার্থে বা গালাগাল করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে খ্রিস্টান বলতো। দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝির পর থেকে এই ধর্ম মতে বিশ্বাসীরা নিজেরাই নিজেদেরকে খ্রিস্টান বলে পরিচয় দিতে শুরু করে (সূত্র: ধর্মের উৎস সন্ধানে, ডক্টর ভবানীপ্রসাদ সাহু)। অনুরূপভাবে সনাতন পন্থীদেরকে যেভাবেই হিন্দু হিসেবে অভিহিত করা হোকনা কেন এই ধর্মমতের অনুসারীরা নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বা কুন্ঠাবোধ করে না, বরং গর্ববোধ করে।

সনাতনধর্ম শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ জানার আগে সনাতনধর্মকে কেন চিরস্থায়ী বা শাশ্বত ধর্ম বলা হয় তার কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। পূর্বে আমরা দেখেছি যে, প্রায় ৪০০০-৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মধ্য এশিয়ার পারস্য অঞ্চলের এক যাযাবর মানবগোষ্ঠী ভারতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করে ক্রমে স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ধাতু, অশ্ব ব্যবহারকারী, সুচতুর রথারোহী যোদ্ধা যাযাবর (পরবর্তীকালে অবশ্য কৃষিজীবী) সংখ্যালঘু আর্যগোষ্ঠীর সভ্যতাকে স্থানীয় অনার্য সম্প্রদায় মেনে নিতে বাধ্য হয়। প্রোথিত হয় বৈদিক মতের বীজ। তবে অনার্য সভ্যতাও অনুন্নত ছিল না। ঋগ্বেদে যে আবৃতপুরের উল্লেখ আছে, সেটি

অনার্য নগরী। দাস কথাটিও ইন্দো-ইরাণীয় ভাষায় আদিতে ছিল শত্রু-এর সমার্থক, যা পরবর্তীকালে পরাজিত শত্রুদের সম্পর্কে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বৈদিক মতের আগেও ভারতীয় অঞ্চলে শক্তিশালী ধর্ম বিশ্বাস ছিল। কিন্তু দখলদার আর্যদের শক্তি ও সংস্কৃতি এসব কিছুকে ছাপিয়ে যায়। ক্রমশ তারা এতদাঞ্চলের মানুষজনের সঙ্গে মিশে যায়-যা ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। সিন্ধু সভ্যতায় দেবী পূজা, ষাড়কে ধর্মীয় প্রতীকরূপে এবং তিন মাথাওয়ালা এক দেবতার আরাধনা ইত্যাদির নিদর্শন পাওয়া গেছে। এগুলো ধীরে ধীরে বৈদিক মতে পরিবর্তিত আকারে স্থান করে নেয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সিন্ধু এলাকাসহ সমগ্র ভারতীয় অঞ্চলে মাতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থা ছিল। সংগত কারণে তাদের আরাধ্যগণের বেশির ভাগ ছিল নারীরূপী। যাযাবর আর্যরা বৈদিক মতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা চালু করলেও মাতৃতান্ত্রিক আদিবাসীদের মন থেকে নারীরূপী দেবীদের প্রভাব কোনদিনই বিদূরিত হয়নি- যাকে আমরা এখন তন্ত্রমত বলে অভিহিত করতে পারি। তবে পুরুষ দেবতা যে একেবারে ছিল না তা নয়। নীরদ সি চৌধুরীর মতে, শিব হলো এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের আদি দেবতা। তিনি বৈদিক দেবতা রুদ্রের সঙ্গে শিব (মহাদেব)-কে অন্বিত করেছেন। তবে বর্তমানের শিব, বেদের শিব আর পৌরাণিক শিব পুরোপুরি এক নন। তাঁর মতে শিব পরিপূর্ণ দেবতা এবং তাঁর স্থান অনেক উপরে। তাই শিবকে ঈশ্বর, মহেশ্বর, পরমেশ্বর, মহাদেব বলা হয়। অবশ্য অনেক সমাজগবেষক নীরদ সি চৌধুরীর সঙ্গে এক মত পোষণ করেন না। (সূত্র: হিন্দুইজম; এ রিলিজিয়ন টু লিভ বাই)।

তবে অনার্য অধ্যুষিত অঞ্চলে শিব যে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল তা চেপে রাখতে পারেনি বৈদিক ঋষিরা। তাদের আটশাট বেড়া ফাঁক করে শিব ঢুকে পড়েছে মহাভারতেও। রাজশেখর বসু অনূদিত মহাভারতে দেখা যায়, বেদব্যাস বলছেন আর শিব তনয় গণেশ মহাভারত লিখছেন। এতে মনে হয় অসাধারণ স্মরণ শক্তি থাকলেও বেদব্যাস লেখাপড়া জানতেন না কিংবা জানলেও তাঁর লেখা অনার্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা সে সংশয় ছিলো। অনার্য দেবতা মহাদেবের ছেলে গণেশকে দিয়ে মহাভারত লেখানোর ফল হলো বৈদিক গ্রন্থে শিবের অনুপ্রবেশ। লেখক গণেশ মহাভারতের সর্বত্র শিবকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী দেবতা হিসেবে উল্লেখের প্রয়াস পেয়েছেন।

কালের পরম্পরায় এতদাঞ্চলের প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস এবং বৈদিক মত মিলে এক সুন্দর সনাতনধর্মের সৃষ্টি হলো। সময়ের গতি এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জীবের ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বভাবের নিয়ত পরিবর্তন ঘটছে। সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধন করেই সনাতনধর্মের বিশুদ্ধি রক্ষিত হয়। আর এ কারণেই এটি সনাতন নিত্য বা কখনও লোপ পায় না। হিন্দু ছাড়া অন্য সকলের শাস্ত্রবিহিত কর্মই কর্তব্য কর্ম। হিন্দুর কর্মজীবনে ও ধর্মজীবনে পার্থক্য নেই, তাই হিন্দুর সাংসারিক কর্মনিয়ামক শাস্ত্রও ধর্মশাস্ত্র হিসেবে বিবেচ্য। তিন-চার হাজার বছর আগে প্রবর্তিত কোনও শাস্ত্রবিধি যদি অবস্থার পরিবর্তনে সমাজের হিতসাধনের অন্তরায় হয় তবে তা অবশ্যই বর্জনীয়।

'কেবলম্ শাস্ত্রমাশ্রিত্যৌ ন কর্তব্যে বিনির্ণয়ঃ
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানি প্রজায়তে'- বৃহস্পতি।
'অন্যং তৃণমিব ত্যজমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা'-বশিষ্ঠ।

অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করেই কর্তব্য নির্ণয় করা ঠিক নয়, যুক্তিহীন বিচার ধর্মহানির নামান্তর- বৃহস্পতি। স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি অযৌক্তিক কথা বলেন তবে তাহা তৃণবৎ পরিত্যাগ করিবে-বশিষ্ঠ।

এহেন উদার মনোবৃত্তি আছে বলেই সনাতনধর্ম শাশ্বত বা চিরস্থায়ী। স্থান, কাল, পাত্রভেদে তা সততঃই পরিবর্তনশীল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রাচীন ভারতে গোমাংস ভক্ষণের রেওয়াজ ছিল। কৃষ্ণযর্জুবেদের মৈত্রায়নী শাখার অন্তর্ভুক্ত মানবগৃহ্যসূত্রে স্পষ্ট নির্দেশ আছে, বাড়িতে অতিথি এলে গোমাংস দিয়ে আপ্যায়ন করতে হবে এবং সংগে চারজন ব্রাহ্মনকেও মাংস ভোজনের আমন্ত্রণ জানাতে হবে (সূত্র: ধর্মের উৎস সন্ধানে, ডক্টর ভবানীপ্রসাদ সাহু, পৃ. ৬৭)। ঋগ্বেদেও অসংখ্যবার গো-মেধ যজ্ঞের উল্লেখ দেখা যায়। শুধুমাত্র সামাজিক প্রয়োজনে গো-সম্পদকে রক্ষার নিমিত্তে সনাতনধর্মে গো-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়। মনুসংহিতায় চণ্ডাল বা শূদ্রের প্রতি যে জঘন্য আচরণের বিধান আছে, বর্তমান সময়ে এর একশতাংশ করা হলেও নিশ্চিত লংকাকাণ্ড ঘটবে। সময়ের প্রেক্ষাপটে তা অবশ্যই বর্জনীয়। এগুলোকে আমরা যুগোপযোগী পরিবর্তন বলে ধরে নিতে পারি।

অবাস্তবকে বিয়োজন আর বাস্তবকে সংযোজনের মাধ্যমে সনাতনধর্ম হয়েছে সমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী। সনাতনই একমাত্র ধর্ম যার কাছে ধর্মের চেয়ে সমাজ ও মানুষের গুরুত্ব সবসময় অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে।

'ধর্ম' শব্দের ধর্মীয় ব্যাখ্যা: চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করেও স্রষ্টার তুষ্টি হলো না, কারণ সমাজের শান্তি রক্ষা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাই স্রষ্টাকে আবারও বসতে হলো সৃষ্টির তপস্যায়। সকলের ভালোর জন্য এবার সৃষ্টি করলেন 'ধর্ম-শ্রেয়োরূপম অত্যসৃজত ধর্মস'। প্রশ্ন হতে পারে শাসন নিয়মের জন্য তো ক্ষত্রিয় রাজারাই যথেষ্ট ছিলেন, আবার ধর্ম কেন? উপনিষদ জানিয়ে দিলো-'ধর্ম হলো ক্ষত্রেরও ক্ষত্রঃ তদেতৎ ক্ষত্রস্য রাজা-প্রজা সকলকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অবলীয়ান্ বলিয়াংসম্ আশংসতে ধর্মেন। অর্থাৎ ধর্মের তেজ এমনই যে, একজন সাধারণ মানুষও শারীরিক ও রাজনৈতিক শক্তিযুক্ত বলবত্তর মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অন্য দৃষ্টিতে এটাই হয়তো 'মরাল কারেজ' বা বাহ্যিক অর্থে 'কমন ল'।

আভিধানিক ব্যাখ্যা: ধৃ ধাতু মনিন্ প্রত্যয় যোগে ধর্ম শব্দ নিস্পন্ন-অর্থ যা ধারণ করে। ধারণ মানে যা গ্রহণ করতে হয় না, স্বাভাবিকভাবেই থাকে। জীবন্ত বা জড় সকলেরই ধর্ম আছে। যেমন পশুর ধর্ম পশুত্ব, আগুনের ধর্ম পোড়ানো, জলের ধর্ম ভিজানো এবং সেভাবেই মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। তাহলে ধর্ম গ্রহণ-বর্জনের কথা হয় কেন? অতি অবশ্যই ব্রাহ্মণ্যবাদের ছুৎমার্গের বিকৃত বিধান। পথের ভিন্নতা, মতের নয়। অমুক হিন্দু মুসলমান হয়েছে, আমি তা মানতে রাজি নই। সে তার উপাসনার পদ্ধতি পরিবর্তন করেছে মাত্র। একজন ইসলাম নির্দেশিত পথে উপাসনা করে তো, অন্যজন সনাতনধর্ম পথে। উপাস্য সকলের এক। আমরা যে যেভাবেই সম্বোধন করি না কেন, এতে পরমকরুণাময়ের মতত্বের হেরফের হয় না। মানুষের মধ্যে দুটো জাত আমি স্বীকার করতে পারি-এর একটি মানুষ অপরটি অমানুষ। যখন কোন মানুষ অমানুষ হয়ে যায়, আমার দৃষ্টিতে তখনই তার জাত যায়। বিবেকহীন মানুষই অমানুষ। তাহলে বিবেক কী?

আদিম যুগে মানুষ যখন গুহা খন্দরে থাকতো তখন অন্যান্য বন্য-চতুষ্পদী জন্তুর অনুকরণে অর্থাৎ মেরুদণ্ডকে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে চলাফেরা করতো। কিন্তু যেদিন পা দু'টিকে মাটিতে রেখে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে শিখলো বস্তুত সেদিন থেকেই তারা পশুদের থেকে ভিন্ন হয়ে গেলো। বিযুক্ত হলো পশুত্ব-যুক্ত হলো এক নতুন জিনিস, তার নাম 'বিবেক'। সৃষ্টির অপার সহস্য অবলোকন, উদঘাটন, ভালমন্দ বিচারের জন্য তারা নিয়ত বিবেকের দ্বারস্থ হতে লাগল। চাষা-রাজপুত্তুর, বালক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সকলের মধ্যেই বিবেক সতত ক্রিয়াশীল। যে চুরি করছে সে-ও জানে সে চুরি করছে, যে মিথ্যা বলছে সে-ও জানে সে মিথ্যা বলছে, এটাই বিবেক। স্বীয় অন্তরে যে বিবেকের বাণী অনুক্ষণ অনুরণিত হচ্ছে, মানুষ অনেক সময় তা উপেক্ষা করতে চায় কিংবা পাত্তা দেয় না। তখনই বাহির থেকে কেউ এসে জানিয়ে দেয় 'ওপথে যেও না, ফিরে এসো' -যেমনটি করেছিলেন গান্ধারী, পুত্র স্নেহে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে। নিজ স্বভাবে বা স্বরূপে ফিরে আসার যে আহ্বান সেটাই বিবেক, স্বভাবের অনুর্বতনই মানুষের একমাত্র ধর্ম। নইলে সে আর মানুষ থাকে না। হতে পারে সে রাজা, মহারাজা, পণ্ডিত, জ্ঞাণী-গুণী, কিন্তু মানুষ নয়। এত উদারতার পরও সনাতনধর্মের এহেন ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা কেন? এর উত্তর উদ্ধৃত করছি ডক্টর নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ির 'রামায়ণের নীতি ধর্ম' প্রবন্ধ থেকে। 'ধর্মের নামে এখন হিন্দুদের গভীর সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এ সংশয় মিটানোর জন্য আজকে অনেকেই ধর্ম সংস্থাপনের দায়িত্ব নিচ্ছেন, তাতে যন্ত্রণা আরো বেড়েছে। এদের

স্বকপোলকল্পিত ধর্ম ব্যাখ্যায় সরসতা যেমন আছে তেমনি আছে 'গুরু' দের অল্পজ্ঞতার যন্ত্রণা। এতে ধর্ম ব্যাখ্যাত হয় না, অধিকন্তু অতি চতুরতার জ্বালায় স্বাভাবিক ধর্মচেতনা ক্ষতবিক্ষত হয়। আর আছে ধর্মজ্ঞ বলে পরিচিত সম্প্রদায়ভিত্তিক ব্যক্তিরা। এদের চেতনা এতই দৃঢ় (!), ভাবনার মধ্যে কূপমণ্ডুকতার আপ্লুতি এতটাই বেশি যে ধর্মের ব্যাখ্যায় তারাও একই রকম বিকৃত'।

আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে ধর্ম ছিলো একটি সামাজিক বিধান যার উদ্দেশ্য সমাজকে সকল অহিতকর কাজ থেকে বিরত রেখে মানুষে মানুষে ভালবাসার বাতাবরণ তৈরি। প্রথমত শাসকদের স্বার্থ সংরক্ষণে, দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগত হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার অপপ্রয়াসে কতিপয় ধর্ম ব্যবসায়ীর বিকৃত ব্যাখ্যায় সনাতনধর্মের চলার গতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বেড়ে গেছে সাম্প্রদায়িকতা। কালের বিবর্তনে তা যে কী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল আমরা ক্রমান্বয়ে তার আলোচনা এবং স্বার্থান্বেষী ধর্মবেত্তাদের কালো মুখোশ উন্মোচনের চেষ্টা করব।

আমরা এক্ষণে আলোচনা করব সামগ্রিক 'সনাতনধর্ম'কে নিয়ে।
বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্তের বেড়াজাল ডিঙিয়ে সনাতনধর্মের যাত্রাপথ কখনো হয়েছে মসৃণ কখনো বা কন্টকাকীর্ণ। তবে চলার গতি থেমে থাকেনি; হয়তো অনাদিকাল চলতেই থাকবে।

ধর্মাচরণে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য থাকার পরও তন্ত্রমতের উপর লিখিত পুস্তকাদির সংখ্যা হাতেগোনা, যেগুলো আছে তা-ও অর্বাচীন কালের। প্রকৃতিকে নারী ভেবে তার পূজার্চনা করা ছিল আদিবাসী অনার্যদের প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য। মনে হয় পূজার্চনার আচরণীয় বিধি-বিধানগুলো মৌখিক পরম্পরায় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। পূজার্চনা করার নিয়মাচার সম্বলিত কোনও লিখিত পুস্তক না থাকার কারণেই হয়ত এক আরাধ্যের পূজায় এলাকা ভেদে বিভিন্ন নিয়মাচার কিংবা একই দেবীকে ভিন্ন ভিন্ন নামে এবং উপাচারে পূজা করার তথ্য পাওয়া যায়।

অপরদিকে বহিরাগত আর্যরা এতদাঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাদের যাবতীয় অনুশাসনাদি সংরক্ষণে তৎপর থাকে। এ জন্য অবশ্য তাদেরকে কম কাঠ খড় পোড়াতে হয়নি। স্থানীয়দের ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার মিল ছিল না। ফলে চাপিয়ে দেয়া অনুশাসনাদি স্থানীয়রা বুঝতো না, মানতও না। এক পর্যায়ে তারা উভয় ভাষা থেকে অর্থাৎ আর্য-অনার্য ভাষা থেকে শব্দ নিয়ে একটি নতুন ভাষার জন্ম দেয়। সংস্কারের মাধ্যমে জন্ম হয়েছে বলে তার নাম হলো সংস্কৃত ভাষা। আর্যদের ধারণা ছিল এই মিশ্রিত ভাষা অনার্যরা মেনে নিবে। বাস্তবত তা হয়নি। এই ভাষা শাসক আর্যদের সভাকক্ষ এবং কতিপয় মুণি ঋষির শয়নে-স্বপনে-নিশি-জাগরণে আপ্তবাক্য হলেও সাধারণ্যে কোনদিন ঢুকো পায়নি।

শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে হোক বা আর্যদের আভিজাত্যের মোহে-ই হোক মুণিঋষিরা প্রার্থনার মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃত ভাষাকে বেছে নিলেন। তাদের আবেগ, অনুভূতি ও প্রার্থনার ফসল হলো বেদ-যা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ এবং সনাতনধর্মীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এমতাবস্থায় প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ে বৈদিক গ্রন্থাদির উপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অল্পায়াসে কিছু করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি; ধর্মাচরণও তার ব্যতিক্রম নয়। অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল নিয়মাচার এবং মাধ্যম (পুরোহিত) দ্বারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পাদনের ব্যবস্থা থাকায় বৈদিক মত আর্য-অনার্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে দ্রুত প্রসার লাভ করে। অন্যদিকে স্থানীয় আদিবাসী অনার্যদের চিরাচরিত ধর্মীয় কৃষ্টি বৈদিক মতের কাছে আত্মসমর্পণ না করে আপন গতিতে চলতে থাকে। অগত্যা তৈরি করা হলো একটি আপোষরফা, বলা যায় এটাই পরিপূর্ণ সনাতনধর্ম। অথচ হালের অত্যুৎসাহী ধর্ম প্রচারকগণ সনাতনধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলে পার পেয়ে যাচ্ছে। কেউ তার প্রতিবাদ করছে না। ভাবতে কষ্ট হয়ে নিজেদের অনুসৃত ধর্ম সম্পর্কে কতটুকু অজ্ঞ বা নিস্পৃহ হলে এহেন ধর্মীয় হঠকারিতা হিন্দু সমাজ নীরবে মেনে নিচ্ছে। একক প্রবর্তক বা প্রচারক না থাকায় সনাতনধর্মের যে কোনও সমস্যা অল্পতেই সংকটে পরিণত হয়। তার সুযোগ নেয় সুবিধাবাদী ধর্মব্যবসায়ীর দল।

নারীগৃধনু পুরুষের পাল্লায় পড়ে পরিচয়হীনা, অসহায়া ষোড়শীতন্বী যেমন দলিত মথিত হয়, তেমন হয়েছে সনাতনধর্মের অবস্থা। শাসক, সমাজকর্মী বা ধর্ম বেনিয়াদের তৈরি ছলনার বাসরঘরে তাকে বার বার প্রতারিত করা হয়েছে। ক্ষত-বিক্ষত দেহের ঝরা রক্ত থেকে জন্ম নিয়েছে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, পারশত্য, বৈষ্ণব, ইত্যাকার নানান মতাদর্শের ফ্রাংকেনস্টাইন। নাহ! এতেও তৃপ্ত হয়নি কায়েমী স্বার্থবাদীদের চির অতৃপ্ত অন্তর। ক্ষমতার বুভুক্ষু উদর থেকে আরো জন্ম নেয় কথিত ষড়দর্শন: শংকরের বেদান্ত, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত, নিম্বার্কের-দ্বৈতাদ্বৈত, মধ্বাচার্যের- দ্বৈত, বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈত ও চৈতন্যের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। পরবর্তী সময়ে সৃষ্ঠ আর্য, ব্রাহ্ম নামীয় মতবাদের অস্তিত্ব ইতিহাসের পাতায় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বদান্যতায় দৃশ্যমান হলেও কত মতাদর্শ যে আতুর ঘরে মারা গেছে তার হিসেব কে করে?

এতে লাভ হয়নি সনাতনধর্মের বা তার অনুসারীদের, তবে ক্ষতি হয়েছে বিস্তর। নিত্য নতুন মতবাদ সৃষ্টির কারণে উদ্ভব হয়েছে নতুন নতুন সম্প্রদায়ের। সনাতনধর্ম থেকে নির্বাসিত হয়েছে মানবতাবোধ, বেড়েছে সাম্প্রদায়িকতা ও বিনষ্ট হয়েছে সামাজিক স্থিতিশীলতা। অন্যের মতামতকে উপহাস তাচ্ছিল্য করে স্ব-উদ্ভাবিত মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে শিখণ্ডী ধর্মবেত্তারা অনুগত সম্প্রদায়কে নগ্নভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। গড়ে ওঠা এ সমস্ত অন্ধ অনুগত সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী নিজ গুরুর (দলপতি) কথা ছাড়া অন্যের যুক্তিযুক্ত মতামত শুনে কানে আঙ্গুল ঢোকায় অথবা গর্ভবতী মহিলার ন্যায় উদ্‌গার বোধ করে। অন্যমতের অশ্লীল সমালোচনাই যেন এদের বিহিত ধর্ম। মতাদর্শ প্রবর্তকেরা বাহ্যিকভাবে সর্বত্যাগীর ভান করলেও আরাম-আয়েশ, সুখভোগের পাতিডালে বসে নিজেদের সামাজিক-বৈষয়িক অবস্থান পাকাপোক্ত করতে মরিয়া থাকে সর্বক্ষণ। 'তাল ঢুপ্ করিয়া পড়ে না পড়িয়া ঢুপ্ করে'-এ ধরনের আজগুবি, অযৌক্তিক ও শুষ্ক তর্কে বছরের পর বছর লিপ্ত থেকে নিজ অনুগতদের দেয়া উপঢৌকনের শ্রাদ্ধ করে, আর ডুবন্ত সনাতনধর্মের মাথায় চড়ে পাহারা দেয়- আহরিত সম্পদ ও সম্মান ঠিকঠাক আছে কি না।

সর্বমত সমন্বয়ের মাধ্যমে সনাতনধর্মকে সর্বগ্রাহ্য করার মানসে যে দু'চারজন মহামহিম উদ্যোগ নিয়েছিলেন, ধুরন্ধর ধর্মবাজ ও তাদের পেটোয়া বাহিনীর ষড়যন্ত্রে হয় এরা দেশছাড়া নয়তো জীবনহারা হয়েছেন। আজন্ম উচ্ছিষ্ঠ ভোগী সাগরেদদের বাহারি প্রচারণায় এ সমস্ত ধর্মবেনিয়ারা গুরু মহাগুরুরূপে হচ্ছে নমস্য। আর শবের ঘরে শকুন ঢুকিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছি আমরা। ভুলে গেছি গুরুরূপী (ব্রাহ্মণ) এই হায়েনার দল আমাদের সার্বিক অধিকার হরণে কতইনা ছলা-কলার আশ্রয় নিয়েছে। নীচজাতির বানোয়াট ধুঁয়া তুলে প্রকৃত জ্ঞানার্জনে যুগযুগ আমাদেরকে রেখেছে বঞ্চিত। লুডু খেলার ঘরের মতো নিজের ভাগ বাদে বাকি তিনভাগের উপর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গুরু বা ব্রাহ্মণ্যবাদের কর্তৃত্বের খড়গ সদা উদ্যত। শাস্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ- স্বয়ং অসমর্থে ব্রাহ্মণাং বৃণুয়াৎ (নিজে অসমর্থ হলে ব্রাহ্মণের শরণ লও)-কে অপব্যাখ্যা করে হিন্দুর যে কোনও সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাদের প্রয়োজনকে করে তুলেছে প্রশ্নহীন। জারি করেছে উপঢৌকন প্রাপ্তির হরেক বিধান। ব্রাহ্মণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, শূদ্র বা নীচ জাতির নিন্দা ও নারীর প্রতি আকণ্ঠ বিদ্বেষের আকর কতিপয় পাঁচালি পাঠের অধিকার পেয়ে আমাদের মত শূদ্ররা 'কাকায় ডাকছে...ভাই, আনন্দের আর সীমা নাই'-এর মত আহ্লাদে ধেইধেই করলেও এতদিনকার পুঞ্জিভূত হীনমন্যতাবোধ আজো আমাদের পিছু ছাড়ছে না। এর অন্যতম কারণ সনাতনধর্মে বিরাজিত বর্ণভেদ প্রথা যা পরে জাতিভেদে রূপান্তরিত হয়েছে।

(সনাতনধর্ম: মত ও মতান্তর বই থেকে সংকলিত)

সাহিত্য, মানবতা ও হিন্দুধর্ম

ড: সুজিত দত্ত

(“বিশ্বের সবচেয়ে জটিল ধর্মগুলির অন্যতম এই হিন্দু ধর্ম আজ ও এই বিশ্বের নানা সমস্যায় প্রায়শই এক বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে।”- অমর্ত্য সেন)

ক্লাশে একটি ছোটগল্প পড়াচ্ছিলাম-Paul D’Angelo-র লেখা ‘The Step Not Taken’। বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত গল্পটি The Globe and Mail পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সনে। গল্পটির সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

বহুতল বানিজ্যিক ভবনের elevator- এ শুধু দু’জন যাত্রী। পরস্পরের অপরিচিত - একজন লেখক নিজে এবং অন্যজন ২৪-২৫ বছরের যুবক। যুবকটি দেখতে খুব পরিপাটী - গায়ে কোর্ট-প্যান্ট, হাতে ব্রিফকেইজ, মনে হয় কোন অফিসের জুনিয়র ‘এক্সিকিউটিভ্’। সুইচ বোর্ড-এ লেখক চাপলেন দশ তলার বোতাম, আর যুবকটি পনেরো তলার। এলিভেটর চলতে শুরু করলো। হঠাৎ যুবকটি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিজে নিজে কী যেন বলতে লাগলেন। তার হাত থেকে ব্রীফকেইজটি পড়ে গেল; এবং ফুঁফিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে ধপাস করে এলিভেটরের মেঝেতে বসে পড়লেন।

লেখক এ’ অপ্রত্যাশিত ঘটনার কোন কারন বোঝে ওঠার আগেই এলিভেটর দশ তলায় এসে থামলো। দরজা খুলতেই লেখক বেরিয়ে গেলেন। এলিভেটর পরবর্তী গন্তব্যে ছুটে চললো। এবার শুরু হলো লেখকের অন্তর্দহন। তাঁর ধারণা এলিভেটরে সহযাত্রীকে ঐ অসহায় অবস্থায় ফেলে এসে তিনি ঠিক কাজটি করেননি। তাই নিজের বিবেকের কাছে তাঁর প্রশ্ন-“মানুষ হিসাবে মানুষের প্রতি আমার মানবিক দায়িত্ব আমি কি পালন করেছি? একজন অসহায় মানুষকে কোনরকম সাহায্যের প্রস্তাব না দিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে আমি কি মনুষ্যত্বের অবমাননা করিনি?”

নিজেকে বড় অপরাধী মনে করছেন লেখক। তবে নিজের এ অপরাধবোধের কথা যাদেরকেই বলেছেন তাঁদের প্রায় সবাই তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন “you’ve done the right thing, the ‘human’ thing”। কিন্তু কিছুতেই আশস্ত হতে পারছেন না লেখক। তাঁর ধারনা যুবককে কোন সাহায্যের প্রস্তাব না দিয়ে তিনি মস্ত ভুল করেছেন; মনুষ্যত্বের অবমাননা করেছেন। তাঁর মতে “The Step Not Taken” would have been the right thing, the human thing”।

নিজের অপরাধের জন্য লেখক খুবই অনুতপ্ত। তাঁর ইচ্ছে করে ১৫ তলায় গিয়ে যুবককে খুঁজে বের করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবেন। কিন্তু পরক্ষণে ভাবেন তা কি সম্ভব? বিরাট বানিজ্যিক ভবনের ১৫ তলায় আছে অনেক অফিস; সেখানে গিয়ে কোথায় খুঁজবেন তাঁকে? লেখক জানেন তাঁর এ অপরাধের ক্ষমা নেই। অন্তস্থিত কোন দুষ্ট ক্ষতের মতো যা সারাজীবন তাঁকে কষ্ট দিতে থাকবে। অকপটে নিজের ভুল স্বীকার করে লেখক গল্পটি শেষ করেছেন এভাবে- “ I was wrong, dreadfully wrong, not to step forward in his time of need....” ।

এবার ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত জানতে চাইলাম। জিজ্ঞেস করলাম “অসহায় যুবককে সাহায্যের প্রস্তাব না দিয়ে লেখক কি ঠিক কাজটি করেছেন?” ৪০ জন শিক্ষার্থীর ২৮ জন (যাঁদের জন্ম কানাডায়) সরাসরি উত্তর দিলেন, “He did the right thing”। তাঁদের যুক্তি “why should the writer interfere with the youth’s personal life?” বাকী ১২ জন international ছাত্র-ছাত্রী (যাঁরা এসেছেন এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশ থেকে)-র প্রায় সবাই অভিমত দিলেন “the writer didn’t do the right thing”| তাঁদের যুক্তি “if we don’t help others in need, how can we claim to be human?”

প্রিয় পাঠক, এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে কানাডীয় এবং বহিরাগত ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সামাজিক ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধের নিরীক্ষে বিচার্য্য। কানাডা ও আমেরিকান সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে খুব বড় করে দেখা হয় এবং অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমাদের দেশে অপরিচিত সহযাত্রিকে আমরা প্রায়ই জিজ্ঞেস করি, “আপনি কোথায় থাকেন? কী কাজ করেন? আপনার ছেলে-মেয়ে কতজন? ইত্যাদি। কিন্তু উত্তর আমেরিকার সমাজব্যবস্থায় কারো কাছ থেকে এসব ব্যক্তিগত বিষয় জানতে যাওয়া রীতি বহির্ভূত। তাই এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা মনে করেন “One way to respect people is not to involve with their personal lives”। তাঁদের দৃষ্টিতে যুবকের কাছে সাহায্যের প্রস্তাব দেওয়ার অর্থ হতো তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সামিল। অন্যদিকে প্রাচ্যের প্রায় সর্বত্রই সামাজিক রীতি হচ্ছে দুঃসময়ে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসা। সে দৃষ্টিকোন থেকে প্রয়োজনের সময় একজন বিপন্ন মানুষের পাশে না দাঁড়ানো শুধু স্বার্থপরতা নয়, মনুষ্যত্বের অবমাননাও বটে।

ছাত্র-ছাত্রীরা আমার মত জানতে চাইলো। আমি বললাম, “আমার সংস্কৃতি, আমার ধর্ম, এবং আমার দর্শন আমাকে এক অখণ্ড ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমি জেনেছি-

মাতা মে পার্বতি দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
ভ্রাতরাঃ মনুজাঃ সর্বে স্বদেশ ভুবনত্রয়ম।।

(আমাদের মা পার্বতি, আমাদের পিতা মহেশ্বর, সকল মানুষ আমাদের ভাই, এবং ত্রিভুবন আমাদের স্বদেশ)।

আমার ধর্ম আমাকে শিখিয়েছে “সকলের তরে সকলে আমরা।” এমনকি ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানানোর সময়ও আমরা নিজের এবং অন্য সকলের সামগ্রিক মঙ্গল প্রার্থনা করি এভাবে-

“সর্বেহহত্র সুখিণঃ সন্ত সর্বে সন্ত নিরাময়াঃ”
কিংবা
“সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বাথসাধিকে” ইত্যাদি।

এ রকম উদার ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই আমরা একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসতে চাই। একে অন্যের কল্যানে অবদান রাখতে চাই; অন্যকে সুখী দেখতে চাই। এটা আমাদের মানবিক দায়িত্ব। এই দৃষ্টিকোন থেকে আমি মনে করি যুবকটির বিপন্ন অবস্থায় নির্বিকার দর্শকের ভূমিকায় থেকে লেখক তাঁর মানবিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। লেখকের জায়গায় আমি থাকলে আমি অন্তত জিজ্ঞেস করতাম, “Excuse me, can I be of any help?”

‘The Step Not Taken’ ছোটগল্পে লেখক Paul D’Angelo তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্বহীনতার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। যুবকটির উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন, “I hope that somehow he

gets to read these words, because I want him to know that I'm pulling for him....That I was wrong, dreadfully wrong...That I'm sorry"।

আমরা জানি ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ। ব্যক্তি যখন সমাজের অন্য দশজনের প্রতি তাঁর মানবিক দায়িত্ব পালনে অনাগ্রহী হয়ে ওঠেন, তখন সমাজে --- ক্ষতের সৃষ্টি হয়। মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে। স্বার্থপরতার কালো মেঘে চারদিক ছেয়ে যায়; নেমে আসে অন্ধকার। সমাজে দেখা দেয় অরাজকতা, ঘটে নৈতিক অবক্ষয়। আর তখনই এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সামাজিক ন্যায়নীতির প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী করে অনুভূত হতে থাকে। এমনই এক সামাজিক অবক্ষয়ের প্রকৃষ্ট চিত্র উঠে এসেছে নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক T.S. (Thomas Stern) Eliot এর কালজয়ী কবিতা The waste Land-এ। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ সনে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে।

Waste Land মানে শুষ্ক, ধূসর, বিরাণ ভূমি। এখানে সবুজের লেশমাত্র নেই। দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টির কারণে এখানে ঋতুচক্রের আবর্তন থেমে আছে। এখানে সবকিছুই স্থবির; কোথাও কোন পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। এই Waste Land আসলে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের প্রতিচ্ছবি, কবি যাকে বলেছেন "Stony rubbish"। এখানে জীবনের কোন মূল্য নেই; "নেইকো ভালোবাসা। নেইকো স্নেহ"। ইঁদুর দৌড়ে ব্যস্ত এখানকার মানুষের নেই কোন নির্দিষ্ট গন্তব্য; অবিরত তাঁরা ঘুরপাক খাচ্ছেন গোলক ধাঁধায়। কবির ভাষায় এ সমাজের মানুষগুলো হচ্ছে "crowds of people, walking round a ring"।

Waste Land এর লোকজন হৃদয়হীন। ভালোবাসা এদের কাছে দেহসর্বস্ব যৌনতা ছাড়া আর কিছু নয়; আবেগহীন জৈবিক লালসা মেটানোর এক নিছক উপায় মাত্র। যৌনতার আগুনে দগ্ধ এ'সমাজে "the union of sexes is simply the use of abortive pills"। এখানকার ভূমি যেমন বন্ধ্যা, ভালোবাসাও তেমনি নিষ্ফলা, সৃষ্টিরহিত। এ সমাজে মানবিক গুনাবলী উপেক্ষিত। প্রত্যেক মানুষ যেন এক একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ- মন খুলে কেউ কারো সাথে কথা বলে না। সকলের মনে ভয়, সংশয়, হতাশ, আর অবিশ্বাস। এ এক চরম উচ্ছৃঙ্খল সমাজ যেখানে "millions live alone"। এখানে কারো বিপদে কেউ বিচলিত হয় না; Elevator- এ কোন বিপন্ন সহযাত্রী কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে পড়ে গেলেও কেউ কোন সাহায্যের হাত বাড়ায় না।

কবি জানেন, একটা সময় ছিল যখন এদেশ ছিল সবুজে শ্যামলে ভরপুর- ঋতুবৈচিত্রে সমৃদ্ধ। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল মানুষে মানুষে। জীবনে রঙ ছিল, আবেগ ছিল; আনন্দ ছিল; ছিল শান্তি, সম্প্রীতি এবং সংহতি। একজনের দুঃখে অন্য দশজন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। তখন মানুষ ছিল পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, সংবেদনশীল। পক্ষান্তরে আজ সবকিছুই বিবর্ণ। দীর্ঘদিন বৃষ্টি নেই। বৃষ্টি আনে জল। জলই তো জীবন। জলের অভাবে প্রকৃতি আজ শুকিয়ে একাকার হয়ে আছে। এক অরাজক অবস্থার মধ্যে হাবুডবু খাচ্ছে পুরো পাশ্চাত্য সমাজ। বন্ধ্যা বসুন্ধরা, বিপন্ন মানবতা, দুর্বিসহ জীবন। আজ চারদিক থেকে শুধু ভেসে আসছে মুক্তিপিপাসু মানুষের আকুল আকুতি-

> "নতুন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী
> কর ত্রান, মহা প্রাণ, আনো অমৃত বানী।"

কিন্তু কোথায় আছেন সেই মহাপ্রাণ যিনি শোনাবেন মুক্তির বারতা, দেবেন মুক্তির দিগনির্দেশনা?

বিরাণ ভূমিকে সজীব করে তুলতে চাই বৃষ্টি। কোথায় সে মেঘ যা বৃষ্টি নিয়ে আসবে বিরান ভূমিতে? বৃষ্টি জীবন-সঞ্চারি, যা পুঞ্জিভূত পাপকে ধুয়ে দিয়ে পূন্যস্নানে এ দগ্ধ ভূমিকে আবার পবিত্র করে তুলবে?

ইউরোপের আকাশে কোথাও মেঘের কোন আভাস চোখে পড়ছে না। বহুদর্শী কবি এবার তাঁর দৃষ্টি ফেরালেন ইউরোপের বাইরে, "দূরে, বহুদূরে, স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনিপুরে"- আধ্যাত্মিক ভাবধারা সমৃদ্ধ ভারতবর্ষে যেখানে পুণ্যসলিলা, পাপনাশিনী পবিত্র গঙ্গা চির বহমান। কবির বিশ্বাস ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শনই এই স্থবির অবস্থা থেকে উত্তরণের সঠিক পথের নির্দেশ দিতে পারবে।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, কবি টি,এস,এলিয়ট-এর জন্ম আমেরিকায়; জীবনের সিংহভাগ কাটিয়েছেন বৃটেনে; এবং পড়ালেখা করেছেন হার্ভাডে, সরবোনে (প্যারিস) এবং অক্সফোর্ডে। Harvard-এই এলিয়ট প্রফেসর Charles Lanman এবং প্রফেসর James Woods-এর অধীনে সংস্কৃত সাহিত্য, হিন্দু ধর্ম ও পাতঞ্জলির 'যোগসূত্র' অধ্যয়ন করেছিলেন- যা তাঁকে এক আলোকিত ভূবনের সন্ধান দিয়েছিল। Virginia বিশ্ববিদ্যালয়ে Page Barbourne বক্তৃতায় ১৯৩৩ ইংরেজিতে এলিয়ট বলেছেন,

> "Two years Spent in the study of
> Sanskrit under Charles Lanman
> and a year in the mazes of
> patanjali's metaphysics under
> the guidance of James woods
> left me in a state of enlightened
> mystification."

সেই "enlightened mystification" বা "দিব্যানুধাবন" অবস্থা থেকে কবি হিমালয়ের সন্নিকটে পবিত্র গঙ্গার উপরে আকাশে বৃষ্টিসম্ভবা মেঘের আনাগোনা দেখতে পেলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল বৃহদারন্যক উপনিষদে বর্ণিত সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির সমাবর্তনের কথা। এলিয়ট তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'The waste Land' এর শেষ অংশের নামকরণ করেছেন "What the thunder said"। এটা উপনিষদের শিক্ষার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। কবি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন উপনিষদের শিক্ষার বাস্তব অনুশীলনই এই অধঃপতিত সমাজের অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তির সন্ধান দেবে এবং সৌহার্দ্য, সহানুভূতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মন্ত্রে সবাইকে উজ্জীবিত করে তুলবে। এলিয়ট লিখেছেন-

> "Ganga was sunken, and the limp leaves
> waited for rain, while the black clouds
> Gathered for distant, over Himavant (Himalaya)
> The jungle crouched, humped in silence.
> Then spoke the thunder
> DA
> ......
> Datta, Dayadhvam, Damyate
> Shantih, Shantih, Shantih

এলিয়ট এখানে প্রজাপতির সমাবর্তনের কাহিনীটির অবতারণা করেছেন। অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যাবার আগে প্রজাপতি সমাবর্তন অনুষ্ঠান এর আয়োজন করলেন। শিক্ষার্থীরা তিন ভাগে বিভক্ত মানুষ, দেবতা, ও অসুর। আদর্শ জীবন যাপনের জন্য সমবেত শিক্ষার্থীদের আচার্য্য উপদেশ দেবেন এবং সেই সাথে তাঁদের অধীত বিদ্যার পরিপূর্ণতা যাচাই করবেন। এমন সময় প্রকট শব্দে মেঘ গর্জে ওঠলো। শোনা গেল একটি শব্দ 'দ'। এবার আচার্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "এই 'দ' আদ্যক্ষর দিয়ে তোমরা দলগতভাবে তোমাদের কর্তব্য নির্দেশক একটি উপযুক্ত শব্দ তৈরি কর যার অনুশীলন তোমাদের সকলের শান্তি, সমৃদ্ধি ও সহাবস্থান সুনিশ্চিত করবে।"

প্রথমে মানুষদের পালা। তাঁরা বললেন 'দ' তে "দত্ত"। প্রজাপতি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "তোমরা ঠিকই বুঝেছ। তোমাদের লোভ তোমাদের আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থান্ধ করে রেখেছে। নিজের যা' আছে তা' অন্যের সাথে ভাগাভাগি করলে তোমাদের লোভ কেটে যাবে; সমাজে শান্তি

আসবে।” এবার দেবতাদের পালা। তাঁরা ‘দ’ দিয়ে নিষ্পন্ন করলেন “দয়াদ্ধম্”। প্রজাপতি বললেন, “তোমরা সঠিক শব্দটি বেছে নিয়েছো। তোমাদের অহংকার আছে। অন্যদের প্রতি সহমর্মিতা দেখালে তোমাদের অহংকার চলে যাবে। সমাজে সমতা ও সহানুভূতি প্রতিষ্ঠিত হবে। সবশেষে অসুরেরা ‘দ’ দিয়ে ‘দম্যত’ শব্দ তৈরি করলেন। প্রজাপতি তাঁদের আশ্বস্ত করলেন, “তোমাদের নির্বাচন যথার্থ হয়েছে। তোমরা স্বভাবে উগ্র। এই উগ্রতাই শান্তির অন্তরায়। তাই তোমাদের উগ্রতাকে দমন করতে পারলেই শান্তি নিশ্চিত হবে।

শিক্ষার্থীর সাফল্যে সন্তুষ্ট হয়ে আচার্য্য বললেন, “তোমরা তোমাদের স্ব স্ব কর্তব্য যথাযথ অনুধাবন করতে পেরেছ। তোমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। তবে মনে রেখো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য তোমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে ঐ তিন মৌলিক কর্তব্য- ‘দত্ত’, ‘দয়াদ্ধম্’ ও ‘দম্যত’। তোমরা যদি স্ব স্ব কর্তব্য সম্পাদনে আন্তরিক না হও, তবে তোমাদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন টুটে যাবে এবং অশান্তির দাবানল তোমাদের পুরে মারবে।”

উপনিষদের কাহিনীর উদ্বৃতি দিয়ে এলিয়ট বোঝাতে চেয়েছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের জনগণের ঐ তিন মৌলিক কর্তব্য সম্পাদন করা অতীব জরুরী। হতাশায় নিমজ্জিত পাশ্চাত্য সমাজে জীবন বিপর্যস্ত। সুকুমার মানবিক বৃত্তিগুলো- প্রেম-প্রীতি, মানবতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, ও সহমর্মিতা- এখানে চরমভাবে উপেক্ষিত। এখানকার মানুষগুলো স্বার্থান্ধ, পরস্পর বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। এদের মধ্যে আন্তরিকতার বড় অভাব। এরা-

“দ্বেষ, ঈর্ষা, কুৎসার কলুষে
আলোহীন অন্তরের গুহাতলে
হেথা রাখে পুষে ইতরের অহংকার
গোপন স্বভাব তার।”

এলিয়টের Waste Land এর বিপন্ন মানুষ অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে- “কখন মুক্তি আসবে?” কবিতার শেষাংশে কবি আশার বানী শুনিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস যখন স্বার্থান্ধ না হয়ে অন্যের সুখ-দুঃখের অংশীদার হবে, যখন নিজের লোভ সংবরণ করে অপরের কল্যানে অবদান রাখবে, যখন নিজের অহংবোধ ও আগ্রাসী মনোভাবকে দমন করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে আগ্রহী হবে তখনই মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটবে এবং মানবতা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তখনই বাষ্পীভূ পবিত্র গঙ্গাবারি যা ঘনীভূত হয়ে হিমালয়ের অদূরে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের সৃষ্টি করেছে তা বৃষ্টির ধারারূপে বিরাণভূমিতে নেমে আসবে। ধরণী শীতল হবে। পুঞ্জীভূত সমস্ত পাপ ও পঙ্কিলতা ধূয়ে মুছে যাবে! বন্ধ্যা ধরণী আবার সজীব, সতেজ হয়ে উঠবে। আর তখনই এলিয়টের ভাষায় সর্বত্র বিরাজ করবে Shantih, Shantih, Shantih.

কবি এলিয়টের মত বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী ও নীতিশাস্ত্রবিদরা জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন বেদে, উপনিষদে এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শনে। বিশ্বশান্তি ও মানবতার বিকাশে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রী নরসিংহ চৈতন্য আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত “East Meets West” শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে-

“....the precious commodity of the spiritual gems of the Vedas, the Gita, and India’s other literary jewels continue to shine light on the proper utilization of the modern world of material affluence.”

(লেখক: প্রফেসর, ইংলিশ ও কম্যুনিকেশনজ, জর্জ ব্রাউন কলেজ, টরন্টো)

মানুষ জোর করিয়া কিছুই করিতে পারে না। তিনি যেভাবে, যেমন ধারণা যাহার মনে আনিয়া দিতেছেন সে সেইভাবেই ধারণা করিতে বাধ্য হইতেছে। নিজস্ব চেষ্টায় যদি কিছু হইবার হয়, সে চেষ্টার ভাবটিও সেই ভাবময়ই সৃষ্টি করিয়া দিতেছেন। নির্ভুল তাঁহার হিসাব। যেখানে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই যথাসময়ে জাগাইয়া তুলিতেছেন। বিশ্বাসও দিতেছেন- অবিশ্বাসও দিতেছেন। নিজস্ব কৃতিত্ব কাহারও কিছু নাই। যদি বিশ্বাস ঠিক মত আসিয়া থাকে, তাহা হইলে এক দিন না এক দিন সেই আন্তরিক বিশ্বাসের পথে তিনি আসিয়া দেখা দিবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

-শ্রীশ্রীবরদাচরণ

গীতা প্রসঙ্গ

গীতা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের
১৯০০ খ্রী: সানফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতা

১

(১৯০০ খ্রীঃ ২৬ মে, স্যানফ্রান্সিস্কো)

গীতা বুঝিতে হইলে ইহার ঐতিহাসিক পটভূমি বোঝা প্রয়োজন। গীতা উপনিষদের ভাষ্য। উপনিষদ্ ভারতের প্রধান ধর্মগ্রন্থ---খ্রীষ্টান জগতে নিউ টেস্টামেন্টের মতো ভারতে ইহার স্থান। উপনিষদের সংখ্যা একশতেরও অধিক; কোনটি ছোট এবং কোনটি বড় হইলেও প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র গ্রন্থ। উপনিষদ্ কোনও ঋষি বা আচার্যের জীবন-কাহিনী নয়, ইহার বিষয়বস্তু আত্মতত্ত্ব। উপনিষদের সূত্র সমূহ রাজাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিদ্বৎসভায় আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 'উপনিষদ' শব্দের একটি অর্থ---(আচার্যের নিকট) উপবেশন। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা উপনিষদ্ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, ইহাদিগকে কেন সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক বিবরণ বলা হয়। দীর্ঘ আলোচনা সমাপ্ত হইবার পর সাধারণতঃ স্মরণ করিয়া এগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। পূর্বাপর সম্বন্ধ বা পটভূমি নাই বলিলেই হয়। জ্ঞানগর্ভ বিষয়গুলি শুধু উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি খ্রীষ্টের ৫০০০ বৎসর পূর্বে। উপনিষদগুলি ইহারও অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর আগেকার---ঠিক কখন ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে কেহ বলিতে পারে না। উপনিষদের ভাবগুলিই গীতায় গৃহীত হইয়াছে---কোন কোন ক্ষেত্রে হুবহু শব্দ পর্যন্ত। সেগুলি এমনিভাবে গ্রথিত যে, সমগ্র উপনিষদের বিষয়বস্তুটি যেন সুসম্বদ্ধ, সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ। এত বিরাট যে, যদি ইহার শ্লোকগুলি একত্র করা হয়, তবে এই বক্তৃতা-গৃহটিতে স্থান-সঙ্কুলান হইবে না। ইহা ছাড়া কিছু নষ্টও হইয়া গিয়াছে। বেদ বহু শাখায় বিভক্ত; এক একটি ঋষি-সম্প্রদায় ছিলেন এক একটি শাখার ধারক ও বাহক। ঋষিগণ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে শাখাগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষে এখনও অনেকে আছেন, যাঁহারা উচ্চারণের কিছুমাত্র ভুল না করিয়া বেদের অধ্যায়ের পর অধ্যায় আবৃত্তি করিতে পারেন। বেদের বৃহত্তর অংশ এখন আর পাওয়া যায় না, কিন্তু যে অংশ পাওয়া যায়, তাহা লইয়াই একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার হইতে পারে। বেদের প্রাচীনতম অংশে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি পাওয়া যায়। বৈদিক রচনাবলীর পারম্পর্য-নির্ণয়ের জন্য আধুনিক গবেষকদের একটি ঝোঁক দেখা যায়--কিন্তু এ বিষয়ে গোঁড়া ও প্রাচীনপন্থীদের ধারণা অন্যরূপ; যেমন বাইবেল সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা আধুনিক গবেষকদের মত হইতে ভিন্ন। বেদকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ একটি দার্শনিক অংশ---উপনিষদ্, অন্যটি কর্মকান্ড।

কর্মকান্ড সম্বন্ধে এখন একটি মোটামুটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। অনুষ্ঠান-বিধি ও স্তবস্তুতি লইয়াই কর্মকান্ড; বিভিন্ন দেবতার উদ্দ্যেশে বিভিন্ন স্তব। কর্মকান্ডের মধ্যে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত বিধিসমূহ পাওয়া যায়---উহাদের কতকগুলি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। বহু হোতা ও পুরোহিতের আবশ্যক। যাগযজ্ঞের বিশদ অনুষ্ঠানের জন্য হোতা, ঋত্বিক প্রভৃতির কার্য একটি বিশেষ বিজ্ঞানে পরিণত হয়। ক্রমশঃ এই সব স্তব ও যাগযজ্ঞকে কেন্দ্র করিয়া সর্ব সাধারণের মধ্যে একটা শ্রদ্ধার ভাব গড়িয়া উঠে দেবতাগণ তখন অন্তর্হিত হন এবং যাগযজ্ঞই তাঁহাদের স্থান অধিকার করে। ভারতে ইহা একটি অদ্ভুত ক্রমপরিণতি। গোঁড়া হিন্দু (মীমাংসক) দেবতায় বিশ্বাসী নন; যাঁহারা গোঁড়া নন, তাঁহারা দেবতায় বিশ্বাসী। নিষ্ঠাবান হিন্দুকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, বেদে উল্লিখিত দেবতাগণের তাৎপর্য কি, তাহা হইলে তিনি ইহার সদুত্তর দিতে পারিবেন না। পুরোহিতরা মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। গোঁড়া হিন্দুদিগকে ইহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, শব্দের এমন একটি শক্তি আছে, যাহা দ্বারা বিশেষ ফল উৎপন্ন হয়, এই পর্যন্ত। প্রাকৃতিক ও অতি-প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তিই উহার মধ্যে আছে। অতএব বেদ হইল শব্দরাশি, যাহার উচ্চারণ নির্ভুল হইলে আশ্চর্য ফল উৎপন্ন হইতে পারে। একটি শব্দেরও উচ্চারণ ভুল হইলে চলিবে না। প্রত্যেকটি শব্দ বিধিমত উচ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। এইরূপে অন্যান্য ধর্মে যাহাকে প্রার্থনা বলা হয়, তাহা অন্তর্হিত হইল এবং বেদই দেবতারূপে পরিণত হইল। কাজেই দেখা যাইতেছে, এ মতে বেদে শব্দরাশির উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এইগুলি হইল শাশ্বত শব্দরাশি, যাহা হইতে সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দ ছাড়া কোনও চিন্তার অভিব্যক্তি হয় না। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা চিন্তারই অভিব্যক্তি এবং চিন্তা ব্যক্ত হয় কেবলমাত্র শব্দের সাহায্যে। যে শব্দরাশি দ্বারা অব্যক্ত চিন্তা ব্যক্ত হয়, তাহাই বেদ। অতএব বলা যায়, প্রত্যেকটি বস্তুর বাহিরের যে অস্তিত্ব, তাহা নির্ভর করে বেদের উপর, কারণ শব্দ ছাড়া চিন্তার অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। যদি 'অশ্ব' শব্দটি না থাকিত, তবে কেহই অশ্ব সম্বন্ধে থাকা চাই। প্রকৃতপক্ষে এই শব্দগুলি কি? এগুলি বেদ। হিন্দুরা এই ভাষাকে মোটেই সংস্কৃত বলেন না; ইহা বৈদিক বা দেবভাষা। সংস্কৃত তাহার একটি বিকৃত রূপ; অন্যান্য ভাষাগুলিও তাহাই। বৈদিক ভাষা হইতে প্রাচীনতর আর কোনও ভাষা নাই। আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন---বেদসমূহের রচয়িতা কে? এগুলি কাহারও দ্বারা লিখিত হয় নাই। শব্দরাশিই বেদ। একটি শব্দই বেদ, যদি আমি ঠিকভাবে তাহা উচ্চারণ করিতে পারি। ঠিকভাবে উচ্চারিত হইলে তৎক্ষণাৎ উহা বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবে।

এই বেদরাশি অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান এবং এই শব্দরাশি হইতে সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত। কল্পান্তে এই সব শক্তির প্রকাশ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া প্রথমে কেবল শব্দে এবং পরে চিন্তায় লীন হইয়া যায়। পরবর্তী কল্পে চিন্তা প্রথমে শব্দরাশিতে ব্যক্ত হয় এবং পরে শব্দগুলি হইতে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই জন্য যাহা বেদে নাই, তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব, তাহা ভ্রান্তিমাত্র। বেদের এই অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদনের জন্য বহু গ্রন্থ আছে। যদি আপনারা বলেন, বেদ মানুষের দ্বারা রচিত, তাহা হইলে এই সব গ্রন্থের রচয়িতাদের নিকট আপনারা হাস্যাস্পদ হইবেন। মানুষের দ্বারা বেদ প্রথমে সৃষ্ট হইয়ছিল---এ কথার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না।

বুদ্ধদেবের কথা ধরা যাক। প্রবাদ আছে, তিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বেদপাঠও করিয়াছিলেন। যদি খ্রীষ্টান বলে, 'আমার ধর্ম ঐতিহাসিক ধর্ম এবং সেইজন্যই উহা সত্য, আর তোমার ধর্ম মিথ্যা।' মীমাংসক উত্তর দিবেন, 'তোমার ধর্মের একটি ইতিহাস আছে এবং তুমি নিজেই স্বীকার করিতেছ, কোনও মানুষ উনিশ শত বৎসর পূর্বে ইহা আবিষ্কার করিয়াছে।' যাহা সত্য তাহা অসীম ও সনাতন। ইহাই সত্যের একমাত্র লক্ষণ। সত্যের কখনও বিনাশ নাই--ইহা সর্বদা একরূপ। তুমি স্বীকার করিতেছ, তোমার ধর্ম কোন-না-কোন ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল। বেদ কিন্তু সেরূপ নয়; কোনও অবতার বা মহাপুরুষ দ্বারা উহা সৃষ্ট নয়। বেদ অনন্ত শব্দরাশি---স্বভাবতঃ যে শব্দগুলি শাশ্বত ও সনাতন, সেগুলি হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি ও সেগুলিতেই ইহার লয় হইতেছে। তত্ত্বের দিক দিয়া ইহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। ...সৃষ্টির আদিতে শব্দের তরঙ্গ। জীবসৃষ্টির আদিতে জীবাণুর মতো শব্দতরঙ্গেরও আদি-তরঙ্গ আছে। শব্দ ছাড়া কোন চিন্তা সম্ভব নয়।

যেখানে কোনও বোধ চেতনা অনুভূতি আছে, সেখানে শব্দ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যখন বলা হয়, চারখানি গ্রন্থই কেবল বেদ, তখন ভুল বলা হয়। তখন বৌদ্ধেরা বলিবেন, 'আমাদের শাস্ত্রগুলিই বেদ, সেগুলি পরবর্তী কালে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে।' তাহা সম্ভব নহে, প্রকৃতি এইভাবে কার্য করে না। প্রকৃতির নিয়মগুলি একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হয় না। মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মের খানিকটা আজ ও খানিকটা কাল প্রকাশিত হইবে, এরূপ হয় না। প্রত্যেকটি নিয়ম পরিপূর্ণ। নিয়মের ক্রমবিবর্তন মোটেই নাই। যাহা হইবার তাহা একবারেই প্রকাশিত হইবে। 'নূতন ধর্ম', 'মহত্তর প্রেরণা' প্রভৃতি শব্দ নিতান্ত অর্থহীন। প্রকৃতির শতসহস্র নিয়ম থাকিতে পারে, মানুষ আজ পর্যন্ত তাহার অতি অল্পই হয়ত জানিয়াছে। তত্ত্বগুলি আছে, আমরা সেগুলি আবিষ্কার করি---এই মাত্র। প্রাচীন পুরোহিতকূল এই শব্দরাশির উচ্চারণ-বিধি অধিগত করিয়া দেবতাদের স্থানচ্যুত করিয়াছেন এবং তাহাদের স্থলে নিজদিগকে বসাইয়াছেন। তাঁহারা বলিলেনঃ শব্দের কি অদ্ভুত শক্তি, তাহা তোমরা জান না! ঐগুলি কিভাবে ব্যবহার করা যায়, আমরা জানি। এই পৃথিবীতে আমরাই জীবন্ত দেবতা। আমাদের অর্থ দাও। অর্থের বিনিময়ে আমরা বেদের শব্দরাশিকে এমনভাবে কাজে লাগাইব, যাহাতে তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তোমরা কি নিজেরা বেদমন্ত্র যথাযথ উচ্চারণ করিতে পার? পার না; সাবধান, যদি একটিও ভুল কর, তবে ফল বিপরীত হইবে। তোমরা কি ধনবান, ধীমান ও দীর্ঘায়ু হইতে চাও এবং মনোমত পতি বা পত্নী লাভ করিতে চাও? তাহা হইলে পুরোহিতদের অর্থ দাও এবং চুপ করিয়া থাক।

আর একটি দিক আছে। বেদের প্রথম অংশের আদর্শ অপর অংশ উপনিষদের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথম অংশের যে আদর্শ, তাহার সহিত এক বেদান্ত ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের আদর্শের মিল আছে। ইহলোকে ও পরলোকে ভোগই ইহার মূল কথা---স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা। অর্থ দাও, পুরোহিতরা তোমাকে ছাড়পত্র দিবেন- পরকালে স্বর্গে তুমি সুখে থাকিবে। সেখানেও তুমি সব আত্মীয়-স্বজনকে পাইবে এবং অনন্তকাল আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিবে। অশ্রু নাই, দুঃখ নাই---শুধু হাসি আর আনন্দ। পেটের বেদনা নাই---যত পার খাও। মাথা-ব্যাথা নাই, যত পার ভোজসভায় যোগদান কর। পুরোহিতদের মতে ইহাই মানব-জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য।

এই জীবন-দর্শনের অন্তর্ভূক্ত আর একটি বিষয়ের সহিত আধুনিক ভাবধারার অনেকখানি মিল আছে। মানুষ প্রকৃতির দাস এবং চিরকালই সে এইরূপ থাকিবে। আমরা ইহাকে 'কর্ম' বলি। কর্ম একটি নিয়ম; ইহা সর্বত্র প্রযোজ্য। পুরোহিতদের মতে সকলেই কর্মের অধীন। তবে কি কর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার উপায় নাই? তাঁহারা বলেন, 'না! অনন্তকাল প্রকৃতির ক্রীতদাসরূপে থাকিতে হইবে---তবে সে দাসত্ব সুখের! যদি আমাদের উপযুক্ত দক্ষিণা দাও, তবে শব্দগুলি এমনভাবে ব্যবহার করিব, যাহাতে তোমরা পরলোকে কেবল ভালটুকুই পাইবে, মন্দটুকু নয়।'---মীমাংসকেরা এইরূপ বলেন। যুগ যুগ ধরিয়া এইরূপ আদর্শই সাধারণের নিকট প্রিয় হইয়া আছে। জনসাধারণ কখনও চিন্তা করে না। যদি কেহ কখনও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহাদের উপর কুসংস্কারের প্রচন্ড চাপ পড়ে।

এই দূর্বলতার জন্য বাহিরের একটু আঘাতে তাহাদের মেরুদন্ড ভাঙিয়া টুকরো টুকরো হইয়া যায়। প্রলোভন ও শাস্তির ভয় দ্বারা তাহারা চালিত হয়। নিজেদের ইচ্ছায় তাহারা চলিতে পারে না। সাধারণ লোককে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে হইবে; চিরকাল ক্রীতদাস হইয়া তাহারা থাকিবে। পুরোহিতদের দক্ষিণা দেওয়া এবং তাহাদের মানিয়া চলা ছাড়া আর কোনও কর্তব্য নাই---বাকি যাহা করণীয়, তাহা যেন পুরোহিতরাই করিয়া দিবেন। ধর্ম এইভাবে কতখানি সহজ হইয়া যায়। কারণ আপনাদের কিছুই করিবার নাই---বাড়ি গিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকুন। নিজেদের মুক্তিসাধনার সবই অপরে করিয়া দিবে। হায়, হতভাগ্য মানুষ!

পাশাপাশি আর একটি দার্শনিক চিন্তাধারা ছিল। উপনিষদ্ কর্মকান্ডের সকল সিদ্ধান্তের একেবারে বিপরীত। প্রথমতঃ উপনিষদ্ বিশ্বাস করেন, এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন---তিনি ঈশ্বর, সমগ্র বিশ্বের নিয়ামক। কালে তিনি কল্যাণময় ভাগ্যবিধাতায় পরিণত হন। এই ধারণা পূর্বের ধারণা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। পুরোহিতরাও এ কথা বলেন, তবে এখানে ঈশ্বরের যে ধারণা, তাহা অতি সূক্ষ্ম। বহু দেবতার স্থলে এখানে এক ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ উপনিষদও স্বীকার করেন, কর্মের নিয়মে সকলে আবদ্ধ; কিন্তু নিয়মের হাত হইতে মুক্তিপথের সন্ধানও তাহারা দিয়াছেন। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নিয়মের পারে যাওয়া। ভোগ কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ ভোগ কেবল প্রকৃতির মধ্যেই সম্ভব।

তৃতীয়তঃ উপনিষদ্ যাগযজ্ঞের বিরোধী এবং উহাকে নিতান্ত হাস্যকর অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করেন। যাগযজ্ঞের দ্বারা সকল ঈপ্সিত বস্তু লাভ হইতে পারে, কিন্তু ইহাই মানুষের চরম কাম্য হইতে পারে না; কারণ মানুষ যতই পায়, ততই চায়। ফলে মানব হাসিকান্নার অন্তহীন গোলকধাঁধায় চিরকাল ঘুরিতে থাকে---কখনও লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে না; অনন্ত সুখ কোথাও কখনও সম্ভব নহে, ইহা বালকের কল্পনা মাত্র। একই শক্তি সুখ ও দুঃখরূপে পরিণত হয়।

আজ আমার মনস্তত্ত্ব খানিকটা পরিবর্তন করিয়াছি। একটি অত্যন্ত অদ্ভুত সত্য আবিষ্কার করিয়াছি। অনেক সময় আমাদের মনে অনেক ভাব জাগে, যেগুলি আমরা চাই না; আমরা অন্য বিষয়ের চিন্তা দ্বারা ঐগুলি সম্পূর্ণভাবে চাপা দিতে চাই। সেই ভাবটি কি? দেখিতে পাই পনের মিনিটের মধ্যেই তাহা আবার মনে উদিত হয়। সেই ভাবটি এত প্রবল ও ভীষণভাবে আসিয়া মনে আঘাত করে যে, নিজেকে পাগল বলিয়াই মনে হয় এবং যখন এই ভাব প্রশমিত হয়, তখন দেখা যায় যে, পূর্বের ভাবটিকে শুধু চাপিয়া রাখা হইয়াছিল। মনে কী প্রকাশিত হইয়াছিল?---আমার নিজেরই যে খারাপ সংস্কারগুলি কার্যে পরিণত হইবার অপেক্ষায় ভিতরে সঞ্চিত ছিল, সেইগুলিই। 'প্রাণিগণ নিজ নিজ প্রকৃতিকে অনুসরণ করে। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ কি করিতে পারে?' গীতায় এইরূপ ভীষণ কথাই বলা হইয়াছে। কাজেই আমাদের সমস্ত সংগ্রাম---সমস্ত চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়। মনের মধ্যে সহস্র প্রেরণা একই সময়ে প্রতিযোগিতা করিতেছে; তাহাদিগকে চাপিয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু যখনই বাধা অপসারিত হয়, তখনই সমস্ত চিন্তাগুলি প্রকট হইয়া উঠে।

কিন্তু আশা আছে। যদি ক্ষমতা থাকে, তবে মনঃশক্তিকে একই সঙ্গে বহু অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আমার চিন্তাধারা পরিবর্তন করিতেছি। মন ক্রমশঃ বিকশিত হয়---যোগিগণ এই কথাই বলেন। মনের একটি আবেগ আর একটি আবেগকে জাগ্রত করে, তখন প্রথমটি নষ্ট হইয়া যায়। যদি তুমি ক্রুদ্ধ হইবার পরমুহূর্তে সুখী হইতে পার, তবে পূর্বের ক্রোধ চলিয়া যাইবে। ক্রোধের মধ্য হইতেই তোমার পরবর্তী অবস্থার উদ্ভব হইতেছে। মনের এই অবস্থাগুলি সর্বদাই পরস্পর পরিবর্তন-সাপেক্ষ।
চিরস্থায়ী সুখ ও চিরস্থায়ী দুঃখ শিশুর স্বপ্নমাত্র। উপনিষদ্ বলেন, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য দুঃখও নয়, সুখও নয়; কিন্তু যাহা হইতে এই সুখ ও দুঃখের উদ্ভব হইতেছে, তাহাকে বশীভূত করা। একবারে গোড়াতেই যেন অবস্থাকে আমাদের আয়ত্তে আনিতে হইবে।

মতপার্থক্যের অন্য বিষয়টি এইঃ উপনিষদ্‌ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মগুলির--- বিশেষতঃ পশুবলির সহিত সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানগুলির নিন্দা করেন। উপনিষদ্‌ বলেন, এইসব নিতান্তই নিরর্থক। প্রাচীন দার্শনিকদের এক সম্প্রদায় (মীমাংসকেরা) বলেন, কোনও বিশেষ ফল পাইতে হইলে একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ কোনও পশুকে বলি দিতে হইবে। উত্তরে বলা যায়, 'পশুটির প্রাণ লইবার জন্য তো পাপ হইতে পারে এবং তার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।' ঐ দার্শনিকেরা বলেন, এ সব বাজে কথা। কোনটা পাপ, কোনটা পুণ্য--তাহা তুমি কি করিয়া জানিলে? তোমার মন বলিতেছে? তোমার মন কি বলে না বলে, তাহাতে অপরের কি আসে যায়? তোমার এ সকল কথার কোনও অর্থ নাই---কারণ তুমি শাস্ত্রের বিরুদ্ধে চিন্তা করিতেছ। যদি তোমার মন এক কথা বলে এবং বেদ অন্য কথা বলেন, তবে তোমার মন সংযত করিয়া বেদের নির্দেশ শিরোধার্য কর। যদি বেদ বলেন, নরহত্যা ঠিক, তবে তাহাই ঠিক। যদি তুমি বল, 'না, আমার বিবেক অন্যরূপ বলে'---এ কথা বলা চলিবে না।

যে মুহূর্তে কোনও গ্রন্থকে বিশেষ পবিত্র ও চিরন্তন বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, তখন আর উহাকে সন্দেহ করিতে পারিবেন না। আমি বুঝিতে পারি না, এদেশের লোকেরা বাইবেলে পরম বিশ্বাসী হইয়াও কি করিয়া বলে-'উপদেশগুলি কত সুন্দর, ন্যায়সঙ্গত ও কল্যাণকর!' কারণ বাইবেল স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী---এই বিশ্বাস যদি পাকা হয়, তবে তাহার ভালমন্দ বিচারের অধিকার---আপনাদের মোটেই নাই। যখন বিচার করিতে বসেন, তখন আপনারা ভাবেন---আপনারা বাইবেল অপেক্ষা বড়। সে ক্ষেত্রে বাইবেলের প্রয়োজন কি? পুরোহিতরা বলেন, 'বাইবেল বা অন্য কাহারও সহিত তুলনা করিতে আমরা নারাজ। তুলনার কোনও প্রয়োজন নাই; কারণ, কোনটি প্রামাণিক? এই শেষ কথা। যদি কোন কিছুর সত্যতা সম্বন্ধে তোমার মনে সন্দেহ জাগে, তবে বেদের অনুশাসন অনুযায়ী তাহার যথার্থ্য নির্ণয় করিয়া লও।'

উপনিষদ্‌ ইহা বিশ্বাস করেন, তবে সেখানে একটি উচ্চতর মানও আছে। একদিকে যেমন বেদের কর্মকান্ড তাহারা অস্বীকার করে না, তেমনি আবার অন্যদিকে তাহাদের দৃঢ় মত এই যে, পশু বলি এবং অপরের অর্থের প্রতি পুরোহিতকুলের লোভ অত্যন্ত অসঙ্গত। মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া উভয়ের ভিতরে অনেক মিল আছে বটে, তবে আত্মার কি দেহ ও মন আছে? মন কি কতকগুলি ক্রিয়াশীল ও সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর সমষ্টি? সকলেই মানিয়া লয়, মনোবিজ্ঞান একটি নিখুঁত বিজ্ঞান; এ বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই। কিন্তু আত্মা ও ঈশ্বর প্রভৃতি ব্যাপারে দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে।

পুরোহিতকুল এবং উপনিষদের মধ্যে আর একটি বড় পার্থক্য আছে। উপনিষদ্‌ বলেন---ত্যাগ কর। ত্যাগই সব কিছুর কষ্টিপাথর। সব কিছু ত্যাগ কর। সৃষ্টি প্রক্রিয়া হইতেই সংসারের যাহা কিছু বন্ধন। মন সুস্থ হয় তখনই, যখন সে শান্ত। যে মুহূর্তে মনকে শান্ত করিতে পারিবে, সেই মুহূর্তেই সত্যকে জানিতে পারিবে। মন যে এত চঞ্চল, তাহার কারণ কি? কল্পনা ও সৃজনী প্রবৃত্তিই ইহার কারণ। সৃষ্টি বন্ধ কর, সত্য জানিতে পারিবে। সৃষ্টির সমস্ত শক্তি বন্ধ হইলেই সত্য জানা যায়।

অন্যদিকে পুরোহিতকুল সৃষ্টির পক্ষপাতী। এমন জীবের কল্পনা কর, যাহার মধ্যে সৃষ্টির কোন ক্রিয়াকলাপ নাই। এ-রকম অবশ্য চিন্তা করা যায় না। স্থায়ী সমাজ-বিবর্তনের জন্য মানুষকে একটি পরিকল্পনা করিতে হইয়াছিল। এইজন্য (বিবাহে) কঠোর নির্বাচন-প্রথা অবলম্বন করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অন্ধ ও খঞ্জের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে ভারতবর্ষে বিকলাঙ্গ লোকের সংখ্যা পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশ অপেক্ষা কম। মৃগীরোগী এবং পাগলের সংখ্যাও সেখানে কম। ইহার কারণ--- প্রত্যক্ষ যৌন-নির্বাচন। পুরোহিতদের বিধান হইল---বিকলাঙ্গরা সন্ন্যাসী হউক। অপরদিকে উপনিষদ্‌ বলেনঃ না, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে তাজা ও সুন্দর ফুলই পূজার বেদীতে অর্পণ করা কর্তব্য। আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী ও সুস্থতম ব্যক্তিরাই সত্যলাভের চেষ্টা করিবে।

এই সব মত-পার্থক্য সত্ত্বেও পুরোহিতরা নিজেদের এক পৃথক জাতিগোষ্ঠীতে (ব্রাহ্মণ) পরিণত করিয়াছে, এ কথা আমি আপনাদের আগেই বলিয়াছি। দ্বিতীয় হইল রাজপুরুষের জাতি (ক্ষত্রিয়)। উপনিষদের দর্শন রাজাদের মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত, পুরোহিতদের মস্তিষ্ক হইতে নয়। প্রত্যেক ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়া একটা অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। মানুষ নামক জীবের উপর ধর্মের কিছু প্রভাব আছে বটে, কিন্তু অর্থনীতির দ্বারাই সে পরিচালিত হয়। ব্যষ্টির জীবনের উপর অন্য কিছুর প্রভাব থাকিতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে মানুষের ভিতর যখনই কোন অভ্যুত্থান আসিয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে, আর্থিক সম্পর্ক ব্যতীত মানুষ কখনও সাড়া দেয় নাই। আপনি যে ধর্মমত প্রচার করিতেছেন, তাহা সর্বাঙ্গসুন্দর না হইতে পারে, কিন্তু যদি তাহার পশ্চাতে অর্থনৈতিক পটভূমি থাকে এবং কিছুসংখ্যক উৎসাহী সমর্থক ইহার প্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তবে আপনি একটি গোটা দেশকে আপনার ধর্মমতে আনিতে পারিবেন।

যখনই কোন ধর্মমত সফল হয়, তখন (বুঝিতে হইবে) অবশ্যই তাহার আর্থিক মূল্য আছে। একই ধরনের সহস্র সম্প্রদায় ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করিলেও সে সম্প্রদায় আর্থিক সমস্যা সমাধান করিতে পারে, তাহাই প্রাধান্য লাভ করিবে। পেটের চিন্তা---অন্নের চিন্তা মানুষের প্রথম। অন্নের ব্যবস্থা প্রথমে, তারপর মস্তিষ্কের। মানুষ যখন হাঁটে, তখন তাহার পেট চলে আগে, মাথা চলে পরে। ইহা কি লক্ষ্য করেন নাই? মস্তিষ্কের অগ্রগতির জন্য এখনও কয়েক যুগ লাগিবে। ৬০ বৎসর বয়স হইলে মানুষ সংসার হইতে বিদায় লয়। সমগ্র জীবন একটি ভ্রান্তি। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিবার মতো বয়স হইতে না হইতে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। যতদিন পাকস্থলী সবল ছিল, ততদিন সব ঠিক ছিল। যখন বালসুলভ স্বপ্ন বিলীন হইয়া বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দেখিবার সময় আসিল, তখন সংসার হইতে চলিয়া যাইতে হয়। তাই উপনিষদের ধর্মকে জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী করা বড় দুরূহ ব্যাপার। অর্থগত লাভ সেখানে খুব অল্প, কিন্তু পরার্থপরতা সেখানে প্রচুর।

উপনিষদের ধর্ম যদিও প্রভূত রাজশক্তির অধিকারী রাজন্যবর্গের দ্বারা। আবিষ্কৃত হইয়াছে, তবু ইহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল না। তাইত সংগ্রাম প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়াছিল। প্রায় দুই হাজার বছর পরে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের সময় ইহা চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হয়। বৌদ্ধধর্মের বীজ ছিল এই রাজা ও পুরোহিতের সাধারণ দ্বন্দ্বের মধ্যে। এই প্রতিযোগিতায় ধর্মের অবনতি হয়। একদল এই ধর্মকে ত্যাগ করিতে চাহিল, অন্যদল বৈদিক দেবতা, যজ্ঞ প্রভৃতিকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহিল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের শৃঙ্খল মোচন করিল। এক মুহূর্তে সকল জাতি ও সম্প্রদায় সমান হইয়া গেল। ধর্মের মহান তত্ত্বগুলি ভারতে এখনও বর্তমান, কিন্তু সেগুলি প্রচার করার কাজ এখনও বাকি আছে, অন্যথা সেই তত্ত্বগুলি দ্বারা কোন উপকার হইবে না।

দুইটি কারণে প্রত্যেক দেশেই পুরোহিতগণ গোঁড়া ও প্রাচীনপন্থী হয়। একটি কারণ---তাহাদের জীবিকা, অন্যটি--তাহাদিগকে জনসাধারণের সঙ্গে চলিতে হয়। তাহা ছাড়া পুরোহিতদের মন সবল নয়। যদি জনসাধারণ বলে, 'দুই হাজার দেবতার কথা প্রচার কর, পুরোহিতরা তাহাই করিবে। যে জনমন্ডলী তাহাদের টাকা দেয়, পুরোহিতরা তাহাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র, ভগবান তো টাকা দেন না; কাজেই পুরোহিতদের দোষ দেওয়ার পূর্বে নিজেদেরই দোষ দিন। আপনারা যেরূপ শাসন, ধর্ম ও পুরোহিতকুল পাইবার উপযুক্ত, সেইরূপই পাইবেন। ইহা অপেক্ষা ভাল কিছু পাওয়া আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই সংঘর্ষ ভারতবর্ষে ও আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইহার একটি চূড়ান্ত অবস্থা দেখা গেল গীতাতে। যখন সমগ্র ভারতবর্ষ দুইটি বিবদমান দলে বিভক্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিল--তখন এক বিরাট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিনি গীতার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ এবং পুরোহিত ও জনসাধারনের ধর্মমতের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করেন। আপনারা যীশুখ্রীষ্টকে যেমন শ্রদ্ধা ও পূজা করেন, শ্রীকৃষ্ণকেও তেমনি ভারতবর্ষের লোক শ্রদ্ধা ও পূজা করেন। শুধু যুগের ব্যবধান মাত্র। আপনাদের দেশের ক্রীসমাসের মতো হিন্দুরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি (জন্মাষ্টমী) পালন করেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে। তাঁহার জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে সেগুলির কিছু কিছু যীশুখ্রীষ্টের জীবনীর সহিত মিলিয়া যায়। কারাগারেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল। পিতা শিশুকে লইয়া

পলায়ন করেন এবং গোপগোপীদের নিকট তাঁহার পালনের ভার অর্পণ করেন। সেই বৎসর যত শিশু জন্মিয়াছিল, সকলকেই হত্যা করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং জীবনের শেষ ভাগে তাঁহাকে অপরের হাতে প্রাণ দিতে হইয়াছিল---ইহাই নিয়তি।

শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেগুলি সম্বন্ধে আমার তত আগ্রহ নাই। অতিরঞ্জন-দোষ হিন্দুদেরও আছে। খ্রীষ্টান মিশনারীরা যদি বাইবেলের একটি গল্প বলে, হিন্দুরা বিশটি গল্প বলিবে। আপনারা যদি বলেন, তিমিমাছ জোনা-কে গলাধঃকরণ করিয়াছিল---হিন্দুরা বলিবেন, তাহাদের কেহ না কেহ একটি হাতিকে গিলিয়াছিল। ----বাল্যকাল হইতে আমি শ্রীকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে অনেক কথা শুনিয়াছি। আমি ধরিয়া লইতেছি, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া একজন কেহ ছিলেন এবং গীতা তাঁহার অপূর্ব গ্রন্থ। এ-কথা অনস্বীকার্য যে, গল্প বা উপকথাগুলি বিশ্লেষণ করিলে ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। উপকথাগুলি অলঙ্কারের কাজ করে। স্বভাবতই সেগুলি যতটা সম্ভব সুশোভন করা হয় এবং আলোচ্য ব্যক্তির চরিত্রের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়া হয়। বুদ্ধদেবের কথা ধরা যাক---ত্যাগই কেন্দ্রগত ভাব; হাজার হাজার উপকথা রচিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটিতে ঐ ত্যাগের মাহাত্ম্য ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। লিঙ্কনের মহান জীবনের এক একটি ঘটনাকে লইয়া বহু গল্প রচিত হইয়াছে। গল্পগুলি বিশ্লেষণ করিলে একটি সাধারণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উহার মধ্যে ঐ ব্যক্তির চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল অনাসক্তি। তাঁহার কোনও ব্যক্তিগত প্রয়োজন নাই, কোন অভাবও তাঁহার নাই। কর্মের জন্যই তিনি কর্ম করেন। কর্মের জন্য কর্ম কর। পূজার জন্য পূজা কর। পরোপকার কর--কারণ, পরোপকার মহৎ কাজ; এর বেশি কিছু চাহিও না।' ইহাই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র। অন্যথা এই উপকথা গুলিকে সেই অনাসক্তির আদর্শের সঙ্গে খাপ খাওয়ান যায় না। গীতা তাঁহার একমাত্র উপদেশ নয়।

আমি যত মানুষের কথা জানি, তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার মধ্যে মস্তিষ্কের উৎকর্ষতা, হৃদয়বত্তা ও কর্মনৈপুণ্য সমভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত নাগরিক, যোদ্ধা, মন্ত্রী অথবা অন্য কোনও দায়িত্বশীল পুরুষের কর্মপ্রবণতায় প্রাণবন্ত। বিদ্যাবত্তা, কবি-প্রতিভা, ভদ্র ব্যবহার--সব দিক দিয়াই তিনি ছিলেন মহান। গীতা ও অন্যান্য গ্রন্থে এই সর্বাঙ্গীণ ও বিস্ময়কর কর্মশীলতা এবং মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অপূর্ব সমন্বয়ের কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতায় যে হৃদয়বত্তা ও ভাষার মাধুর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অপূর্ব ও অনবদ্য। এই মহান ব্যক্তির প্রচন্ড কর্মক্ষমতার পরিচয় এখনও দেখা যায়। পাঁচ হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে---আজও কোটি কোটি লোক তাঁহার বাণীতে অনুপ্রাণিত হইতেছে। চিন্তা করুন--আপনারা তাঁহাকে জানুন বা না জানুন--সমগ্র জগতে তাঁহার চরিত্রের প্রভাব কত গভীর! তাঁহার পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞাকে আমি পরম শ্রদ্ধা করি। কোনও প্রকার জটিলতা, কোনও প্রকার কুসংস্কার সেই চরিত্রে দৃষ্ট হয় না। জগতের প্রত্যেক বস্তুর একটি নিজস্ব স্থান আছে, এবং তিনি তাহার যোগ্য মর্যাদা দিতে জানিতেন। যাহারা কেবল তর্ক করে এবং বেদের মহিমা সম্বন্ধে সন্দেহ করে, তাহারা সত্যকে জানিতে পারে না; তাহারা ভন্ড ব্যতীত আর কিছুই নয়। কুসংস্কার এবং অজ্ঞতারও স্থান বেদে আছে। প্রত্যেক বস্তুর যথাযথ স্থান নির্ণয় করাই প্রকৃত রহস্য।

তারপর হৃদয়বত্তা! বুদ্ধদেবেরও পূর্ববর্তী শ্রীকৃষ্ণই সকল সম্প্রদায়ের নিকট ধর্মের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। মনঃশক্তির এবং প্রচন্ড কর্মপ্রবণতার কী অপূর্ব বিকাশ! বুদ্ধদেবের কর্মক্ষমতা একটি বিশেষ স্তরে পরিচালিত হইত--উহা আচার্যের স্তর। তিনি স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিলেন, নতুবা আচার্যের কাজ করা সম্ভব নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেছেন! যিনি প্রবল কর্মব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে শান্ত রাখেন এবং যিনি গভীর শান্তির মধ্যে কর্মপ্রবণতা দেখান, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী ও জ্ঞানী। যুদ্ধক্ষেত্রের অস্ত্রশস্ত্র এই মহা পুরুষ ভ্রূক্ষেপ করেন না। সংগ্রামের মধ্যেও তিনি ধীর স্থিরভাবে জীবন ও মৃত্যুর সমস্যাসমূহ আলোচনা করেন। প্রত্যেক অবতারই তাঁহার উপদেশের জীবন্ত উদাহরণ। নিউ টেস্টামেন্টের উপদেশের তাৎপর্য জানিবার জন্য আপনারা কাহারও না কাহারও নিকট যাইয়া থাকেন। তাহার পরিবর্তে নিজেরা উহা বার বার পড়ুন এবং খ্রীষ্টের অপূর্ব জীবনালোকে উহা বুঝিতে চেষ্টা করুন।

মনীষীরা চিন্তা করেন এবং আমরাও চিন্তা করি। কিন্তু তাহার মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের মন যাহা চিন্তা করে, শরীর তাহা অনুসরণ করে না। আমাদের কার্য ও চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। যে শক্তির বলে 'শব্দ' বেদ হয়, আমাদের কথায় সেই শক্তি নাই। কিন্তু ঋষি বা মনীষীরা যাহা চিন্তা করেন, তাহা অবশ্যই কর্মে পরিণত হয়। যদি তাঁহারা বলেন, 'আমি ইহা করিব' তবে তাঁহাদের শরীর সেই কাজ করিবেই; পরিপূর্ণ আজ্ঞাবহতা-ইহাই লক্ষ্য। আপনি এক মুহূর্তে নিজেকে ঈশ্বর কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু আপনি ঈশ্বর হইতে পারেন না- বিপদ এইখানেই। মনীষীরা যাহা চিন্তা করেন, তাহাই হন- আমাদের চিন্তাকে কার্যে পরিণত করিতে অনেক সময় প্রয়োজন।

আমরা এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সমসাময়িক যুগের কথা আলোচনা করিলাম। পরবর্তী বক্তৃতায় 'গীতা' সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিতে পারিব।

২

(১৯০০ খ্রীঃ ২৮ মে, স্যানফ্রান্সিস্কো)

গীতা সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু ভূমিকার প্রয়োজন। দৃশ্য---কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণ। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের আধিপত্য লাভের জন্য একই রাজবংশের দুইটি শাখা---কুরু ও পান্ডব যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। পান্ডবদের ছিল রাজ্যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার, কৌরবদের ছিল বাহুবল। পান্ডবদের পাঁচ ভ্রাতা এতদিন বনে বাস করিতেছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁহাদের সখা। কৌরবেরা পান্ডবদিগকে সূচাগ্র মেদিনী দিতেও রাজি হইল না।

গীতায় প্রথম দৃশ্যটি যুদ্ধক্ষেত্রের। উভয় দিকে আছেন আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-বন্ধুরা---এক পক্ষে কৌরব-ভ্রাতৃগণ, অপর পক্ষে পান্ডবরা। একদিকে পিতামহ ভীষ্ম, অন্যদিকে পৌত্রগণ। বিপক্ষদলে তাঁহার জ্ঞাতি বন্ধু ও আত্মীয়দের দেখিয়া এবং (যুদ্ধ কালে) তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে--এ-কথা চিন্তা করিয়া অর্জুন বিমর্ষ হইলেন এবং অস্ত্রত্যাগ করাই স্থির করিলেন। বস্তুতঃ এইখানেই গীতার আরম্ভ।

পৃথিবীতে আমাদের সকলেরই জীবন এক বিরামহীন সংগ্রাম। অনেক সময় আমরা আমাদের দুর্বলতা ও কাপুরুষতাকে ক্ষমা ও ত্যাগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাই। কিন্তু ভিক্ষুকের ত্যাগে কোন কৃতিত্ব নাই। আঘাত করিতে সমর্থ কোন মানুষ যদি সহিয়া যায়, তবে তাহাতে কৃতিত্ব আছে; যাহার কিছু আছে, সে যদি ত্যাগ করে, তবে তাহাতে মহত্ত্ব আছে। আমরা তো জানি আমাদের জীবনেই কতবার আমরা আলস্য ও ভীরুতার জন্য ত্যাগ করিয়াছি, আর আমরা সাহসী--এই মিথ্যা বিশ্বাসে নিজেদের মনকে সন্মোহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

'হে ভারত (অর্জুন), উঠ, হৃদয়ের এই দূর্বলতা ত্যাগ কর, ত্যাগ কর এই নির্বীর্যতা! উঠিয়া দাঁড়াও, সংগ্রাম কর।' --এই তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকটি দ্বারাই গীতার সূচনা। যুক্তিতর্ক করিতে গিয়া অর্জুন উচ্চতর নৈতিক ধারণার প্রসঙ্গ আনিলেনঃ প্রতিরোধ করা অপেক্ষা প্রতিরোধ না করা কত ভাল, ইত্যাদি। তিনি নিজেকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনি কৃষ্ণকে ভুল বুঝাইতে পারিলেন না। কৃষ্ণ পরমাত্মা, স্বয়ং ভগবান। তিনি অবিলম্বেই অর্জুনের যুক্তির আসল রূপ ধরিয়া ফেলিলেন--ইহা দুর্বলতা। অর্জুন নিজের আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া অস্ত্রাঘাত করিতে পারিতেছেন না। অর্জুনের হৃদয়ে কর্তব্যআর মায়ার দ্বন্দ্ব। আমরা যতই পক্ষিসুলভ মমতার নিকটবর্তী হই, ততই ভাবাবেগে নিমজ্জিত হই। ইহাকে আমরা 'ভালবাসা' বলি। আসলে ইহা আত্ম-সম্মোহন। জীবজন্তুর মতো আমরাও আবেগের অধীন। বৎসের জন্য গাভী প্রাণ দিতে পারে--প্রত্যেকটি জীবই পারে। তাহাতে কি? অন্ধ পক্ষিসুলভ ভাবাবেগ পূর্ণত্বে লইয়া যাইতে পারে না। অনন্তচৈতন্যলাভই মানবের লক্ষ্য। সেখানে আবেগের স্থান নাই,

ভাবালুতার স্থান নাই, ইন্দ্রিয়গত কোনও কিছুর স্থান নাই; সেখানে কেবল বিশুদ্ধ বিচারের আলো, সেখানে মানুষ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।

অর্জুন এখন আবেগের অধীন। অর্জুনের হওয়া উচিত আরও অধিক আত্মসংযমী, বিচারের চিরন্তন আলোকোদ্ভাসিত পথচারী একজন জ্ঞানী ঋষি; তিনি এখন তাহা নহেন। হৃদয়ের তাড়নায় মস্তিষ্ককে বিচলিত করিয়া, নিজেকে ভ্রান্ত করিয়া, 'মমতা' প্রভৃতি সুন্দর আখ্যায় নিজের দুর্বলতাকে আবৃত করিবার চেষ্টা করিয়া তিনি শিশুর মতো হইয়াছেন, পশুর মতো হইয়াছেন। কৃষ্ণ তাহা দেখিতেছেন। অর্জুন সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মতো কথা বলিতেছেন, বহু যুক্তির অবতারণা করিতেছেন; কিন্তু তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অজ্ঞের কথা।

'জ্ঞানী ব্যাক্তি জীবিত বা মৃত কাহারও জন্যই শোক প্রকাশ করেন না। তোমার মৃত্যু হইতে পারে না, আমারও না। এমন সময় কখনও ছিল না, যখন আমরা ছিলাম না। এমন সময় কখনও আসিবে না, যখন আমরা থাকিব না। ইহজীবনে মানুষ যেমন শৈশবাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে যৌবন ও বার্ধক্য অতিক্রম করে, তেমনি মৃত্যুতে সে দেহান্তর গ্রহণ করে মাত্র। জ্ঞানী ব্যাক্তি ইহাতে মুহ্যমান হইবে কেন?' এই যে আবেগপ্রবণতা তোমায় পাইয়া বসিয়াছে, ইহার মূল কোথায়? ইন্দ্রিয়গ্রামে। 'শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ--এ-সকলের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়স্পর্শ হইতেই অনুভূত হয়। তাহারা আসে এবং যায়।' এইক্ষণে মানুষ দুঃখী, আবার পরক্ষণেই সুখী। এরূপ অবস্থায় সে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না।

'যাহা চিরকাল আছে (সৎ), তাহা নাই---এরূপ হইতে পারে না; আবার যাহা কখনও নাই (অসৎ), তাহা আছে---এরূপও হইতে পারে না। সুতরাং যাহা এই সমগ্র বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে, তাহা আদি-অন্তহীন ও অবিনাশী বলিয়া জানিবে। এই বিশ্বে এমন কিছুই নাই যাহা অপরিবর্তনীয় আত্মাকে পরিবর্তিত করিতে পারে। এই দেহের আদি ও অন্ত আছে, কিন্তু যিনি দেহের মধ্যে বাস করেন, তিনি অনাদি ও অবিনশ্বর।"

ইহা জানিয়া মোহ ত্যাগ কর এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, পশ্চাৎপদ হইও না- ইহাই আদর্শ। ফল যাহাই হউক, কর্ম করিয়া যাও। নক্ষত্রগণ কক্ষচ্যুত হইতে পারে, সমগ্র জগৎ আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। মৃত্যু তো শুধু দেহান্তরপ্রাপ্তি মাত্র। যুদ্ধ করিতে হইবে। ভীরুতা ও কাপুরুষতার দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না। পশ্চাদপসরণের দ্বারা কোন বিপদ দূর করা যায় না। দেবতাদের নিকট তোমরা অহরহ আকুল প্রার্থনা করিতেছ, তাহাতে কি তোমাদের দুঃখ দূর হইয়াছে? ভারতের জনসাধারণ কোটি ছয়েক দেবতার কাছে কান্নাকাটি করা সত্ত্বেও কুকুর-বিড়ালের মতো দলে দলে মরিতেছে। দেবতারা কোথায়? তাঁহারা তখনই আগাইয়া আসে, যখন তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পার। দেবতাদের কি প্রয়োজন?

কুসংস্কারের কাছে এই নতিস্বীকার করা, নিজের মনের কাছে নিজেকে বিকাইয়া দেওয়া তোমার শোভা পায় না। হে পার্থ! তুমি অনন্ত, অবিনশ্বর; তোমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। অনন্তশক্তিশালী আত্মা তুমি; ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার তোমার শোভা পায় না। উঠ, জাগো, দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর। যদি মৃত্যু হয় হউক। সাহায্য করিবার কেহ নাই। তুমিই তো জগৎ। কে তোমায় সাহায্য করিতে পারে? 'জীবগণের অস্তিত্ব শরীর-উৎপত্তির পূর্বে এবং মৃত্যুর পরে অব্যক্ত থাকে। শুধু মাঝখানের স্থিতিকালটুকু ব্যক্ত। কাজেই তাহাতে শোকের কারণ কিছুই নাই।'

'কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে দেখেন, কেহ ইহাকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন, অপর কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে শ্রবণ করেন, আবার অনেকে শুনিয়াও ইহাকে জানিতে পারেন না। কিন্তু এই আত্মীয়স্বজনকে বধ করা যে পাপ--এ-কথা বলার তোমার অধিকার নাই; কারণ তুমি ক্ষত্রিয় এবং বর্ণাশ্রম-অনুযায়ী যুদ্ধ করাই তোমার স্বধর্ম। ...'সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও।'

এখানে গীতার অন্য একটি বিশেষ মতবাদের সূচনা করা হইতেছে-- অনাসক্তির উপদেশ। অর্থাৎ আমরা কার্যে আসক্ত হই বলিয়া আমাদের কর্মফল ভোগ করিতে হয়।...'কেবল যোগযুক্ত হইয়া কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করিলে কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়।' সমস্ত বিপদ তুমি অতিক্রম করিতে পারিবে। 'এই নিষ্কাম কর্মযোগের অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিয়া মানব জন্মমরণরূপ সংসারের ভীষণ আবর্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।'

হে অর্জুন, কেবলমাত্র নিশ্চয়াত্মিকা একনিষ্ঠ বুদ্ধি সফলকাম হয়। অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিগণের মন সহস্র বিষয়ে নিবিষ্ট হওয়ায় শক্তির অপচয় ঘটে, অবিবেকীরা বেদোক্ত কর্মে অনুরক্ত; স্বর্গাদি ফলের জনক বেদের কর্মকান্ডের বাহিরে কিছু আছে, এ-কথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। কারণ তাঁহারা বৈদিক ক্রিয়াকান্ডের সাহায্যে ভোগসুখ ও স্বর্গলাভ করিতে চান এবং সেজন্য যজ্ঞাদি করেন।' 'এই সকল লোক যতক্ষণ না বৈষয়িক ভোগ-সুখের প্রত্যাশা ত্যাগ করেন, ততক্ষণ তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনে সাফল্য আসিতে পারে না।'

ইহাও গীতার আর একটি মহান উপদেশ। বিষয়ের ভোগসুখ যতক্ষণ না পরিত্যাক্ত হয়, ততক্ষণ আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয় না। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে সুখ কোথায়? ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের ভ্রম সৃষ্টি করে মাত্র। মানুষ মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকেও একজোড়া চক্ষু ও একটি নাসিকার কামনা করে। অনেকের কল্পনা---এ-জগতে যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে, স্বর্গে গিয়া তদপেক্ষা বেশিসংখ্যক ইন্দ্রিয় পাওয়া যাইবে। অনন্তকাল ধরিয়া সিংহাসনে আসীন ভগবানকে---ভগবানের পার্থিব দেহকে তাঁহারা দেখিতে চান। এই সকল লোকের বাসনা--শরীরের জন্য, শরীরের ভোগ সুখের জন্য, খাদ্য ও পানীয়ের জন্য। স্বর্গ তাহাদের নিকট পার্থিব জীবনের বিস্তার মাত্র। মানুষ ইহজীবনের অতিরিক্ত কিছু চিন্তা করিতে পারে না। এই শরীরকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের জীবনের সব-কিছু। 'মুক্তিপ্রদ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এই শ্রেণীর মানবের নিকট একান্ত দুর্লভ।'

'বেদ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ--এই ত্রিগুণাত্মক বিষয়গুলি শিক্ষা দেয়।' বেদ কেবল প্রকৃতির অন্তর্গত বিষয়গুলি শিক্ষা দেয়। পৃথিবীতে যাহা দেখা যায় না, লোকে তাহা ভাবিতে পারে না। স্বর্গ লইয়া কথা বলিতে গেলে, তাহাদের মনে জাগে--সিংহাসনে একজন রাজা বসিয়া আছেন, আর লোক তাঁহার নিকট ধূপ জ্বালাইতেছে। সবই প্রকৃতি; প্রকৃতির বাহিরে কিছুই নাই। কাজেই বেদ প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কিছু শিক্ষা দেয় না। এই প্রকৃতির পারে যাও; অস্তিত্বের এই দ্বৈত-ভাবের পারে যাও; তোমার ব্যক্তিগত চেতনার পারে যাও; কোন কিছুকে গ্রাহ্য করিও না, মঙ্গল বা অমঙ্গলের দিকে তাকাইও না।'

আমরা নিজদিগকে দেহের সহিত অভিন্নভাবে দেখিতেছি। আমরা দেহমাত্র, অথবা দেহটি আমাদের, আমার দেহে চিমটি কাটিলে আমি চিৎকার করি। এসকলই অর্থশূন্য, কারণ আমি আত্মস্বরূপ। দেহকে আত্মার সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করার জন্যই এই দুঃখ-শোক-কল্পনা, প্রাণী দেবতা দানব, এই বিশ্বজগৎ--প্রত্যেকটি জিনিস আসিয়া পড়িয়াছে। আমি চৈতন্যস্বরূপ। তুমি চিমটি কাটিলে আমি কেন লাফাইয়া উঠিব?... এই দাসত্ব লক্ষ্য কর। লজ্জা হয় না তোমার? আমরা নাকি ধার্মিক! আমরা নাকি দার্শনিক! আমরা নাকি ঋষি! ভগবান মঙ্গল করুন--আমরা কী? জীবন্ত নরক বলিতে যাহা বুঝায়, আমরা তাহাই। পাগল বলিতে যাহা বুঝায়, আমরা তাহাই।

আমরা আমাদের শরীরের 'ধারণা' ছাড়িতে পারি না। আমরা পৃথিবীতেই বদ্ধ আছি। এই সংস্কারগুলিই আমাদের বন্ধন। এই জাতীয় সহস্র সংস্কারের বন্ধনে বদ্ধ অবস্থায় আমরা শরীর ছাড়িয়া যাই।

একেবারে আসক্তিশূন্য হইয়া কে কাজ করিতে পারে? ইহাই প্রকৃত প্রশ্ন। ঐরূপ (আসক্তিশূন্য) ব্যক্তির নিকট কর্মের সফলতা ও বিফলতা সমান কথা। যদি সারা জীবনের কর্ম একমুহূর্তে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়- তাহা হইলেও ঐ ব্যক্তির হৃৎপিন্ডে বারেকের জন্যও বৃথা স্পন্দন জাগে না। 'ফলের কথা চিন্তা না করিয়া যিনি কর্মের জন্য কর্ম করিয়া যান, তিনিই যোগী। এইভাবে তিনি জন্মমৃত্যুর যন্ত্রণাকে অতিক্রম করেন---এইভাবে তিনি মুক্ত হন।' তখন তিনি দেখিতে পান যে, সকল প্রকার আসক্তিই মিথ্যা মায়া। আত্মা কখনও আসক্ত হইতে পারেন না। ...তারপর তিনি সকল শাস্ত্র ও দর্শনের পারে গমন করেন।

গ্রন্থ ও শাস্ত্রের দ্বারা যদি মন বিভ্রান্ত হয়--এক মহা আবর্তের মধ্যে আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এই সব শাস্ত্রের সার্থকতা কি? কোনও শাস্ত্র এই প্রকার বলে, অন্যটি আর এক প্রকার বলে। কোন্ গ্রন্থ অবলম্বন করিবে? একাকী দন্ডায়মান হও। নিজের আত্মার মহিমা দেখ! তোমায় কর্ম করিতে হইবে, তবেই তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কে?' 'যিনি সকল বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন। কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, এমন কি এই জীবনও নয়, স্বাধীনতা নয়, দেবতা নয়, কর্ম নয়, কোনও কিছুই নয়; যখন তিনি পরিতৃপ্ত, তখন আর অধিক কিছু চাহিবার তাঁহার নাই।' তিনি আত্মার মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং নিজের মধ্যে সংসার দেবতা স্বর্গ--সকলই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তখন দেবতারা অর দেবতা থাকেন না, মৃত্যু আর মৃত্যু থাকে না, জীবন আর জীবন থাকে না। প্রত্যেকটি জিনিসই পরিবর্তিত হইয়া যায়। যদি কাহারও ইচ্ছা দৃঢ় হয়, তাঁহার মন যদি তিনি সকল প্রকার আসক্তি, সকল প্রকার ভয়, সকল প্রকার ক্রোধ হইতে মুক্ত হন, তবে তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।'

'কচ্ছপ যেমন করিয়া তাহার পাগুলিকে অভ্যন্তরে টানিয়া লয়, তাহাকে আঘাত করিলে একটি পা-ও বাহিরে আসে না, ঠিক তেমনি যোগী তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলিকে অভ্যন্তরে টানিয়া লইতে পারেন।' কোনও কিছুই ঐ (ইন্দ্রিয়)-গুলিকে জোর করিয়া বাহিরে আনিতে পারে না। কোনও প্রলোভন বা কোনও কিছুই তাঁহাকে টলাইতে পারে না। সারা বিশ্ব তাঁহার মনে একটি তরঙ্গও সৃষ্টি করিবে না।

অতঃপর একটি অতিপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। অনেক সময় লোকে বহুদিন ধরিয়া উপবাস করে, কোনও নিকৃষ্ট ব্যক্তি কুড়ি দিন উপবাস করিলে বেশ শান্তও হইয়া উঠে। এই উপবাস আর আত্মপীড়ন--সারা পৃথিবীর লোক করিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণের ধারণায় এই সব অর্থশূন্য। তিনি বলেনঃ যে মানুষ নিজের উপর উৎপীড়ন করে, তাহার নিকট হইতে ইন্দ্রিয়গুলি কিছুকালের জন্য নিবৃত্ত হয়, কিন্তু বিশগুণ অধিক শক্তি লইয়া পুনঃপ্রকাশিত হয়। তখন তুমি কি করিবে? ভাবখানা এই যে, স্বাভাবিক হইতে হইবে। কৃচ্ছ সাধন নহে। অগ্রসর হও, কর্ম কর, কেবল দৃষ্টি রাখিও যেন আসক্ত হইয়া না পড়। যে ব্যক্তি অনাসক্তির কৌশল জানে না বা তাহার সাধনা করেনা, তাহার প্রজ্ঞা কখনও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

আমি বাহিরে গিয়া চোখ মেলিলাম, যদি কিছু থাকে, আমি অবশ্যই দেখিতে পাইব, না দেখিয়া পারি না। মন ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে ধাবিত হয়। এখন ইন্দ্রিয় গুলিকে যে-কোন প্রকার প্রকৃতি-জাত প্রতিক্রিয়া বর্জন করিতে হইবে।

'যাহা সংসারের নিকট অন্ধকার রাত্রি, সংযমী পুরুষ তাহাতে জাগরিত থাকেন, ইহা তাঁহার নিকট দিবালোক। আর যে বিষয়ে সারা সংসার জাগ্রত, তাহাতে সংযমী নিদ্রিত। এই সংসার কোথায় জাগ্রত?--ইন্দ্রিয়ে। মানুষ চায় ভোজন, পান আর সন্তান; তারপর কুকুরের মতো মরে। ...কেবল ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেই তাহারা সর্বদা জাগৃত। তাহাদের ধর্মও ঐজন্যই। তাহারা আরও কামিনী, আরও কাঞ্চন, আরও সন্তান লাভের জন্য একটি ভগবান আবিষ্কার করিয়াছে। অধিকতর দেবত্বলাভে সাহায্য করিবার জন্য ভগবানকে চায় নাই।

'যেখানে সারা জগৎ জাগ্রত, সেখানে যোগী নিদ্রিত, যেখানে অজ্ঞেরা নিদ্রিত, যোগী সেখানে জাগ্রত; সেই আলোকের রাজ্যে--যেখানে মানুষ নিজেকে পাখির মতো, পশুর মতো শরীর মাত্র বলিয়া দেখে না--দেখে অনন্ত মাতৃহীন অমর আত্মারূপে। এখানে অজ্ঞেরা সুপ্ত; তাহাদের বুঝিবার সময় নাই, বুদ্ধি নাই, সাধ্য নাই। সেখানে কেবল যোগীই জাগ্রত থাকেন, তাহাই তাঁহার নিকট দিবালোক।

'পৃথিবীর নদীগুলি অবিরত তাহাদের জলরাশি সমুদ্রে ঢালিতেছে, কিন্তু সমুদ্রের সুন্দর গম্ভীর প্রকৃতি অবিচলিত, অপরিবর্তিতই থাকে। তেমনি ইন্দ্রিয়গুলি একযোগে প্রকৃতির সকল সংবেদন আনিলেও জ্ঞানীর হৃদয় কোন প্রকার বিক্ষেপ বা ভয়ের কথা ভাবিতে পারে না।' লক্ষ লক্ষ স্রোতে দুঃখ আসুক, শত শত স্রোতে সুখ আসুক! আমি দুঃখের অধীন নই--আমি সুখেরও ক্রীতদাস নই।

৩

(১৯০০ খ্রী: ২৯ মে, স্যানফ্রান্সিস্কো)

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আপনি আমাকে কর্মের উপদেশ দিতেছেন, অথচ ব্রহ্মজ্ঞানকে জীবনের উচ্চতম অবস্থা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। হে কৃষ্ণ, যদি জ্ঞানকে কর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তবে কর্মের উপদেশ দিতেছেন কেন?'

শ্রীকৃষ্ণঃ অতি প্রাচীনকাল হইতে দুইটি সাধনপথ প্রচলিত আছে। জ্ঞানানুরাগী দার্শনিকগণ জ্ঞানযোগের এবং নিষ্কামকর্মিগণ কর্মযোগের কথা বলেন। কিন্তু কর্ম ত্যাগ করিয়া কেহ শান্তি লাভ করিতে পারে না। এ-জীবনের কর্ম বন্ধ করিয়া থাকা মুহূর্ত মাত্র সম্ভব নয়। প্রকৃতির গুণগুলিই মানুষকে কর্ম করিতে বাধ্য করে। যে ব্যক্তি বাহ্য কর্ম বন্ধ করিয়া মনে মনে কর্মের কথা চিন্তা করে, সে কিছুই লাভ করিতে পারে না। সে মিথ্যাচারী হইয়া যায়। কিন্তু যিনি মনের শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে ধীরে ধীরে বশীভূত করিয়া কর্মে নিযুক্ত করেন, তিনি পূর্বোক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি কর্ম কর।

'যদি তুমি এ রহস্য বুঝিয়া থাক যে, তোমার কোন কর্তব্য নাই--তুমি মুক্ত, তথাপি অপরের কল্যাণের জন্য তোমাকে কর্ম করিতে হইবে। কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোকে তাহাই অনুসরণ করে।'

'পরা শান্তির অধিকারী মুক্ত মহাপুরুষ যদি কর্মত্যাগ করেন, তবে যাহারা সেই জ্ঞান ও শান্তি লাভ করে নাই, তাহারা মহাপুরুষকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবে।

'হে পার্থ, ত্রিভুবনে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি সর্বদা কর্মে ব্যাপৃত আছি। যদি আমি মুহূর্তের জন্য কর্ম না করি, তবে বিশ্বব্রহ্মান্ড ধ্বংস হইয়া যাইবে।'

'অজ্ঞ ব্যাক্তিরা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যেরূপ কর্ম করে, জ্ঞানিগণকে অনাসক্তভাবে এবং কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া সেইরূপ কর্ম করিতে হইবে।'

আপনি যদি জ্ঞানের অধিকারী হন, তবু অজ্ঞান ব্যক্তিদের বালসুলভ বিশ্বাসকে বিভ্রান্ত করিবেন না। পরন্তু তাহাদের স্তরের নামিয়া আসিয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ উন্নত করিবার চেষ্টা করুন। ইহা একটি অতিশয় শক্তিশালী ভাব, এবং ভারতে ইহাই আদর্শ হইয়া গিয়াছে। তাই দেখা যায়, ভারতবর্ষে জ্ঞানী মহাপুরুষগণ মন্দিরে যান, প্রতিমা পূজাও করেন--ইহা কপটতা নয়।

গীতার পরবর্তী অধ্যায়ে পড়ি, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেনঃ যাঁহারা ভক্তিপূর্বক অন্যান্য দেবতার পূজা করেন, তাঁহারা বস্তুতঃ আমারই পূজা করেন।' এই ভাবে মানুষ সাক্ষাৎ ভাগবানেরই পূজা করিতেছে। ভগবানকে ভুল নামে ডাকিলে কি তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন? যদি ক্রুদ্ধ হন, তবে তিনি ভগবান নন। এ-কথা কি বুঝিতে পার না, মানুষের হৃদয়ে যাহা আছে, তাহাই ভগবান?- যদিও ভক্ত শিলাখন্ড পূজা করিতেছে, তাহাতে কি আসে যায়?

ধর্ম কতকগুলি মতবাদের সমষ্টি-এই ধারণা হইতে যদি আমরা একবার মুক্ত হইতে পারি, তবেই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। ধর্মের একটি ধারণাঃ আদি মানব আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছিলেন বলিয়াই পৃথিবীর সৃষ্টি-আর পালাইবার পথ নাই। যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করুন-অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুতে বিশ্বাস করুন! কিন্তু ভারতে ধর্মের ধারণা অন্যরূপ। সেখানে ধর্ম মানে অনুভূতি, উপলব্ধি; অন্য কিছু নয়। চার ঘোড়ার জুড়িগাড়িতে, বৈদ্যুতিক শকটে অথবা পদব্রজে-কিভাবে লক্ষ্যে পৌঁছিলেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। উদ্দেশ্য এক। খ্রীষ্টানদের পক্ষে

সমস্যা-কিভাবে সেই ভীষণ ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে। ভারতীয়দের সমস্যা-নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করা এবং নিজেদের হারানো আত্মভাবকে ফিরিয়া পাওয়া।

আপনি কি উপলব্ধি করিয়াছেন-আপনি আত্মা? যদি বলেন-'হাঁ', তবে 'আত্মা' বলিতে আপনি কি বোঝেন? আত্ম কি এই দেহ-নামক মাংসপিন্ড, অথবা অনাদি অনন্ত চিরশান্ত জ্যোতির্ময় অমৃতত্ব। আপনি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হইতে পারেন, কিন্তু যতক্ষন আপনি নিজেকে এই দেহ মনে করিতেছেন, ততক্ষণ আপনি আপনার পায়ের নিচের ঐ ক্ষুদ্র কীটের সমান। এ অপরাধের মার্জনা নাই; আপনার অবস্থা আরও শোচনীয়; কারণ আপনি দর্শনশাস্ত্র সবই জানেন, অথচ দেহবোধ হইতে উর্ধ্বে উঠিতে পারিতেছেন না। শরীরই আপনার ভগবান-ইহাই আপনার পরিচয়! ইহা কি ধর্ম?

আত্মাকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করাই ধর্ম। আমরা কি করিতেছি? ঠিক ইহার বিপরীত। আত্মাকে জড়বস্তুরূপে অনুভব করিতেছি! অমৃতস্বরূপ ঈশ্বর হইতে আমরা মৃত্যু ও জড়বস্তু নির্মাণ করি, এবং প্রাণহীন জড়বস্তু হইতে চেতন আত্মা 'সৃষ্টি' করি!

উর্ধ্ববাহু ও হেঁটমুন্ড হইয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা অথবা ত্রিমুন্ডধারী পাঁচ হাজার দেবতার আরাধনা দ্বারা যদি ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, তবে সানন্দে ঐগুলিকে গ্রহণ করুন। যেভাবেই হউক, আত্মজ্ঞান লাভ করুন। এ বিষয়ে কোন সমালোচনার অধিকার কাহারও নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেনঃ যদি তোমার সাধন-পদ্ধতি উচ্চতর ও উন্নততর হয় এবং অপরের পদ্ধতি খুব খারাপ বলিয়াই মনে হয়, তথাপি তাহার নিন্দা করিবার কোন অধিকার তোমার নাই। ধর্ম কতকগুলি অর্থহীন শব্দের সমষ্টি নয়, পরন্তু ধর্মকে ক্রমবিকাশ বলিয়া মনে করিতে হইবে। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে এক বিশিষ্ট ব্যক্তির ঈশ্বরদর্শন হইয়াছিল; মুশাও (Moses) দাবাগ্নির মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিয়াছিলেন। মুশা ঈশ্বরদর্শন করিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে কি আপনাদের পরিত্রাণ হইয়াছে? অপরের ঈশ্বরদর্শনের কথা আপনাদের মধ্যে প্রেরণা দিয়া ঈশ্বরদর্শন করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে পারে, এতদ্ব্যতীত আর এতটুকু সাহায্য করিতে পারে না। পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণের দৃষ্টান্তগুলির ইহাই মূল্য, আর বেশি কিছু নয়। সাধনার পথে এগুলি নির্দেশক-স্তম্ভ মাত্র। একজন আহার করিলে যেমন অপরের ক্ষুধা দূর হয় না, তেমনি একজনের ঈশ্বরদর্শনে অপরের মুক্তি হয় না। নিজেকেই ঈশ্বরদর্শন করিতে হইবে। তাঁহার একটি শরীরে তিনটি মাথা অথবা ছয়টি দেহে পাঁচটি মাথা-ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে এইরূপ অর্থহীন কলহেই এই সকল লোক প্রবৃত্ত হয়। আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন? না।'...এবং লোকে বিশ্বাস করে না যে, তাহারা কখনও ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারে। মর্ত্যের মানুষ আমরা কি নির্বোধ! নিশ্চয়ই; পাগলও বটে!

ভারতবর্ষে এই ঐতিহ্য চলিয়া আসিতেছে-যদি ঈশ্বর থাকেন তবে তিনি অবশ্যই আপনারও ঈশ্বর, আমারও ঈশ্বর। সূর্য কাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি? আপনারা বলেন, শ্যাম খুড়ো সকলেরই খুড়ো! যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি তাঁহাকে দেখিতে পারেন, নতুবা সেরূপ ঈশ্বরের চিন্তাই করিবেন না।

প্রত্যেকে মনে করেন, তাঁহার পথই শ্রেষ্ঠ পথ। খুব ভাল! কিন্তু মনে রাখিবেন-ইহা আপনার পক্ষেই ভাল হইতে পারে। একই খাদ্য যাহা একজনের পক্ষে দুষ্পাচ্য, অপরের পক্ষে তাহা সুপাচ্য। যেহেতু ইহা আপনার পক্ষে ভাল, অতএব আপনার পদ্ধতিই প্রত্যেকের অবলম্বনীয়-সহসা এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন না। জ্যাকের কোট সব সময় জন বা মেরীর গায়ে না-ও লাগিতে পারে। যাহাদের শিক্ষা দীক্ষা নাই, যাহারা চিন্তা করে না-এরূপ নরনারীকে জোর করিয়া এই রকম একটা ধরাবাঁধা ধর্মবিশ্বাসের ভিতর ঢুকাইয়া দেওয়া হয়! স্বাধীনভাবে চিন্তা ব্যক্তির পদ্ধতি ভুল-এ-কথা বলিবার অধিকার আপনার আছে? আপনার নিকট ইহা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু ইহার নিন্দা করিবার অধিকার আপনার নাই। অর্থাৎ এই মত অবলম্বন করিলে আপনার অবনতি হইবে; কিন্তু এ-কথা বলা যায় না যে, ঐ ব্যক্তিও অবনত হইবে। তাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশঃ যদি তুমি জ্ঞানী হও, তবে একজনের দুর্বলতা দেখিয়া তাহাকে মন্দ বলিও না। যদি পার তাহার স্তরে নামিয়া তাহাকে সাহায্য কর। ক্রমে ক্রমে তাহাকে উন্নত হইতে হইবে। পাঁচ ঘন্টার মধ্যে আমি হয়ত তাহার মগজে পাঁচ ঝুড়ি তথ্য সরবরাহ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তাহার কী ভাল হইবে? পূর্বাপেক্ষা হয়ত তাহার অবস্থা খারাপই হইবে।

কর্মের এই বন্ধন কোথা হইতে আসে? আমরা আত্মাকে কর্মদ্বারা শৃঙ্খলিত করি। আমাদের ভারতীয় মতে সত্তার দুইটি দিক-একদিকে প্রকৃতি, অন্যদিকে আত্মা। প্রকৃতি বলিতে শুধু বহির্জগতের বস্তুসমূহ বোঝায় না; আমাদের শরীর মন বুদ্ধি-এমন কি 'অহঙ্কার' পর্যন্ত এই প্রকৃতির অন্তর্গত। অনন্ত জ্যোতির্ময় শাশ্বত আত্মা এই সকলের উর্ধ্বে। এই মতে আত্মা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আত্মা চিরকাল ছিলেন এবং চিরকাল থাকিবেন। ...কোনও সময়েই আত্মাকে মানবুদ্ধির সহিতও অভিন্নরূপে গণ্য করা যায় না...[দেহের সঙ্গে তো দূরের কথা]।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, আমাদের ভুক্ত খাদ্যই চিরকাল মন সৃষ্টি করিতেছে: মন জড়পদার্থ। আত্মার সহিত খাদ্যের কোনও সম্পর্ক নাই। খাওয়া বা না খাওয়া, চিন্তা করা বা না করা...তাহাতে আত্মার কিছু আসে যায় না। আত্মা অনন্ত জ্যোতিঃস্বরূপ। এই জ্যোতি চিরকাল সমভাবে থাকে। আলোর সম্মুখে নীল বা সবুজ যে কাঁচ দিয়েই দেখ না কেন, তাহাতে আলোর কিছু আসে যায় না; মূল আলোর রঙ অপরিবর্তনীয়। মনই বিভিন্ন পরিবর্তন আনে-নানা রঙ দেখায়। আত্মা যখন এই দেহ ত্যাগ করে, তখন এ সবই টুকরা টুকরা হইয়া যায়।

প্রকৃতিরও প্রকৃত স্বরূপ আত্মা। সৎস্বরূপ আত্মাই জীবাত্মারূপে [আমাদের শরীর-মনের মধ্য দিয়া] চলাফেরা করে, কথা বলে এবং সব কিছু কর্ম করে। জীবাত্মার শক্তি, মন-বুদ্ধি ও প্রাণই জড়ের দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হইতেছে। যদিও চেতন আত্মা আমাদের চিন্তা, শারীরিক কর্ম ও সব-কিছুর কারণ, যদিও আত্মার জ্যোতি সর্বত্র প্রতিফলিত, তথাপি ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ শীত-উষ্ণ প্রভৃতি প্রকৃতিগত যাবতীয় দ্বন্দ্ব ও দ্বৈতভাব আত্মাকে স্পর্শ করে না।

'হে অর্জুন, এই সমস্ত ক্রিয়া প্রকৃতির অন্তর্গত। আমাদের শরীর-মনের মধ্য দিয়া প্রকৃতি তাহার নিয়মানুসারে কাজ করিয়া চলিতেছে। আমরা প্রকৃতির সহিত নিজদিগকে অভিন্ন মনে করিয়া বলিতেছি-আমি এই সকল কর্মের কর্তা। এইভাবে আমরা ভ্রান্তির কবলে পড়ি।

কোন না কোন কিছুর বাধ্য হইয়াই, আমরা কর্ম করি। ক্ষুধা বাধ্য করে, তাই আমি খাই। দুঃখভোগ হীনতার দাসত্ব। প্রকৃত 'আমি' (আত্মা) চিরদিন মুক্ত। কে তাহাকে কর্মে বাধ্য করিতে পারে? কারণ সুখ-দুঃখের ভোক্তা তো প্রকৃতির অন্তর্গত। যখন আমরা দেহের সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়া ভাবি, তখনই বলি, 'আমি অমুক, আমি এই দুঃখভোগ করিতেছি। এইরূপ যত বাজে কথা।' কিন্তু যিনি সত্যকে জানিয়াছেন, তিনি নিজেকে সবকিছু হইতে পৃথক করিয়া রাখেন। তাঁহার শরীর কি করে বা মন কি ভাবে, তাহা তিনি গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু মানব-সমাজের এক বিরাট অংশই ভ্রান্তির বশীভূত; যখনই তাহারা কোন ভাল কাজ করে, তখন নিজেদের ইহার কর্তা বলিয়া মনে করে; তাহারা এখনও উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, তাহাদের বিশ্বাস বিচলিত করিও না। মন্দ ছাড়িয়া তাহারা ভাল কাজ করিতেছে, খুব ভাল, তাই করুক। তাহারা কল্যাণকর্মী। ক্রমশঃ তাহারা বুঝিবে, ইহা অপেক্ষা আরও গৌরব আছে। তাহারা সাক্ষিমাত্র-কাজ স্বতই হইয়া যায়, ক্রমশঃ তাহারা বুঝিবে। যখন অসৎকর্ম একবারে ত্যাগ করিয়া কেবল সৎকর্ম করিতে থাকিবে, তখনই তাহারা বুঝিতে আরম্ভ করিবে যে, তাহারা প্রকৃতির উর্ধ্বে। তাহারা কর্তা নয়, তাহারা কর্ম হইতে পৃথক, তাহারা সাক্ষিমাত্র। তাহারা শুধু দাঁড়াইয়া দেখে। প্রকৃতি হইতে বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইতেছে। তাহারা এ-সকল হইতে উপরত। 'হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সৎস্বরূপই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। সেই সৎ ঈক্ষণ করিলেন এবং জগতের সৃষ্টি হইল।' 'জ্ঞানীও প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া কার্য করে। প্রত্যেকেই প্রকৃতির অনুযায়ী কার্য করে। কেহ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারে না। অণুও প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না। কি অন্তর্জগতে, কি বহির্জগতে অণুকেও নিয়ম মানিতেই হইবে। 'বাহিরের সংযমে কি হইবে?'

জীবনে কোনও কিছুর মূল্য কিসের দ্বারা নির্ণীত হয়? ভোগসুখ বা ধনসম্পদের দ্বারা নয়। সব জিনিস বিশ্লেষণ করুন। দেখিবেন আমাদের শিক্ষার জন্য অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন কিছুরই মূল্য নাই। অনেক সময় ভোগসুখ অপেক্ষা দুঃখকষ্টই আমাদের আরও ভাল অভিজ্ঞতা দেয়। অনেক সময় সুখাস্বাদ অপেক্ষা আঘাতগুলিই আমাদের জীবনে মহত্তর শিক্ষা দিয়া থাকে। দুর্ভিক্ষেরও একটা মূল্য আছে।

শ্রীকৃষ্ণের মতে আমরা একেবারে সদ্যোজাত নূতন জীব নই। আমাদের সত্ত্বা পূর্বেও ছিল। আমাদের মনবুদ্ধিও একেবারে নূতন নয়। আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে, প্রত্যেকটি শিশু কেবল অতীত মানব-জীবনের অভিজ্ঞতা নয়, তাহার পূর্ববর্তী উদ্ভিদ জীবনের অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতিও সঙ্গে লইয়া আসে। তাহার সংস্কারে অতীত অধ্যায়গুলি সব আছে-বর্তমান অধ্যায় আছে, আর আছে সম্মুখে ভবিষ্যতের অনেকগুলি অধ্যায়। প্রত্যেকের জীবনপথ পূর্ব হইতেই পরিকল্পিত, মানচিত্রে আঁকা রহিয়াছে। এই অন্ধকার সত্ত্বেও কোন ঘটনা বা অবস্থার উদ্ভব কারণ ব্যতীত হইতে পারে না। অজ্ঞানই ইহার কারণ। কার্যকারণের অন্তহীন শৃঙ্খলে একটির পর একটি শিকলি বাঁধা রহিয়াছে। বিশ্বব্রহ্মান্ডও এইরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কার্য ও কারণের বিশ্বব্যাপী এই শৃঙ্খলের একটি শিকলি আপনি ধরিয়াছেন, আমি আর একটি। ঐ শৃঙ্খলের সেই সেই অংশটুকু আমাদের নিজস্ব প্রকৃতি।

এখন শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ঃ নিজের প্রকৃতিগত পথে চলিতে চলিতে মরাও ভাল। অপরের পথ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিও না। এই আমার নিজের পথ এবং তাহাতেই আমি চলিতেছি। আপনি উপরের পথে চলিতেছেন। নিজের পথ ছাড়িয়া আমি ঐ পথে যাইতে সর্বদা প্রলুব্ধ হইতেছি এবং ভাবিতেছি আপনার সহযাত্রী হইব। যদি আমি ওখানে যাই, তবে আমি 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' হইব। এই সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হইতে হইবে। এ সবই ক্রমোন্নতির কথা। উন্নতির পথ ধীরে ধীরে। অপেক্ষা করুন, সব পাইবেন। নতুবা পরের পন্থা অবলম্বন করিলে আধ্যাত্মিক জীবনে বিপদ দেখা দিবে। ধর্ম-শিক্ষা দিবার এইটি মৌলিক রহস্য।

মানুষের পরিত্রাণ বলিতে আপনারা কি বোঝেন? সকলকে একই ধর্মমতে বিশ্বাস করিতে হইবে? কখনই তাহা নয়। অবশ্য এমন কতকগুলি উপদেশ বা আদর্শ আছে, যেগুলি সমগ্র মানবসমাজের পক্ষে প্রযোজ্য। যথার্থ আচার্য আপনার প্রকৃতি এবং কোন পথ আপনার পক্ষে শ্রেয়, তাহা বলিয়া দিতে পারেন। আপনি হয়ত নিজের প্রকৃত স্বরূপ জানেন না; আপনারা নিজদিগকে যে সাধনপথের অধিকারী বলিয়া ভাবিতেছেন, তাহা ভুলও হইতে পারে। এ-বিষয়ে এখনও আপনার চেতনা বিকশিত হয় নাই। কিন্তু প্রকৃত আচার্যকে উহা জানিতে হইবে। আপনাকে একবার দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিবেন, আপনি কোন পথের অধিকারী, এবং তিনিই আপনাকে সেই পথ ধরাইয়া দিবেন। অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া এধারে ওধারে নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেও আমরা এতটুকু অগ্রসর হইতে পারি না। তারপর যথাসময়ে সদগুরুর জীবন-প্রবাহে পড়িয়া অমরা দ্রুত অগ্রসর হই। ঈশ্বর-কৃপার নিদর্শন এই যে, অনুকূল স্রোত পাইবার শুভ মুহূর্তে আমরা বসিয়া থাকি। তারপর আর সংগ্রাম নাই। সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ঐ পথ ত্যাগ করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করা অপেক্ষা বরং ঐ পথে (চলিতে চলিতেই) মরিতে হইবে।

কিন্তু সাধারণতঃ কি হয়? আমরা একটি ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া কতকগুলি ধরাবাঁধা মত স্থাপন করি, মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য ভুলিয়া যাই। সকলকে এক প্রকৃতির মনে করিয়া সেরূপ ব্যবহার করি। কিন্তু দুইটি মানুষের কখনও একই দেহ, একই মন হয় না; দুইটি ব্যক্তির ধর্ম বা সাধনপথ কখনও এক হইতে পারে না। যদি ধর্মপথে অগ্রসর হইতে চান, তবে কোন সংগঠিত ধর্মের (organized religion) দ্বারস্থ হইবেন না। ঐগুলি দ্বারা ভাল অপেক্ষা শতগুণ মন্দই হইয়া থাকে, কারণ উহাতে ব্যক্তিগত উন্নতি রুদ্ধ হইয়া যায়। মনোযোগের সহিত সব কিছু দেখুন, কিন্তু নিজের পথে নিষ্ঠা রাখুন। যদি আমার পরামর্শ শোনেন, তবে কোন ফাঁদে পা দিবেন না। যখনই কোন সম্প্রদায় তাহাদের ফাঁস পরাইবার জন্য চেষ্টা করিবে, তখনই নিজেকে সেখান হইতে মুক্ত করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। যেমন মধুকর বহু ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করে, অথচ কোন ফুলে অবদ্ধ হয় না, তেমনই সংগঠিত ধর্মে প্রবেশ করুন, কিন্তু আবদ্ধ হইবেন না। ধর্ম আপনাকে ও আপনার ঈশ্বরকে লইয়া; কোনও তৃতীয় ব্যক্তি আপনাদের উভয়ের মধ্যে আসিবে না। একবার ভাবিয়া দেখুন-এই সংগঠিত ধর্মগুলি কী করিয়াছে! যদি আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হই, অমনি অপরকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করি। একজনকে ভালবাসার অর্থ যদি অপরকে ঘৃণা করাই বুঝায়, তার চেয়ে ভাল না বাসাই ভাল। এ ভালবাসা নয়, নরক! যদি নিজের লোকগুলিকে ভালবাসার অর্থ অপর সকলকে ঘৃণা করা, তবে তাহা নিছক স্বার্থপরতা ও পশুত্ব; ইহার ফলে পশুতে পরিণত হইতে হইবে। অতএব অপরের ধর্ম যতই বড় বলিয়া মনে হউক না কেন, তাহা অবলম্বন করা অপেক্ষা নিজের (গুণগত) ধর্ম পালন করিয়া মরাও শ্রেয়।

'অর্জুন, সাবধান! কাম ও ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ইহাদিগকে সংযত করিতে হইবে। ইহারা বিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিবেকও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই কামের অনল দুষ্পুরণীয়। ইন্দ্রিয়সমূহে এবং মনে কামের অধিষ্ঠান। আত্মা কিছুই কামনা করেন না।'

'পুরাকালে এই যোগ আমি সূর্যকে শিখাইয়াছিলাম। সূর্য উহা (রাজর্ষি) মনুকে শিক্ষা দেন। এইভাবে যোগের জ্ঞান এক রাজা হইতে অন্য রাজায় পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু কালক্রমে যোগের মহৎ শিক্ষা নষ্ট হইয়া যায়। তাই আজ আমি আবার তোমার নিকট তাহা বলিতেছি।
তখন অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন? আপনি তো সেদিন জন্মিয়াছেন, এবং [সূর্য আপনার বহু পূর্বে জন্মিয়াছেন]-আপনি সূর্যকে এই যোগ শিখাইয়াছেন, তাহা কিরূপে সম্ভব?'

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ঃ হে অর্জুন আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে; তুমি সেগুলি সম্বন্ধে সচেতন নও। আমি অনাদি জন্মরহিত

সর্বভূতের অধীশ্বর। নিজ প্রকৃতি-সহায়ে আমি দেহধারণ করি। যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য আবির্ভূত হই। সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতির বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। যে যে-ভাবে আমাকে পাইতে চায়, সেই ভাবেই আমি তাহার কাছে যাই। কিন্তু হে পার্থ, জানিও কেহই আমার পথ হইতে কখনও বিচ্যুত হইতে পারে না। কেহ কখনও বিচ্যুত হয় নাই। আমরাই বা কিরূপে হইব? কেহই ভগবানের পথ হইতে বিচ্যুত হয় না।

সকল সমাজই একটা যা তা করিয়া খাড়া করা সাধারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ত্রুটিহীন সাধারণীকরণের উপরেই (যথার্থ) নিয়ম গঠিত হইতে পারে। প্রাচীন প্রবাদ কি? প্রত্যেক নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। যদি উহা সত্যই নিয়ম হয়, তবে তাহা লঙ্ঘন করা যায় না। কেহই উহা লঙ্ঘন করিতে পারে না। আপেল কি মাধ্যাকর্ষনের বিধি কখনও লঙ্ঘন করে? নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে বিশ্বব্রহ্মান্ডের অস্তিত্ব আর থাকে না। এক সময় আসিবে, যখন আপনি নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন, এবং সেই মুহূর্তে আপনার চেতনা মন ও দেহ বিলীন হইয়া যাইবে।

ঐ তো একজন চুরি করিতেছে। কেন সে চুরি করে? আপনারা তাহাকে শাস্তি দেন। কেন, আপনারা তাহার কর্মশক্তি কি কোনও কাজে লাগাইতে পারেন না? আপনারা বলিবেন সে পাপী। অনেকেই বলিবেন, সে আইন লঙ্ঘন করিয়াছে। বিশাল মানবগোষ্ঠীকে জোর করিয়া (বৈচিত্র্যহীন) একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সেইজন্যই এত সব দুঃখযন্ত্রণা পাপ ও দুর্বলতা। পৃথিবীকে যতটা খারাপ বলিয়া মনে করা হয়, পৃথিবী কিন্তু ততটা খারাপ নয়। মূর্খ আমরা পৃথিবীকে এতটা খারাপ করিয়াছি। আমরা নিজেরাই ভূতপ্রেত দৈত্যদানব সৃষ্টি করি, এবং পরে তাহাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাই না। আমরা নিজেদের চোখ ঢাকিয়া চিৎকার করি, 'কেহ আসিয়া আমাদিগকে আলো দেখান।'- নির্বোধ! চোখ হইতে হাত সরাইয়া লও! তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা দেবতাদের আহ্বান করি, কেহই নিজের উপর দোষারোপ করে না। বাস্তবিক ইহাই দুঃখের বিষয়। সমাজে এত মন্দ কেন? মন্দ কাহাকে বলে?- দেহসুখ ও শয়তানি ভাব! মন্দকে প্রাধান্য দাও কেন? মন্দগুলিকে এত বড় করিয়া দেখিতে কেহ তো বলে নাই। 'হে অর্জুন, আমার পথ হইতে কেহই সরিয়া যাইতে পারে না।' আমরা নির্বোধ, আমাদের পথও নির্বোধের পথ। এই সব মায়ার ভিতর দিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। ভগবান স্বর্গই সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষ নিজের জন্য নরক সৃষ্টি করিয়াছে।

'কোনও কর্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কর্মফলে আমার স্পৃহা নাই। যে-কেহ আমাকে এইভাবে জানে, সে কর্মকৌশল জানে এবং কর্মদ্বারা কখনও আবদ্ধ হয় না। প্রাচীন ঋষিগণ এই তত্ত্ব জানিয়া নির্বিঘ্নে কর্মে নিযুক্ত হইতেন। হে অর্জুন, তুমিও সেইভাবে কর্ম কর।'

'যিনি প্রচন্ড কর্মে গভীর শান্তভাব এবং গভীর শান্তভাবে প্রচন্ড কর্ম দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।' এখন প্রশ্ন এই: প্রতিটি ইন্দ্রিয় প্রতিটি স্নায়ুকর্ম পরায়ন হইলেও আপনার মনে গভীর প্রশান্তি আছে কি?- কোন কিছু আপনার মনকে চঞ্চল করে না তো? কর্ম চঞ্চল বাজারের রাস্তায় দাঁড়াইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, চারিদিকে ভিড় ঘুরপাক খাইতেছে, তাহার মধ্যে আপনার মন কি ধ্যানমগ্ন ধীর ও শান্ত? অথবা গিরিগুহায় স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে কি আপনার মন তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল? যদি এইরূপ হয়, তবে আপনি যোগী- মুক্ত পুরুষ, নতুবা নন।

'যাহার প্রত্যেকটি কর্মপ্রচেষ্টা বন্ধনহীন, ফলাকাংক্ষা শূন্য ও স্বার্থরহিত, সত্যদ্রষ্টাগণ তাঁহাকেই জ্ঞানী বলিয়া থাকেন।' যতক্ষন স্বার্থবোধ থাকিবে ততক্ষন আমাদের নিকট প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হইবে না। নিজেদের অহংকার দ্বারা আমরা সব কিছুকে রঞ্জিত করি। বস্তুগুলি নিজস্ব রূপেই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়; তাহারা যে আবৃত তাহা নয়, কিছুই আবৃত থাকে না। আমরা তাহাদিগকে আবৃত করি। আমাদের মনবুদ্ধির তুলি দিয়া ভিন্নভাবে তাহাদিগকে চিহ্নিত করি। যে সকল জিনিস আমরা পছন্দ করি না, সেগুলি কাছে আসিলে আমরা সেগুলির উপর একটু তুলি বুলাইয়া দিই, তারপর সেগুলির দিকে তাকাইয়া থাকি।... আমরা কোনও কিছু জানিতে চাই না। সব জিনিসকে আমরা নিজেদের রঙে রাঙাইয়া লই। স্বার্থই সকল কর্মের প্রেরণাশক্তি। বস্তুর স্বরূপ আমাদের দ্বারাই আবৃত রহিয়াছে, গুটিপোকার মতো নিজেদের চারিদিকে জাল সৃষ্টি করিয়া আমরা তাহার মধ্যে আবদ্ধ হই। গুটিপোকা তাহার নিজের জালেই নিজে আবদ্ধ হয়। আমরাও ঠিক তাহাই করিতেছি। যখনই 'আমি' শব্দটি উচ্চারণ করি, তখনই একটি পাক খাইল। 'আমি ও আমার' বলামাত্র আর এক পার খাইল। এইরূপে চলিতে থাকে।

কাজ না করিয়া আমরা এক মুহূর্ত থাকিতে পারি না। কাজ করিতেই হইবে। কিন্তু প্রতিবেশী যখন বলে, 'এস, সাহায্য কর', তখন মনে যে ভাব উদিত হয়, নিজেকে সাহায্য করিবার সময়ও সেই ভাব পোষণ করিবেন। ইহার বেশি নয়। অপরের শরীর অপেক্ষা আপনার শরীর বেশি মূল্যবান নয়। অপরের দেহের জন্য যতটুকু করিয়া থাকেন, নিজের শরীরের জন্য তার বেশি করিবেন না। ইহাই ধর্ম।

'যাঁহার সকল কর্মপ্রচেষ্টা ফলতৃষ্ণা ও স্বার্থবুদ্ধি-রহিত, তিনিই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্মের এই সকল বন্ধন দগ্ধ করিয়াছেন, তিনি জ্ঞানী।' শুধু পুস্তক পাঠের দ্বারা এই অবস্থা লাভ হয় না। একটি গর্দভের পৃষ্ঠে গোটা গ্রন্থাগারটি চাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে সে মোটেই জ্ঞানী হইয়া উঠিবে না। কাজেই বহু পুস্তক পড়িবার প্রয়োজন কি? 'কর্মে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকিয়া এবং কোন লাভের প্রত্যাশা না করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম করেন, অথচ কর্মের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন।'

মার্তৃগর্ভ হইতে উলঙ্গ অবস্থায় এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, উলঙ্গ অবস্থাতেই ফিরিয়া যাইব। অসহায় অবস্থায় আসিয়াছিলাম, অসহায় অবস্থায় চলিয়া যাইব। এখনও আমি অসহায়। আমাদের গন্তব্য কোথায়, লক্ষ্য কি - এ অবস্থার কথা চিন্তা করাও আমাদের পক্ষে ভয়াবহ। কত অদ্ভুত অদ্ভুত ভাব আমাদের পাইয়া বসে, তাহাও আমরা জানি না। আমরা প্রেতাত্মার মিডিয়ামের কাছে যাই- ভূতপ্রেত যদি কোন সাহায্য করিতে পারে। ভাবুন কী দুর্বলতা! ভূতপ্রেত, শয়তান, দেবতা- সব এস! পুরোহিত, ভন্ড, হাতুড়ে- যে যেখানে আছ, সকলে এস! যে মুহূর্তে আমরা দূর্বল হই ঠিক তখনই তাহারা আমাদের পাইয়া বসে এবং যত দেবত আমদানি করে।
আমরা দেশে দেখিয়াছি, কেহ হয়ত শক্তিমান ও শিক্ষিত হইয়া দার্শনিকভাবে বলে, 'এই সব প্রার্থনা পুণ্যস্নানাদি অর্থহীন।'.....তারপর তাহার পিতা দেহত্যাগ করিলেন, তাহার মাতৃবিয়োগ হইল। হিন্দুর পক্ষে এই শোক প্রচন্ড আঘাত। তখন দেখা যাইবে পূর্বোক্ত ব্যক্তি প্রতিটি কর্দমাক্ত কুন্ডে স্নান করিতেছে, মন্দিরে যাইতেছে, সকলের দাসত্ব করিতেছে- যে পার, সাহায্য কর! কিন্তু আমরা অসহায়। কাহারও নিকট হইতে কোন সাহায্য আসে না। ইহাই সত্য।

মানুষের সংখ্যা হইতে দেবতার সংখ্যা বেশি, তবুও কোন সাহায্য আসে না। কুকুরের মতো আমরা মরি, তবু কোনও সাহায্য নাই সর্বত্র পশুর মতো ব্যবহার দুর্ভিক্ষ রোগ দুঃখ অসৎভাব! সকলেই সাহায্যের জন্য চিৎকার করিতেছে, কিন্তু কোনও সাহায্য নাই। কোন আশা না থাকিলেও আমরা সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করিয়া চলিতেছি। কি শোচনীয় অবস্থা! কি ভয়ংকর ব্যাপার! নিজেদের অন্তরে অনুসন্ধান করুন। আমাদের এই দুঃখকষ্টের অর্ধেকের জন্য আমরা দোষী নই; মাতাপিতাই দায়ী। আমরা এই দুর্বলতা লইয়াই জন্মিয়াছি - এবং পরে আরও বেশি দুর্বলতা আমাদের মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ধীরে ধীরে আমরা ইহা অতিক্রম করি। নিজেকে অসহায় মনে করা- দারুন ভুল। কাহারও কাছে সাহায্য চাহিও

না। আমরা নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করি। যদি তাহা না পারি, তবে আমাদের সাহায্য করিবার কেহ নাই।

'তুমি নিজেই তোমার একমাত্র বন্ধু এবং তুমি নিজেই তোমার একমাত্র শত্রু। আত্মা বা মন ছাড়া অন্য কোনও শত্রু নাই, আত্মা বা মন ছাড়া অন্য বন্ধু নাই।' ইহাই শেষ ও শ্রেষ্ঠ উপদেশ। কিন্তু ইহা শিখিতে কত কালই না লাগে। অনেক সময় মনে হয়, এই আদর্শ আমরা যেন ধরিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু পরমুহূর্তে পুরাতন সংস্কার আসিয়া পড়ে। আমাদের মেরুদন্ড ভাঙিয়া যায়। দুর্বল হইয়া আবার সেই ভ্রান্ত সংস্কার ও অপরের সাহায্যকেই আঁকড়াইয়া ধরি। অপরের সাহায্য পাইব, এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া আমাদের যে বিরাট দুঃখ ভোগ করিতে হয়- তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন! পুরোহিত তাহার নিয়মমত পূজা বা প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সম্ভবতঃ কিছু প্রত্যাশা করে। ষাট হাজার লোক আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রার্থনা করে এবং প্রার্থনান্তে পুরোহিতের প্রাপ্য অর্ধ দেয়। মাসের পর মাস লোকেরা আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে, প্রার্থনা করে ও পুরোহিতকে টাকা দেয়; একবার ভাবিয়া দেখুন! ইহা কি পাগলামি নয়? পাগলামি ছাড়া ইহাকে আর কি বলা যায়? ইহার জন্য দায়ী কে? আপনার ধর্মপ্রচার করিতে পারেন, ইহা শুধু অপরিণত শিশুদের মন উত্তেজিত করা। ইহার জন্য আপনাদের দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। অন্তরের অন্তস্তলে আপনারা কি? যে দুর্বল চিন্তাগুলি আপনি অন্যের মাথায় ঢুকাইয় দিয়াছেন, তাহার প্রত্যোকটির জন্য আপনাকে চক্রবৃদ্ধি-হারে সুদ সহ মূল্য দিতে হইবে। কর্মের নিয়ম তাহার প্রাপ্য আদায় করিবেই।
জগতে একটিমাত্র পাপ আছে, তাহা দুর্বলতা। বাল্যকালে যখন মহাকবি মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্য পড়িয়াছিলাম, তখন শয়তানকেই একমাত্র সৎ ব্যক্তি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতাম। তিনিই মহাপুরুষ, যিনি কখনও দুর্বলতার বশীভূত হন না, সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হন এবং জীবনপণ করিয়া সংগ্রাম করেন। ওঠ, জাগো, ঐ প্রকার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও.......। পাগলের সংখ্যা আর বাড়াইও না। যে অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী, তাহার সহিত আর তোমার দুর্বলত যুক্ত করিও না। জগতের কাছে আমি এই কথাই বলিতে চাই। শক্তিমান হও; ভূতপ্রেত ও শয়তানের কথা তোমরা যে বল, আমরাই তো জীবন্ত শয়তান। শক্তি ও ক্রমোন্নতিই জীবনের চিহ্ন। দুর্বলতা মৃত্যুর চিহ্ন, যাহা কিছু দুর্বল, তাহাকে এড়াইয়া চল। উহাই মৃত্যু। উহা যদি শক্তি হয়, তবে তাহার জন্য নরকেও যাও এবং শান্তি লাভ কর। সাহসীরাই মুক্তির অধিকারী। 'বীরপুরুষরাই স্ত্রীরত্নলাভের যোগ্য।' আর যাহারা সর্বাপেক্ষা বীর, শুধু তাহারাই মুক্তিলাভের যোগ্য। কাহার নরক? কাহার অত্যাচার? কাহার পাপ? কাহার দুর্বলতা? কাহার মৃত্যু? কাহার রোগ?

আপনারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন; যদি যথার্থ বিশ্বাস করিতেই হয়, তবে প্রকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাসী হউন। 'তুমি পুরুষ, তুমি স্ত্রী, তুমি সবল যুবকের পদবিক্ষেপে চলিতেছ, আবার জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ দন্ডসহায়ে চলিতেছ।' তুমিই দুর্বলতা, তুমিই ভয়, তুমিই স্বর্গ এবং তুমিই নরক; তুমি সর্প হইয়া দংশন কর, ওঝা হইয়া বিষমুক্ত কর- তুমিই ভয়-মৃত্যু ও দুঃখ-রূপে উপস্থিত হও।

সকল দুর্বলতা, সকল বন্ধনই আমাদের কল্পনা। সজোরে একটি কথা বল, ইহা শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। দুর্বল হইও না, ওঠ, বাহির হইবার আর অন্য কোনও পথ নাই। শক্ত হইয়া দাঁড়াও, শক্তিমান হও, ভয় নাই। কুসংস্কার নাই। নগ্নসত্যের সম্মুখীন হও, দুঃখ কষ্টের চরম মৃত্যু যদি আসে, আসুক। প্রাণপণ সংগ্রামের জন্য আমরা কৃতসংকল্প। ধর্ম বলিতে অমি ইহাই জানি; আমি ইহা লাভ করি নাই, লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি সফল হইতে না পারি, তোমরা পারিবে। অগ্রসর হও।

যেখানে একজন অপরকে দেখে এবং একজন অপরকে শোনে, যতক্ষন দ্বৈতবোধ আছে, ততক্ষন ভয় থাকিবেই এবং ভয়ই সমস্ত দুঃখের কারণ। যখন যেখানে একজন অপরকে দেখে না, যেখানে সবাই এক সেখানে দুঃখী হইবার কেহ নাই, অসুখী হওয়ারও কেহ নাই। একই আছেন, দ্বিতীয় নাই- 'একমেবাদ্বিতীয়ম'। কাজেই ভয় করিও না; ওঠ, জাগো, যে পর্যন্ত লক্ষ্যস্থলে না পঁহুছিতেছ, সে পর্যন্ত থামিও না।

(স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা বই থেকে সংকলিত)

"The Bhagavad-Gita is the most systematic statement of spiritual evolution of endowing value to mankind. It is one of the most clear and comprehensive summaries of perennial philosophy ever revealed; hence its enduring value is subject not only to India but to all of humanity."

— Aldous Huxley

দুর্গাপূজা - উৎপত্তি ও স্বরূপ

দুর্গোৎসব-প্রশ্ন

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

বহু বিজ্ঞ জনে দুর্গাপূজার উৎপত্তি অনুসন্ধান করিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বিজয়া দশমীর শবরোৎসব দেখিয়া মনে করিয়াছেন, কিরাত ও শবর জাতির একটি উৎসব মার্জিত হইয়া দুর্গাপূজায় পরিণত হইয়াছে। কেহ নবপত্রিকা দেখিয়া বুঝিয়াছেন, শরৎকালে আশুধান্য সংগ্রহ হয়, দুর্গাপূজা নবান্নের উৎসব। কাহারও মতে বসন্তাগমে আমরা যেমন বসন্তোৎসব করি, শরৎঋতু দেখিয়া তেমন শরদুৎসব করি। এইরূপ, যিনি দুর্গোৎসবের যে অঙ্গ দেখিয়াছেন, তিনি অন্ধের মতন হস্তী-দর্শন করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর হইতে দুর্গাপূজার পূর্বে ভক্ত ও ভাবুক দেবীর পুরাণোক্ত মহিমা কীর্তন করিতেছেন। কোন কোন পন্ডিত বৈদিক গ্রন্থে ও পুরাণে দেবীর নামোল্লেখ প্রদর্শন করিতেছেন। এতদ্দারা দেবী কল্পনার প্রাচীনতা জানিতে পারিতেছি, কিন্তু দুর্গাপূজা ও উৎসবের উৎপত্তি ও স্বরূপ পাইতেছি না।

বাস্তবিক প্রশ্নটি সোজা নয়। দুর্গাপূজা ও তৎসম্পৃক্ত উৎসব, এই দুই অঙ্গের উৎপত্তি ও প্রকৃতি চিন্তা করিতে হইবে। ইহাদের আনুপূর্বিক ইতিহাস সঙ্কলন দুঃশক্য। কারণ আমাদের অধিকাংশ পূজায় বহু প্রাচীন স্মৃতি জড়িত আছে সে প্রাচীন যে কোন্ অতীত কালের সাক্ষী, কোন্ মানব-চিত্ত-বৃত্তির বাহ্য প্রকাশ, তাহা বলিবার উপায় নাই। কালে কালে দেশে দেশে পূজা-পদ্ধতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পুরাতন অনুষ্ঠান গিয়াছে, নূতন আসিয়াছে, তথাপি নূতনে পুরাতনের চিহ্ন কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। কারণ মানবের স্বভাব এই, নূতন কিছু করিতে হইলে পুরাতনকে আশ্রয় করে।

দেবীর পূজার উৎপত্তি ও স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে পূজাপ্রকরণ অনুধাবন কর্তব্য। কিন্তু পূর্বকালের পূজা-পদ্ধতি কিছুই জানা নাই। এই সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি। যথা---

(১) আশ্বিন শুক্ল নবমীতে ষোড়শোপচারে সমারোহে দেবীর পূজা বিহিত, কিন্তু পূজারম্ভের কয়েকটি দিন আছে। তবে অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণের মাহাত্ম্য কেন? ভাদ্র কৃষ্ণ-নবমী, আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদ, ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমী হইতে পূজা আরম্ভ করা যাইতে পারে। বিভিন্ন দিনে পূজারম্ভের হেতু কি? কেবল অষ্টমীতে, কেবল নবমীতে পূজা করা যাইতে পারে। এত দিনের মধ্যে সপ্তমী অষ্টমী নবমী মাত্র এই তিন দিন প্রতিমার পূজা হয়। অধিকাংশ গৃহে আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদ হইতে পূজা আরম্ভ হইয়া থাকে। অবশিষ্ট দিনে জলপূর্ণ ঘটে দেবীর পূজা হয়। জলপূর্ণ ঘট, মুখে আম্র-পল্লব, কিসের দ্যোতক? ঘটে পটে প্রতিমায় দেবীর পূজা করা যাইতে পারে। যদি ঘটে পূজা সিদ্ধ হয়, প্রতিমার প্রয়োজন থাকে না। ষষ্ঠীর সায়ংকালে বিল্ববৃক্ষমূলে, তদভাবে যুগ্মফলযুক্ত বিল্ব-শাখায় দেবীর বোধন এবং আমন্ত্রণ ও অধিবাস হয়। ইহার অর্থ কি? তবে কি প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্যন্ত পূজা বৃথা হইতেছিল? বোধন শব্দের অর্থ কি? দেবীকে জাগরিত করা? তিনি কি এত দিন নিদ্রিত ছিলেন? নিদ্রা হইতে পারে না। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী জগজ্জননী তাঁহার নিদ্রায় প্রলয় হয়। বোধন সময়ে বিল্ববৃক্ষে পূজা করিতে হয়। বিল্ববৃক্ষ অম্বিকার প্রিয়। ইহার কারণ কি? আরও, বিল্ববৃক্ষের সমীপে নবপত্রিকা স্থাপন করিতে হয়। নাম নবপত্রিকা, কিন্তু নয়টি বৃক্ষের পত্র না হইয়া নয়টি বৃক্ষ কিম্বা নয়টি বৃক্ষের শাখা শ্বেত অপরাজিতার লতা দ্বারা বাঁধিয়া স্থাপন করিতে হয়। সে নয়টি বৃক্ষ এই---রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক, মান ও ধান্য। নব পত্রিকার অর্থ কি? বাঁকুড়ায় কেহ কেহ প্রতিমায় পূজা না করিয়া নবপত্রিকায় পূজা করেন।

অতএব মনে হয়, নবপত্রিকা দুর্গার স্বরূপ বা নবদুর্গা। তাহা হইলে প্রতিমার প্রয়োজন কি? নবদুর্গাই বা কি? বিল্বশাখা ও নবপত্রিকা স্থাপনের নিমিত্ত চন্ডীমন্ডপ হইতে পৃথক এক স্থানে সূত্র-বেষ্টনদ্বারা এক বস্ত্রগৃহ নির্মিত হয়। ইহারই বা হেতু কি? এই গৃহে অলক্তক, সূত্র ও ছুরিকা রাখা হয়। এ সকলের প্রয়োজন কি? সপ্তমীতে নবপত্রিকা চন্ডীমন্ডপে প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত হয় এবং প্রত্যেক বৃক্ষ পূজিত হয়। নবমীতে পূজার সময় ছাগ বলিদানের পূর্বে (কোথাও পরে) ইক্ষু ও কুষ্মান্ড বলি দেওয়া হইয়া থাকে। পশুবলির সহিত এই দুই উদ্ভিদের বলি বিসদৃশ নয় কি?

কালিকা-পূরাণে নরবলির ব্যবস্থা আছে। সে লোমহর্ষক ব্যাপার পড়িলে আমাদের হৃৎকম্প হয়। কিন্তু দেবীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত নরবলি শ্রেষ্ঠবলি গণ্য হইত। শত্রুরাজ্যের রাজপুত্রকে পাইলে উত্তম। অভাবে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর উচ্চজাতির যুবককে কয়েকদিন উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া দেবীর প্রীত্যর্থে বলি দেওয়া হইত। শুধু দুর্গাপূজায় কেন, কাপালিকেরাও নরবলিদ্বারা অভীষ্টলাভের আশা করিত। সেই নরবলির স্মৃতি অদ্যাপি পূর্ববঙ্গে এবং কলিকাতাতেও রক্ষিত হইতেছে। কোথাও পিটালীর, কোথাও ঘনীভূত ক্ষীরের, কোথাও ময়দার নরশিশু নির্মাণ করিয়া বলি দেওয়া হয়। ইহার নাম শত্রুবলি। কলিকাতার এক ধনাঢ্য বৈষ্ণব কায়স্থ গৃহে পশুবলি দেওয়া হয় না, কিন্তু ক্ষীরের শত্রুবলি দেওয়া হয়। বলিপ্রদত্ত নরের মাংস মহামাংস। দেবী মহামাংসে ও সুরায় সম্যক্ প্রীত হন। লোকে জানে না, কুষ্মান্ড নরবলির পরিবর্ত। এই কারণে পূর্ববঙ্গে বিধবারা কুষ্মান্ড ভক্ষণ করেন না। ইক্ষু হইতে গুড় এবং গুড় হইতে গৌড়ী মদ্য হয়। ইক্ষু সুরার প্রতীক।

কুমারীপূজা দুর্গাপূজার এক বিশেষ অঙ্গ। কুমারীপূজার হেতু কি? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন উদিত হয়।

উৎসব সম্বন্ধেও প্রশ্ন আছে দুর্গাপূজার পূর্বে পথ-ঘাট গৃহ পরিষ্কৃত, চন্ডীমন্ডপে বনমাল্য লম্বিত, মন্ডপের দুই পার্শ্বে কদলী বৃক্ষ রোপিত হয়। পুরাকালে ধ্বজা উত্তোলিত হইত। বহুকাল হইতে আর হয় না। নববস্ত্র পরিধান উৎসবের এক প্রধান অঙ্গ। আমরা লক্ষ্মী-সরস্বতী পূজা করি, কিন্তু তদুপলক্ষ্যে নববস্ত্র পরিধানের রীতি নাই। স্থানবিশেষে শ্যামাপূজার সময় ও বিষ্ণুর দোলযাত্রার সময় নববস্ত্র পরিধানের বিধি আছে। দশমী তিথিতে দেবীর বিসর্জনের পর নদীতে কিম্বা তড়াগে দেবীর প্রতিমা, বিল্বশাখা ও নবপত্রিকা নিক্ষিপ্ত হয়। তখন জল ও কাদা পরস্পরের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া ক্রীড়া করা হয়। ইহা উৎসবের এক অঙ্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণ রাঢ়ে জল-কর্দম নিক্ষেপ ও ক্রীড়া-কৌতুক আছে, কিন্তু অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ কখনও শুনি নাই। বোধহয় পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। শবরক্রীড়ার পর গৃহে আসিয়া গুরুজনকে প্রণাম, বন্ধুজনের পরস্পরের কুশল-সম্ভাষণ ও সকলের সিদ্ধিপানের ব্যবস্থা আছে। এখানে জিজ্ঞাস্য, অন্য দেবীর পূজায় শবরোৎসব হয় না, সিদ্ধি পানও হয় না। দুর্গোৎসবে হয় কেন? দশমীতে দেশীয় রাজ্যে নীরাজন হয়। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মার্জিত, তৈললিপ্ত,

অশ্ব-গজাদির গাত্র ধৌত, অলঙ্কৃত, পদাতি রণ-সজ্জায় ভূষিত হয়। মন্ত্রদ্বারা তাহাদের পূজা হয়। অপরাহ্নে রাজা কিম্বা সেনাপতি যুদ্ধযাত্রা করেন। সে দিন যাত্রা করিয়া রাখিলে পরে আবশ্যক কালের যুদ্ধে জয়লাভ হয়।

সিংহ-বাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী রণচণ্ডী রূপে দশভুজার পূজা হয়। প্রতিমায় যে বীর ও রৌদ্র রস প্রকটিত হয়, তাহা বঙ্গদেশে বাৎসল্য রসে পরিণত হইয়াছে। কবে হইতে এবং কেন চণ্ডী শিবের ঘরণী হইলেন, বঙ্গের ইতিহাসবেত্তারা অনুসন্ধান করিয়াছেন কিনা জানি না। যজমান গৃহী ও গৃহিণী মনে করেন, পার্বতী উমা পিতৃগৃহে তিন দিন আসিয়াছেন। তিন দিন থাকিয়া কন্যা শ্বশুর-গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। গৃহিণী কন্যাকে নির্মঞ্চন করেন। তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতে থাকে, আর বলেন, মা, আসছে বছর আবার এসো। পাঁজিতে দুর্গা প্রতিমার চিত্রে শিবের অনুচর নন্দীকে মেলানি মোট বাঁধিতে দেখা যায়। এসব কোথা হইতে কবে আসিল?

মহাভারতের বিরাট পর্বে ও ভীষ্ম পর্বে, দুই স্থানে দুর্গার স্তব আছে। মহাভারতে এই দুই স্তব প্রক্ষিপ্ত বিবেচিত হয়। প্রক্ষিপ্ত হউক, অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন। সেই দুই স্তব পাঠ করিলে আরও অনেক প্রশ্ন উদিত হয়। কিছু কিছু তুলিতেছি। যথা-- বিরাট পর্বের ৬ এর অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "হে যশোদানন্দিনি, নারায়ণ-প্রণয়িনী, কংসধ্বংসকারিনী কৃষ্ণে, হে বালার্ক সদৃশে চতুর্বক্ত্রে! বিন্ধ্যাচল আপনার শাশ্বত বাসস্থান।" দুর্গা যশোদা গর্ভসম্ভূতা, ইহা মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও অন্য পুরাণেও আছে। ইনি কংসাসুর বধ করিয়াছিলেন? দুর্গার এক নাম বিন্ধ্যবাসিনী কেন হইল? কিন্তু সেইখানেই আছে, কংস তাঁহাকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে তিনি আকাশ পথে গমন করিয়াছিলেন। ভীষ্মপর্বে ২৩-এর অধ্যায়ে অর্জুন বাসুদেবের বাক্যানুসারে স্তব করিতেছেন, "হে গোপেন্দ্রনুজে, নন্দগোপকুলসম্ভবে, কোকমুখে! তুমি জম্বু, কটক ও চৈত্যবৃক্ষের সন্নিধানে নিরন্তর অবস্থান কর। হে কান্তারবাসিনি, তোমার প্রসাদে রণক্ষেত্রে আমরা যেন জয়লাভ করিতে সমর্থ হই।" দুর্গা চতুর্মুখা। ব্রহ্মা চতুর্মুখা। কারণ চারি বেদ তাঁহার মুখ-কমল হইতে নির্গত হইয়াছে। মহেশ্বর মহাকাল, চতুর্যুগ নিরীক্ষণ করেন। দুর্গা কালী, তাঁহারও চতুর্মুখ হইতে পারে। কিন্তু এমন প্রতিমা দেখিতে পাই না। দুর্গা কোকমুখা। কোক, বন্য কুক্কুর। দুর্গার মুখ কুক্কুরের তুল্য। শিবা শব্দে দুর্গা ও শৃগালী বুঝায়। ইহার কারণ কি? তিনি থাকেন কোথায়? কান্তারে জম্বু, কটক ও চৈত্যবৃক্ষ সন্নিধানে। জম্বুগাছ -জামগাছ, কটক---কতক, অরিষ্ট--নির্মলী ফলের গাছ। চৈত্যবৃক্ষ অশ্বত্থ বোধ হয়। দুর্গা ও কালী স্বরূপতঃ একই। বঙ্গদেশে অনেক স্থানে শ্মশান-কালীর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরে মূর্তি নাই, নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শ্মশানকালী নাম আছে। বোধ হয় কান্তারে ঐ সকল বৃক্ষের সমীপস্থ কালী পরে শ্মশান-কালী নাম পাইয়াছেন। বাঁকুড়া রাইপুরে দুর্গার কোকমুখা পাষাণময়ী মূর্তি পূজিত হইতেছে। পূর্বে এক বৃক্ষ মূলে ছিল, এক্ষণে এক মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছে। কোন প্রদেশে এই দুই স্তব রচিত হইয়াছিল তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মহাভারতে বনপর্বে ২২৯-এর অধ্যায়ে আরও আশ্চর্য কথা আছে। দুর্গা মহিষাসুর বধ করেন নাই, কার্ত্তিকেয় করিয়াছিলেন।

এইরূপ বিরোধের মীমাংসা করিতে গিয়া পুরান-কারেরা বলেন, কল্পান্তরে দেবী নানা মূর্তি ধারণ করিয়া নানা অসুর বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কল্পান্তর সামান্য কথা নয়। ব্রহ্মার এক দিনের নাম কল্প। ব্রহ্মার সৃষ্টি যত কাল থাকে তত কাল। এক সৃষ্টি লয় পাইয়া আর এক সৃষ্টি আরম্ভ হইলে কল্পান্তর বলা যায়। আমরা দুই-চারি শত বর্ষের কথা স্মরণ রাখিতে পারি না। কল্পান্তরে কি হইয়াছিল কে জানিতে পারে? বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন দূরবর্তী প্রদেশে দুর্গার কীর্তির সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী প্রচলিত ছিল পুরাণ-কারেরা সে সকল স্ব স্ব বুদ্ধি ও কল্পনাবলে লিখিয়া গিয়াছেন। পরে স্মার্ত ভট্টাচার্যেরা পূজা-পদ্ধতিও দুর্গামাহাত্ম্যের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন।

কালী ও দুর্গাপূজায় জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে। শাস্ত্রকারেরা দেবী পূজায় এই অধিকার দিয়াছেন, একথা বলিতে পারা যায় না। সঙ্কটকালে ও যুদ্ধোদ্যমে দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা সকলেই করিতে পারে ও করিয়া থাকে। অধিক কালের কথা নয়, ডাকাতেরা কাটারীতে কালীপূজা করিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হইত।

বাঙ্গালী কালীপূজা করেন। আশ্চর্যের বিষয়, দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে কেরল দেশে কালীপূজা বহু প্রচলিত আছে। এমন গ্রাম নাই যে গ্রামে কালীপূজা ও তৎসম্পর্কে উৎসব হয় না। ভারতের পূর্বোত্তর অংশে আসামে ও বঙ্গদেশে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কেরলে একই দেবীর পূজায় প্রায় একই প্রকার উৎসব হইয়া থাকে। কিন্তু আসাম বিহার ও বঙ্গ ব্যাতীত আর কুত্রাপি মৃন্ময়ী দশভূজার পূজা হয় না। ইহারই বা হেতু কি?

দুর্গাপূজার পদ্ধতিতে অনেক দেশাচার বিধিবদ্ধ হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য দুর্গাপূজাতত্ত্ব ও দুর্গোৎসবতত্ত্ব লিখিয়াছেন। তিনি চারিশত বৎসর পূর্বে ছিলেন। তিনি কোন কোন বিধানের পৌরাণিক প্রমাণ তুলিতে পারেন নাই। সে সে স্থলে ইহাই আচার বলিয়াছেন। দেশাচারের উৎপত্তি নির্ণয় দুঃসাধ্য। দেশাচার ব্যতীত কুলাচার আছে। প্রসিদ্ধ পুরোহিত-বংশের এক এক দুর্গাপূজার পদ্ধতির পুথী আছে। তদনুসারে পুরোহিত যজমানের দুর্গাপূজা করিয়া থাকেন। সপ্তমীতে পশুবলীর বিধান নাই। কিন্তু কোন বাড়ীতে ছাগবলী হইয়া থাকে। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা বৈষ্ণব ধর্ম এত প্রচলিত করিয়াছিলেন যে দুর্গাপূজায় পশুবলি উঠিয়া গিয়াছে। এক কায়স্থ জমিদার বাড়ীতে বস্ত্রাচ্ছাদিত নবপত্রিকার উপর একটি মৃন্ময় নারীমুন্ড বদ্ধ হয়, এবং নবপত্রিকা দুর্গারূপে পূজিত হয়, পশুবলি হয় না। কিন্তু অন্ন ও মাগুর মাছের ঝোল ভোগ দেওয়া হয়। বিষ্ণুপুরের এক ভট্টাচার্যের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয়। ধাতু-নির্মিত দশভূজা প্রতিমা আছে। তদুপরি একটি মৃন্ময় নারীমুন্ড স্থাপিত হয়, প্রতিমা বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে। ইহার নাম মুন্ডপূজা। পশুবলি নাই, কিন্তু বিসর্জনের সময় পান্তা-ভাত ও পোড়া চেং মাছ জামিরের রস ও নুন মাখিয়া ভোগ দেওয়া হয়। কন্যা পতি-গৃহে যাইতেছেন, অন্ন ভোজন করিয়া যাইবার রীতি নাই, তিনি দই ও মুড়কির ফলার করিয়া যান। এইরূপ নানা স্থানে নানাবিধ কুলাচার পূজার অঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

প্রতিমা-নির্মাণেও দেশাচার প্রবল হইয়াছে। রাঢ়দেশে সূত্রধর প্রতিমা-নির্মাণ করে। কারণ সূত্রধর সেকালের ইঞ্জিনীয়র। প্রতিমা নির্মাণে মাপ-জোখের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কলিকাতা ও পূর্ববঙ্গে কুম্ভকার এবং পূর্বদিকে মৈমনসিং ও ত্রিপুরায় গ্রহাচার্য প্রতিমা-নির্মাণ করেন। প্রতিমা-নির্মাণ শিল্পকর্ম। বিশ্বকর্মার পূজা না করিলে শিল্পকর্মে অধিকার জন্মে না। শাস্ত্রজ্ঞান, কর্মাভ্যাস ও ধ্যান, এই তিনের যোগে প্রতিমা-নির্মাণ সার্থক হয়।

বঙ্গদেশে মৃন্ময়ী দশভূজার পূজা অধিক পুরাতন মনে হয় না। যাহারা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহারা শূলপাণি কৃত "দুর্গোৎসব বিবেক" নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন। শূলপাণি বঙ্গীয় নিবন্ধকার ছিলেন। তিনি চতুর্দশ খ্রীষ্ট-শতাব্দে ছিলেন। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি "দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী" লিখিয়াছিলেন। তিনিও এই শতাব্দে ছিলেন। ইহাদের পূর্বে বঙ্গীয় ভবদেব ভট্ট দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি একাদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দে ছিলেন। তিনি কতিপয় পূর্ববর্তী স্মৃতিকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দুর্গার প্রতিমা পূজার লিখিত নিদর্শন দশম খ্রীষ্ট-শতাব্দের সেদিকে পাওয়া যায় নাই। এই পূজা কোথা হইতে আসিল?

নিবন্ধ থাকিলেও দুর্গাপূজা অধিক প্রচলিত ছিল না। লোকবল ও ধনবল না থাকিলে এই পূজা সম্পন্ন হইতে পারিত না। ইহার পরিবর্তে লোকে মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা করিত। এই পূজা আট দিনে সম্পন্ন হইত।

প্রায় শত বৎসর পূর্বে রাঢ়দেশে অনেক বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। বর্তমানে তাহার এক আনা মাত্র আছে কিনা সন্দেহ। শরৎঋতু যমদংষ্ট্রা, লক্ষ্মীও চঞ্চলা। মেলেরিয়ায় ও কালদোষে যাবতীয় উৎসব শ্রীহীন ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বাঙ্গালীর জীবন যাত্রায় কত ব্রত, কত পূজা, কত পরব ছিল তাহা পাঁজি দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেকটিতেই অস্ফুট আশঙ্কা ও বিমল তৃপ্তি মিলিত হইয়া জীবন মধুময় ও উপভোগ্য হইত।

পূর্ববঙ্গে গ্রামে গ্রামে অনেক বাড়ীতে দশভূজার পূজা হইয়া থাকে।

সে দেশ নিশ্চয় ধন্য। দুঃখের বিষয় আমি সে দেশের দুর্গাপূজা দেখিবার সুযোগ পাই নাই। পশ্চিমবঙ্গের আর সেদিন নাই। এখন গ্রাম উৎসবহীন নিরানন্দ। সে উৎসাহ সে ভক্তি সে আনন্দ সে 'দীয়তাং ভুজ্যতাম' ধ্বনি আর নাই। "গিরি হে, গৌরী আমার এসেছিল," এই হৃদয়স্পর্শী গানও নাই। এখন যাঁহারা পূজা করিতেছেন, তাঁহারা পিতৃপুরুষের অনুষ্ঠিত ব্রত পালন করিতেছেন। অধিকাংশ স্থলে মহানবমীতে ঘটে পূজা করিয়া নিয়ম রক্ষা করিতেছেন।

কয়েক বৎসর হইতে নগরে নগরে সার্বজনীন দুর্গাপূজা হইতেছে। সে কালে আমরা যাহা বারোয়ারী বলিতাম এখন তাহা সার্বজনীন নাম পাইয়াছে। কারণ বার শব্দ সংস্কৃত। ইহার অর্থ 'সমূহ'। সমূহ মিলিয়া যে পূজা, তাহা বার-আরী, বারোয়ারী পূজা। বারোয়ারী কালীপূজা প্রচলিত ছিল। গ্রামস্থ সকলে মিলিয়া কালীপূজা করিত। বিশেষতঃ মহামারী হইলে গ্রামস্থ সকলে মিলিয়া রক্ষাকালীর পূজা করিত। সার্বজনীন হউক, বারোয়ারী হউক, কবি বলিয়াছেন, "শক্তিপূজা-মুখের কথা নয়।"

এখনকার ইংরেজী-পড়া যুবকেরা দেবদেবীর পূজার অর্থ বুঝিতে পারে না। কেহ কেহ মনে করে কুসংস্কার। অনেকে পূজা শব্দের অর্থও জানে না, মনে করে পুষ্প নৈবেদ্য না দিলে পূজা হয় না। তাহারা ভাবে না, মহাত্মা গান্ধী বঙ্গদেশে আসিলে সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার পূজা করিয়াছিল। আচরণ দ্বারা, কেহ তাঁহার প্রিয় চরকায় সূতা কাটিয়া, কেহ তাঁহার কর্ম নির্বাহের নিমিত্ত অর্থ দিয়া পূজা করিয়াছিল। লাটসাহেব নগরে আসিবার পূর্বে পথ পরিস্কৃত ও জল সিক্ত, পথের দুই পার্শ্বে বনমালা লম্বিত, স্থানে স্থানে তোরণ নির্মিত, সভামন্ডপ সুসজ্জিত হয়। আগমন কালে তুর্যধ্বনি হয়, বাদ্যি আগমন ঘোষণা করে। তিনি সভামন্ডপে প্রবেশ করিলে সমবেত ভদ্রমন্ডলী দন্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্তব করেন, তাঁহার গুণ ও কর্মকীর্তন করেন। ইংরেজীতে বলি address পাঠ করেন। স্তবের শেষে বর প্রার্থনা করেন। যেমন, আমাদের জলকষ্ট হইয়াছে- জল দান করুন, আমরা মেলেরিয়া রোগে ভুগিতেছি- চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন, আমাদের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিন ইত্যাদি। আমরা গুরুজনের পূজা করি, বন্ধুর পূজা করি। আচরণ দ্বারা প্রসন্ন করিয়া গুরুজনের আশীর্বাদ, বন্ধুজনের সহৃদয়তা কামনা করি। যাহা হইতে উপকার আশা করি, তাহা আমাদের পূজার্হ। আমরা গাভীর পূজা করি। গাভীর দ্বারা আমাদের কি উপকার হয়,তাহা স্মরণ করি। গৃহের অঙ্গণে তুলসী গাছ পালন করি, দেখিলে হরি স্মরণ হয়। ইহার মধ্যে কু কোথায়? বর্ষে বর্ষে এক নির্দিষ্ট দিনে রবীন্দ্রনাথের পূজা হইতেছে। তাঁহার চিত্র পুষ্পমাল্য বেষ্টিত হইয়া উচ্চ মঞ্চে স্থাপিত হইতেছে। ভক্তেরা তাঁহার স্তব করেন। কেহ কি চিত্রে পূজা করেন? তবে চিত্র কেন? পুষ্পমাল্য কেন? দিন নির্দিষ্ট কেন?

দুর্গাপূজা জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কল্পান্তর ও আনুষঙ্গিক অসংলগ্ন অঙ্গ দেখিলে মনে হয়, এই পূজা একদেশে প্রবর্তিত ও বর্ধিত হয় নাই। নানা দেশের প্রচলিত বিধি ও আচার যুক্ত হইয়াছে। ঐতিহাসিকেরা এইসকল আগন্তুক অনুষ্ঠান দেখিয়া উৎপত্তি চিন্তা করিয়াছেন। কেবল শাখা-পল্লব দেখিলে এই রূপ ভ্রম অবশ্যম্ভাবী।

(আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি রচিত 'পূজা-পার্বণ' বই থেকে সংকলিত)

মহারাজা রাবণ

দেব কুমার শর্মা

দুর্গাপূজার সাথে মহারাজা রাবণের বিশেষ সম্পর্ক আছে; বলা যায় রাবনের কারণেই এই ভারতবর্ষে দুর্গাপূজার প্রচলন হয় এবং এর প্রচলন করেন শ্রী রামচন্দ্র, রাবণ বধের বর লাভের জন্যে। আদতে প্রাচীনকালে লংকার রাজা রাবণ যথার্থ শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে মাতৃরূপে দেবী দুর্গার পূজা করতেন বসন্তকালে। সেই পূজা আজও প্রচলিত আছে "বাসন্তী পূজা" নামে। আর আমরা যে দুর্গাপূজা করি তার নাম ''অকাল বোধন'' এবং পূজা কোন মহান উদ্দেশ্যে করা হয় নাই। এই পূজার উদ্দেশ্য ছিল মা দুর্গার পরম ভক্ত ও আশ্রিত লঙ্কাধিপতী মহারাজ রাবণকে হত্যার জন্যে দেবী দুর্গার অনুমতি লাভ করা। কারণ মা দুর্গার আশীবাদ ও ছায়া যত দিন রাবণের উপর থাকবে, বিশ্ব ব্রক্ষ্মাণ্ডে এমন কোন শক্তি নেই যে রাবণের কোন ক্ষতি করতে পারে। অথচ আমরা সাধারণভাবে জানি- রাবণ এক রাক্ষস, হিংস্র, অত্যাচারী, নারী অপহরনকারী ও অপশক্তি যার ১০টি মাথা ও মুখ, হাতে হিংস্র থাবা, সামনে পেলে আমাদের খেয়ে ফেলবে। রামপত্নী মাতা সীতাকে অপহরণের অপরাধে রাবণকে আমরা এক অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির শক্তি হিসাবে বিবেচনা করি। প্রকৃত অর্থেই কি রাবণ এরকম ভয়ঙ্কর বিভৎস কিছু ছিলেন এই রচনার মাধ্যমে সে দিকেই অলোকপাত করব-

রাবণের বংশ পরিচয় কিন্তু অত্যন্ত উজ্জ্বল। রাবণের পিতা তপসিদ্ধ মহান ভিসর্বা মুনি। এই ভিসর্বা মুনি আবার স্বয়ং ব্রক্ষার মানষপুত্র এবং সপ্তঋষিদের একজন মহাঋষি পুনস্থের পুত্র। তাহলে দেখা যাচ্ছে রাবণ সরাসরি পিতামহ ব্রক্ষার অধস্তন ৪র্থ পুরুষ। কাজেই অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে অত্যন্ত পবিত্র বংশে এবং ঋষি কুলের জাত সন্তান তিনি। মাতার দিক থেকে তিনি রাজ রক্তের ধারক। পাতাল রাজ মহা বিক্রম শালী সম্রাট সুমালীর (মতান্তরে সমলয়ার) অত্যন্ত বিদুষী কন্যা কাইসকির পুত্র। মহারাজ সুমালী তার কন্যা কাইসকিকে নানা বিদ্যা, সংগীত ও নৃত্যকলায় পারদর্শী করে তুলেছিলেন। কন্যা বিবাহযোগ্যা বরপ্রাপ্ত হলে- সুমালী কন্যাকে বললেন তুমি, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল পরিক্রমা করে এমন পাত্র/স্বামী নির্বাচন কর যাতে তোমাদের সন্তান পৃথিবীতে আপন শৌর্য্য, বীর্য ও জ্ঞানে অতুলনীয় হয়ে উঠে। মহারাজ সুমালীই সেই প্রসঙ্গে পিতামহ ব্রক্ষার পৌত্র মহাঋষি ভিসর্বার কথা কন্যাকে বলেছিলেন। ভিসর্বা মুনির প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান হচ্ছেন যক্ষরাজ কুবের, যিনি দেবতাদের অত্যন্ত প্রিয়। তিনিই দেবতাদের এবং পৃথিবীর ধন-রত্নের রক্ষক। সুমালী চেয়েছিলেন তার কন্যাও এমনি গুনবান পুত্রের মাতা হন- যিনি অসুর কুলের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করতে পারবেন।

মাতা কাইসকি ও পিতা ভিসর্বা মুনির ঘরে জন্ম নেন রাবণ, জন্মক্ষন বিচারে তিনি দেবগণের জাত। পিতা ব্রাক্ষন এবং মাতা ক্ষত্রিয়- এরূপ ক্ষেত্রে সন্তানের পরিচয় তার পিতার সূত্রেই হয়ে থাকে, তাই তিনি জন্ম সূত্রেই ব্রাক্ষন। রাবণের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের পরিধা বিচার করে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র, শ্রী রাবণকে "মহাব্রাক্ষন" বলে সম্বোধন করতেন। রাবণ ছিলেন বেদপাঠী, অগ্নিহোত্রি এবং গভীরভাবে দেবাদিদেব মহাদেব ও মাতা পার্বতী (দুর্গার) উপাসক ও ভক্ত।

রাবণের ছিল আরও দুই ভাই এবং এক বোন মহাবলী কুম্ভকর্ন, মহান রামভক্ত বিভীষন এবং বোন চন্দ্রমুখী (যার আর এক প্রচলিত নাম সূর্পনখা)। তিন সন্তানকেই ঋষি পিতা ভিসর্বা শৈশবে চারটি বেদ ও ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ করান, পূজা, শুদ্ধ কর্ম, ধ্যান ও সাধনার অভ্যাস ও কৌশল প্রদান করেন। সংস্কৃতে রাবণ শব্দের অর্থ কান্না বা কান্নার কারণ। কিন্তু রাবণ জন্মেছিলেন লঙ্কা বা বর্তমান সিংহলে, আর সিংহলি ভাষায় রাবণ শব্দের অর্থ সূর্য্যের বংশ বা সূর্য্যের পুত্র। রাবণ বহুবিধ গুনের অধিকারী বিদ্বান, কবি, পণ্ডিত, ধার্মিক। অপর দিকে তিনি নানাবিধ অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী। সুদীর্ঘ তপস্যার মাধ্যমে তিনি ব্রক্ষা ও মহেশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেন এবং সেইসাথে নানা বিদ্যা ও অস্ত্র-সস্ত্র লাভ করেন। কৈলাস পর্বতে গিয়ে তিনি শিবের সাথে দেখা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শিবের রক্ষীদল তাকে শিবের কাছে যেতে বাধা দেন। তখন রাবণ কৈলাশেই এক পর্বতের গুহায় বসে ধ্যান শুরু করেন এবং একটি বিখ্যাত শিব-স্তুতি রচনা করেন- যার কিছু অংশ উল্লেখিত হলো:

"জঠাটবী-গনজ্জল-প্রবাহ-পাবিত-স্থলে
গনে হ বলম্ব্য নম্বিতাং ভুজঙ্গ-তুঙ্গ-মালিকাম্।
ডমড্-ডমড্-ডমড্-ডমন্নিনাদ-বড্ডমব্যয়ং
চকার চণ্ড তান্ডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্।।

জটাকটাহ সম্ভ্রমন্নিনি স্পমির্ঝরী
বিলোলবীচিবল্লরী-বিরাজমান-সূৰ্দ্ধনি।
ধগদ্ধ গদ্ধগজলন্ননাট-পট্ট-পাবকে
কিশোর চন্দ্র শেখরে রতিঃ প্রতিক্ষনং মম।।

যে ব্যক্তি রাক্ষস রাজ হয়েও স্বশরীরে কৈলাসে যেতে পারেন, দেবাদিদের সাথে দেখা করতে পারেন, তিনি তপস্যার মাধ্যমে পিতামহ ব্রক্ষার সাক্ষাৎ পান এবং বর লাভ করেন- নিঃসন্দেহে তিনি কোন ঘৃনীত জীব হতে পারেন না। রাবন কৈলাসে তপস্যা ও ভোলানাথকে সন্তুষ্ট করেন এবং 'বর' লাভ করেন। মাতা পার্বতী রাবণকে কোন দেব-দানবের হাত থেকে রক্ষা করার 'আশীষ' (বর) প্রদান করেন। মাতা পার্বতীর এই আশীর্বাদের কারনেই শ্রী রামচন্দ্র রাবণ বধে ব্যর্থ হচ্ছিলেন বার বার।

তখনই তিনি অকাল বোধনের মাধ্যমে দুর্গারূপী মাতা পার্বতীর পূজা করেন- রাবণের উপর থেকে মাতার এই রক্ষা-কবচ প্রত্যাহারের জন্যে। এটাই আমাদের আজকের দিনের প্রচলিত দুর্গাপূজা। কৈলাসে রাবণের তপস্যায় বাবা ভোলানাথ খুশী হয়ে তাকে নানা বিদ্যা অস্ত্র ও ক্ষমতা প্রদান করেন এবং ভোলানাথের প্রতীক রূপে একটি জাগ্রত 'শিবলিঙ্গ' প্রদান করেন। আমাদের মধ্যে যাদের শিবসুন্দর ও মাতা পার্বতীর উপর বিশ্বাস ও ভক্তি শ্রদ্ধা আছে- তারা নিশ্চয় একথা বিশ্বাস করবেন না যে, মহাদেব কোন জঘন্য প্রকৃতির রাক্ষসকে এতটা আশীর্বাদ ও বর দিয়েছেন। একজন নারী (মাতা সীতা) অপহরনকারীকে (রাবণকে) আর এক মাতা পার্বতী তথা দুর্গাদেবী, কেনই বা দেব-দানবের হাত থেকে সর্বদা রক্ষা করার আশীর্বাদ দিবেন। তদুপরি মাতা পার্বতী নিশ্চয় একথা জানতেন যে মাতা সীতা স্বয়ং বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা লক্ষ্মীর অবতার। পরম শিব ভক্ত রাবণেরও একথা অজানা থাকবার কথা নয়। শ্রীরাম পত্নী সীতার প্রকৃত পরিচয় যে

রাবণের জ্ঞাত ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সীতা অপহরণের পর রাবণ জোর করে পুষ্পক রথে উঠিয়ে নেয়া ছাড়া তাঁর লঙ্কার বসবাসের দীর্ঘ সময়ে কোনভাবেই কোন শক্তি প্রয়োগ করেননি, কোন প্রকার নির্যাতন বা অপমান করেছেন বা রাক্ষস স্বভাব সুলভ কোন আচরণ করেছেন বলে কোথাও কোন উল্লেখ নেই। রাবণের বিশাল প্রাসাদের কোন প্রকোষ্ঠে তাকে বন্দী রাখেননি তিনি। বরং সীতা মাতার বনবাসের প্রতীজ্ঞার প্রতি মর্যাদা দেখিয়ে, এবং সকল পুরুষ রাক্ষসদের সম্পূর্ণ বাইরে, রাবণের অতি প্রিয়, অতি মনোরম "অশোক বনে"-র পবিত্র অঙ্গনে তাঁকে বসবাস করতে দেন। আর মাতার দেখাশুনা ও প্রহরী রূপে শুধুমাত্র নারী রাক্ষস নিয়োগ করেছিলেন। কোন পুরুষ রাক্ষস সেখানে প্রবেশের অধিকারই ছিল না। এই অশোক বনটি ছিল লঙ্কেশ্বরের অত্যন্ত প্রিয়। স্বর্গ বিজয়ের সময় রাবণ এইরূপ একটি সুন্দর সাজানো বাগান- যা নানা প্রকার দুর্লভ ফুল ও ফলের গাছে ভরা, সেখানে দেখেছিলেন। শিল্পীমনের অধিকারী রাবণ- সেই স্বর্গীয় উদ্যানের অনুকরণে এবং সেখান থেকে নানা গাছের চারা এনে এই অশোক বনটি রচনা করেছিলেন। রাবণ এবং তার অতি ঘনিষ্ঠজন ছাড়া কারো কখনো আশোক বনে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সেই অশোক বনেই সীতা মাতার থাকার ব্যাবস্থা করেছিলেন রাবণ। প্রশ্ন আসে, কেন অপহরণকৃত একজন নারীর এত সম্মান, এত সমাদর রাবণের কাছে। কারণ তিনি জানতেন সতী সীতা বৈকুণ্ঠধীপতি শ্রীবিষ্ণু পত্নী মাতা লক্ষ্মীর অবতার। আর তাদের সাথেই রাবণ ও কুম্ভকর্নের জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক। এতকিছু জানার পরও কেন রাবণ- এই অপকর্মটি করলেন- এবারে আসছি সেই প্রসঙ্গে।

ভগবত পুরাণের মতে- রাবণ ও তার ভাই কুম্ভকর্ন আদিকালে ছিলেন জয়া ও বিজয়া। এই জয়া ও বিজয়া শ্রীবিষ্ণু ও মাতা লক্ষ্মীর অত্যন্ত প্রিয় ও নির্ভরযোগ্য। তাই তাঁরা জয়া ও বিজয়াকে নিয়োগ করেছিলেন বৈকুন্ঠের দ্বাররক্ষক হিসাবে। লীলাময়ী লক্ষ্মী-নারায়ন একদিন বৈকুণ্ঠে বিশ্রাম রত। বিশ্বস্ত দ্বাররক্ষী জয়া ও বিজয়ার উপর নির্দেশ ছিল-যেন কেউ তাঁদের বিশ্রামে ব্যাঘাত না ঘটায়, কেউ যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করতে না পারে এখন। এরই মধ্যে কিছুক্ষণ পর মহাঋষি সনৎ কুমার সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাত করতে চান অবিলম্বে। কিন্তু লক্ষ্মী-পত্নী শ্রীবিষ্ণুর আদেশ-কোন ভাবেই যেন তাঁদের বিশ্রামের বিঘ্ন না ঘটে। জয়া-বিজয়া শ্রদ্ধাভরে জানালেন সে কথা ঋষি সনৎ কুমারকে। আহত হলো মহাঋষির অহমিকা, তিনি জোর করে প্রবেশ করতে চাইলেন বৈকুণ্ঠে, অপর দিকে প্রভুর আদেশ পালনের জন্যে প্রবেশ পথে বাধা দিলেন রক্ষীদ্বয়-জয়া-বিজয়া, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ঋষিবর, অভিশাপ দিলেন দুই দ্বাররক্ষীকে- মর্তে গিয়ে অধ:পতিত জীবন নিয়ে জন্ম নেবার। এসময় হরিহর বিষ্ণু সেখানে উপস্থিত-পরিস্থিতি দেখে মহাবিপদে পড়লেন- একদিকে প্রিয় ভক্ত ঋষি সনৎ কুমার, অপর দিকে তাঁর নিজের দুই দ্বাররক্ষী- যারা শুধু প্রভুর নির্দেশ পালন করতে গিয়ে আজ ঋষির অভিশাপে অভিশপ্ত। জয়া-বিজয়ার করুণ আকুতি: "প্রভু কৃপা কর, উদ্ধার কর এই অভিশাপ থেকে, তোমার এই বৈকুন্ঠের দ্বার ছেড়ে ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও আমরা শান্তি পাব না।" অবশেষে শ্রীবিষ্ণু মুখ খুললেন- "আমি জানি তোমাদের প্রতি অবিচার হয়েছে, কিন্তু সিদ্ধ ঋষির অভিশাপ একমাত্র তিনি নিজেই প্রত্যাহার বা শীথিল করতে পারেন।" সমস্ত কিছু অবগত হয়ে ঋষি সনৎ কুমারও ব্যথিত হলেন। তিনিও শ্রী বিষ্ণুকে অনুরোধ করলেন- জয়া বিজয়াকে এই অভিশাপের কবল থেকে মুক্তির পথ বলে দিতে।

করুণাসাগর শ্রীবিষ্ণু বললেন- ঋষি সনৎ কুমারের অভিশাপ থেকে মুক্তির দুটি পথ আছে। প্রথম পথ হচ্ছে- বিষ্ণুভক্ত রূপে তোমরা সাতবার পৃথিবীতে জন্মাবে এবং মৃত্যুবরণ করবে। সপ্তম বার মৃত্যুর পর তোমরা বৈকুণ্ঠে ফিরে আসবে।

দ্বিতীয় পথ হচ্ছে- চরম রূপ বিষ্ণু বিদ্বেষী হয়ে তোমরা তিনবার পৃথিবীতে জন্মাবে এবং প্রতিবারই বিষ্ণুর হাতে তোমাদের মৃত্যু হবে। এভাবে তৃতীয় মৃত্যুর পর তোমরা আমার কাছে বৈকুণ্ঠে চলে আসবে।

জয়া-বিজয়া বললেন, "প্রভু, আমরা সাত জনম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাই না, তিন জনমেই তোমার হাতে মৃত্যু লাভ করে তাড়াতাড়ি বৈকুণ্ঠে ফিরে আসতে চাই।" শ্রী বিষ্ণু আশীর্বাদ করলেন- "বেশ তাই হবে।" বৈকুণ্ঠের দ্বার রক্ষক জয়া-বিজয়ার অভিশাপ-মুক্তির প্রথম জন্ম হলো- সত্যযুগে হিরনাক্ষ ও হিরন্যকষিপু। হিরনাক্ষ বিষ্ণুর বরাহ অবতারের হাতে নিহত হন। আর হিরন্যকষিপু নরসিংহ রূপী বিষ্ণুর হাতে নিহত হন। দ্বিতীয় জন্মে ত্রেতা যুগে- রাবণ ও কুম্ভকর্ন রূপে তারা জন্ম নেন এবং শ্রী বিষ্ণুর রাম অবতারের হাতে নিহত হন।

আর তৃতীয় জন্মে দাপর যুগে মহাভারতের কালে তারা জন্ম নেন- রাজা দন্ত বক্র ও রাজা শিশুপাল রূপে কুশল দেশের রাজা হিসাবে। এবারে তারা মৃত্যুলাভ করেন শ্রীকৃষ্ণ রূপ শ্রীবিষ্ণুর হাতে। এবং এই মৃত্যুর পরই জয়া-বিজয়া শাপমুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে ফিরে যান।

এবার আসা যাক ত্রেতা যুগে রাবণ ও কুম্ভকর্নরূপী জয়া-বিজয়ার কাহিনীতে। রাবণ ও কুম্ভকর্ন পর্বত কন্দরে দীর্ঘদিন সাধনা করলেন। রাবণ ব্রহ্মার 'বর' লাভের পর দীর্ঘ তপস্যায় বসলেন, কিন্তু পিতামহ ব্রহ্মা কিছুতেই দর্শন দিচ্ছেন না। দু:খে কষ্টে হতাশায় রাবণ তরবারী দিয়ে নিজের শির কেটে যজ্ঞানীতে অর্পণ করেন। কিন্তু ব্রহ্মার ইচ্ছায় মুহূর্তের মধ্যে নতুন একটি মাথা রাবণের ঘাড়ে গজিয়ে উঠলো। রাবণ বুঝলেন ব্রহ্মা তার 'শির' উৎসর্গ গ্রহণ করেননি। তাই এবার দ্বিতীয় মাথাটিও একইভাবে কেটে যজ্ঞানীতে অর্পণ করলেন। কিন্তু অবারও রাবণের তৃতীয় মাথাটি গজিয়ে উঠলো। রাবণ সেটি কেটে যজ্ঞানীতে আহুতি দেন। এইভাবে রাবণ দশম বার তার ছিন্ন শির যজ্ঞানীতে ব্রহ্মার কাছে আহুতি দেবার পর পিতামহ ব্রহ্মা ভক্তের ডাকে আর সাড়া না দিয়ে থাকতে পারলেন না, দিব্যদর্শন দিলেন ভক্ত রাবণকে। কতজন তপস্যির কথা আমরা জানি- যিনি আপন শির কেটে দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পণ করেছেন? আশা করি এটা বিচার করতে কারো অসুবিধা হবে না যে- কত উচু স্তরের তপস্যি ছিলেন রাবণ।

যাই হোক, রাবণের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা দর্শন দিলেন, বর চাইতে বললেন রাবণকে। এ'জন্মের সংস্কারের বশে রাবণ চাইলেন অমরত্বের বর। ব্রহ্মা রাবণকে বললেন, "যারা পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে, মৃত্যু তার অবধারিত। তাই অমরত্বের বর দেয়া সম্ভব নয়।" তার বদলে ব্রহ্মা রাবণকে দান করলেন অমৃত সুধা। এই অমৃত সুধা যতদিন অক্ষুন্ন থাকবে, ততদিন রাবণ অমর থাকবে। রাবণ বিশেষ যৌগিক পদ্ধতিতে আপন নাভীদেশে সেই 'অমৃত সুধা' ধারণ করলেন। ব্রহ্মার বরে যজ্ঞানীতে নিবেদিত ১০টি মাথা প্রজাপতি ব্রহ্মা জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম, শাস্ত্র, কলা, সংগীত ইত্যাদি নানা বিদ্যায় পরিপূর্ণ করে রাবণকে উপহার দিলেন, যা রাবণের ইচ্ছামত বিকশিত হত, আবার সংকুচিত হয়ে এক মাথায় পরিনত হত। এজন্যে রাবণকে "দশানন" বলা হতো।

ব্রহ্মার আশীর্বাদ লাভের পর রাবণ দেবদিদেব মহাদেবের দর্শন লাভের এবং বর লাভের জন্যে কঠোর তপস্যা শুরু করেন। সেই তপস্যায় মাতা পার্বতী ও মহাদেবকে তুষ্ট করে রাবণ বহু দিব্য অস্ত্র, দিব্য শক্তি ও অত্যন্ত শক্তিশালী "চন্দ্রহার তরবারী" লাভ করেন। রাবণ আজীবন শিব ও পার্বতীর ভক্ত ও পূজারী ছিলেন। প্রতিদিন প্রাতে তিনি শুদ্ধ চিত্তে শিব সুন্দরের পূজা সমাপন করার পর জল গ্রহণ করতেন। আমরা যারা এ'জগতে রাবণকে জঘন্য রাক্ষস বলে ঘৃণা করি, তাদের মধ্যে ক'জন আছেন যাদের সাধন ভক্তিতে রাবণের সাথে তুলনীয়? এমন একজন জ্ঞানী তপস্যি কেন অপহরণ করলেন সীতারূপী মাতা লক্ষ্মীকে? এবারে

আসি সে প্রসঙ্গে।

স্বর্গ-মর্ত-পাতাল-ত্রিলোকে রাবণের আধিপত্য। সকল প্রকার সুখ-সাচ্ছন্দ্য, বিলাস-ভোগ তাঁর হাতের মধ্যে। ব্রহ্মার বলে প্রাপ্ত "অমৃত সুধার" বদৌলতে রাবণ সকলের কাছে অজেয়। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পাত্র মিত্র বৈভবে লঙ্কার রাজ প্রাসাদ পরিপূর্ণ। তারপরও কোথায় যেন একটা বিষাদ অপূর্ণতা। কিসের অভাব সেটা। ধ্যানমগ্ন হয়ে রাবণ অবগত হলেন তার পূর্বাপর জন্মের কাহিনী, মনে পড়ল সেই প্রিয় বৈকুণ্ঠ আর লীলার সাগর শ্রীবিষ্ণুকে। রাবণ জানেন শ্রীবিষ্ণু বা তার কোনরূপ অবতারের হাতে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাঁর এই রাক্ষস জন্ম থেকে মুক্তি নেই, ফেরার পথ নেই সেই প্রিয় বৈকুণ্ঠে। পৃথিবী পরিভ্রমন করেও তিনি কোথাও কোন বিষ্ণু অবতারের সন্ধান পেলেন না। তবে কি করে আসবে তার মৃত্যু ও মুক্তি?

রাবণ সোজা চলে গেলেন বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণুর সাথে দেখা করতে। কিন্তু বৈকুণ্ঠের দ্বারে প্রহরী আটকালো রাবণকে। প্রহরীর মাধ্যমে রাবণ আবেদন পাঠালেন শ্রীবিষ্ণুর কাছে, তিনি তাঁর সাক্ষাত প্রার্থী। কিন্তু খবর এলো- শ্রীবিষ্ণু এখন মাতা লক্ষ্মীর সাথে আলাপ ও বিশ্রাম-রত। এখন দেখা হবে না। বারবার রাবণ যেতে লাগলেন বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণুর সাথে দেখা করতে। কিন্তু প্রতিবারই তিনি শুনলেন সেই একই কথা- শ্রীবিষ্ণু মাতা লক্ষ্মীর সাথে বিশ্রাম যাপন করছেন। ভীষণ রাগ ও অভিমান হলো রাবণের। প্রভুর আদেশ পালন করতে গিয়েই ঋষি সনৎ কুমারের অভিশাপে তার এই রাক্ষস জনম। সেদিনও মাতা লক্ষ্মীর সাথে বিশ্রাম ও আলাপরত থাকায়, ভক্ত সনৎ কুমারের সাথে দেখা করতে চান নি, অবজ্ঞা করেছেন তাঁর ভক্তকে, আজও বারবার রাবণ শ্রীবিষ্ণুর সাথে দেখা করতে পারছেন না মাতা লক্ষ্মীর কারনে। মাতা লক্ষ্মী যেন শ্রীবিষ্ণুকে মোহান্ধ করে ফেলেছেন, বিমুখ করেছেন ভাব ভক্তদের প্রতি, তার সৃষ্টির প্রতি। তিনি তো বিষ্ণু, জগতের প্রতিপালক, মাতা লক্ষ্মীর মোহে তিনি এভাবে আচ্ছন্ন থাকলে সৃষ্টির বিঘ্ন ও বিনাশ হবে। আর রাবণের বৈকুণ্ঠে ফিরে আসাও বিলম্বিত হবে। বৈকুণ্ঠের দ্বারে দাঁড়িয়েই রাবণ প্রতিজ্ঞা করলেন বিষ্ণুর এই অন্ধ লক্ষ্মীর মোহ থেকে তাকে বাইরে আনবেন তার নিজের ও জগতের কল্যাণে। অবতার রূপে পৃথিবীতে জন্ম নিতে শ্রীবিষ্ণুকে তিনি বাধ্য করবেন।

ক্ষুব্দ, বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে ফিরে এলেন রাবণ লঙ্কায়। দূর্জনের বিনাশ ও ভক্তের রক্ষার জন্যে, বিষ্ণু অবতাররূপে জন্ম নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই রাবণ হয়ে উঠলেন দুর্জন, স্বর্গের দেবতাদেরকে বন্দী বানালেন। পৃথিবীতে বিষ্ণুপূজা বন্ধ করলেন, বিষ্ণু-ভক্তদেরকে নির্যাতন ও হত্যা করতে লাগলেন, সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্তিমান মানুষদেরকে বিনাশ করতে লাগলেন- আর অপেক্ষা করতে লাগলেন, কবে এই বিনাশের বার্তা, দুষ্কর্মের বার্তা শ্রীবিষ্ণুর কাছে পৌছাবে, তিনি কৃপা করে জন্ম নেবেন এই ধরাধামে, আর এই সকল অপকর্মের দুরাচারের হোতা রাবণরূপী জয়াকে মৃত্যু দানের মাধ্যমে উদ্ধার করবেন।

অবশেষে এলো সেই সুখবর, যার জন্যে রাবণ অপেক্ষা করে আছেন বহুকাল। অযোধ্যায় রাজা দশরথের ঘরে জন্ম নিয়েছে শ্রীবিষ্ণু অবতার রামচন্দ্র, আর জনক রাজার ঘরে সীতারূপে জন্ম নিয়েছেন- মাতা লক্ষ্মী। রাবণ বুঝলেন তাঁর মুক্তির দিন ঘনিয়ে আসছে। রাবণ জানতে পারলেন প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়ে শ্রী রামচন্দ্র ও মাতা সীতা এখন বনবাসে এবং বর্তমানে দণ্ডকারণ্যে আছেন। এইবার তবে মাতা লক্ষ্মীর প্রতি শ্রীবিষ্ণুর অন্ধ মোহ ভাঙ্গার সুযোগ এল, সেই সাথে শ্রী রামচন্দ্রকে লঙ্কায় আসতে বাধ্য করতে এবং শ্রী রামচন্দ্রের হাতে মৃত্যুর মাধ্যমে এই রাক্ষস জনম থেকে মুক্তির সময় আসন্ন। সকল প্রকার প্রস্তুতি নিয়ে রাবণ উপস্থিত হলেন দণ্ডকারণ্যে। রাবণের পক্ষে আকাশ পথেই দণ্ডকারণ্যে যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু তার পরিকল্পনা ছিল পিতা মাতাকে সংগে করেই তিনি লঙ্কায় ফিরবেন। আর পিতা মাতার আকাশ পথে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে কষ্ট হবে। তাই রাবণ মাতার কষ্ট ও পরিশ্রম কমানোর জন্যে যাওয়ার সময় পুষ্পক রথটি সাথে নিয়ে যান এবং এই রথে করেই দ্রুত ও নিরাপদে সীতারূপী মাতা লক্ষ্মীকে লঙ্কায় নিয়ে আসেন। আর এরই পরিনতিতে শ্রী রামচন্দ্রের লঙ্কায় গমন, রাম-রাবণের যুদ্ধ। এই যুদ্ধেই শ্রী রামচন্দ্র রাবণ ও কুম্ভকর্নকে বধের মাধ্যমে তার দুই পরম ভক্তকে অভিশপ্ত রাক্ষস জনম থেকে মুক্ত করেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, রাবণের সীতা অপহরণের পিছনে তাঁর কোন কু-মতলব বা অশুভ চিন্তা ছিল না। বরং ছিল আপন অশুভ জন্মের থেকে মুক্তি, আর সেই সাথে শ্রীবিষ্ণুর মোহন্ধতা ভঙ্গের মাধ্যমে ভক্ত ও সৃষ্টির কল্যাণ সাধন।

কাজেই কোন বিচারেই রাবণকে হিংস্র, পাপী বা অপসৃষ্টি বলার উপায় নেই। ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ইতিহাসে কতজন তপস্যি আছেন যারা রাবণের মত কঠোর ও দীর্ঘ তপস্যা করেছেন?

পবিত্র নদী নর্মদায় তপস্যাকালে যদু বংশীয় রাজা কর্তাভয়াইয়া অর্জুন (যিনি সহস্রার্জুন নামেও পরিচিত ছিলেন)-এর হাতে বন্দী ও কারারুদ্ধ হন। শিবভক্ত রাবণ কারাবন্দী - কারাগারে বসেই রাবণ প্রার্থনা জানান দেবাদিদেবকে। পরশুরাম তখন মহাদেবের কাছে তাঁর অস্ত্র শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। পরশুরাম তার গুরু মহাদেবকে গুরু দক্ষিণা দিতে চাইলে মহাদেব তাকে বললেন, কর্তাভয়াইয়া অর্জুনের কারাগার থেকে রাবণ কে মুক্ত করে দিলেই আর অর্ধেক গুরু দক্ষিনা প্রদান হয়ে যাবে। শিবের ইচ্ছানুসারে পরশুরাম রাবণকে কারা-মুক্ত করেছিলেন।

একবার বিচার করে দেখা দরকার, স্বয়ং শিব, বিষ্ণু-অবতার পরশুরাম রাবণকে কারা মুক্ত করান। কোন পাপী, জঘন্য প্রকৃতির রাক্ষসের জন্যে এটা শিব ও পরশুরাম নিশ্চয় করেননি।

লঙ্কার মহান রাজা রাবণের সমৃদ্ধ জীবন, সাধনা, তপস্যা ও নানাবিধ প্রতিভা ও গুনের বিবরন এতই বিশাল যে এই ক্ষুদ্র পরিসরে তা লেখা সম্ভব নয়। আমাদের অনেকেরই হয়তো জানা নেই, রাবণ জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপরে একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন যার নাম- "রাবণ সংহিতা"। তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও পণ্ডিত ছিলেন। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাবণের পাণ্ডিত্য ও দূরদর্শীতার জন্যে স্বয়ং রামচন্দ্র, রাজ্য পরিচালনা সম্পর্কে রাবণের কাছে উপদেশ প্রার্থনা করেন- রামায়নে এ'কথার উল্লেখ আছে।

আমার মনে হয়, রাবণ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞানচিত ভ্রান্ত-চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে রাবণের যথার্থ মূল্যায়ন করা উচিত।

সাধক - মহাপুরুষ

সনাতন গোস্বামী

শংকর নাথ রায়

(ভারতের সাধক বই থেকে সংকলিত)

নীলাচল হইতে শ্রীচৈতন্য সে-বার নবদ্বীপে আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য, জননীর চরণ দর্শন আর কিছুদিনের জন্য পবিত্র গঙ্গাতীরে বাস। সে কাজ সাঙ্গ হইয়াছে। এবার প্রাণ কঁদিয়া উঠিয়াছে বৃন্দাবনের জন্য। প্রাণগোবিন্দের লীলাভূমিতে গড়াগড়ি দিতে মন হইয়াছে উতল, যমুনায় অবগাহনের লোভও হইয়া উঠিয়াছে দুর্নিবার। প্রভু তাই সাঙ্গোপাঙ্গসহ তাড়াতাড়ি ব্রজের দিকে ছুটিয়া চলিলেন।

কিন্তু একি বিচিত্র কান্ড? ঝাড়খন্ডের পথে না গিয়া তিনি হঠাৎ উত্তরের দিকে বাদশাহ হুসেন শাহের রাজধানী গৌড়ের দিকে চলিলেন কোন? তিনি কি পথ ভুলিলেন? অথবা কি আছে তাহার মনে কে জানে?

কৃষ্ণপ্রেমে প্রভু গর্গর মাতোয়ারা। সঙ্গীদের অন্তরেও লাগিয়াছে এই প্রেমের ঢেউ। নৃত্য কীর্তনে সারা পথটি মুখর হইয়া উঠিয়াছে। আর এই দেবপ্রতিম সন্ন্যাসীর পিছে পিছে চলিয়াছে ভাবাকুল এক বৃহৎ জনতা। চলিতে চলিতে সেদিন প্রভুর এই দলটি আসিয়া উপস্থিত হয় গৌড়ের উপকণ্ঠে, রামকেলীর অনতিদূরে।

রাত্রে প্রভু বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় নিতান্ত দীনবেশে সেখানে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন স্থানীয় দুই কৃতী পুরুষ, দুই সহোদর ভ্রাতা। ধর্ম নিষ্ঠা আর শাস্ত্রজ্ঞানের সহিত ভক্তিপ্রেমের অপরূপ মিলন ঘটিয়াছে তাহাদের জীবনে।

যুক্তকরে, দন্তে তৃণ নিয়া, উভয়ে প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়েন। ভক্তেরা পরিচয় করাইয়া দেন, “প্রভু এঁরা দুভাই গৌড়ের বাদশা হুসেন শাহের প্রধান অমাত্য। বড় ভাই হচ্ছেন অমরদেব। রাজকীয় উপাধি দবীর খাস। আর ছোটভাই সন্তোষদেব, সাকর মল্লিক বলে ইনি সরকারী মহলে পরিচিত। শাস্ত্রবিদ্যা, ধর্মাচরণ ও দানধ্যানের খ্যাতি যেমন এঁদের আছে তেমনি আছে অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও মান-মর্যাদা। কিন্তু সর্বোপরি রয়েছে সত্যকার কৃষ্ণভক্তি।”

প্রভুর চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার দীপ্তি। প্রবীণ ভক্ত অমরদেবকে সস্নেহে টানিয়া তোলেন, আবদ্ধ করেন প্রগাঢ় আলিঙ্গনে। মৃদু মধুর কণ্ঠে কহেন, “তোমার প্রেরিত পত্র আমি যথাসময়ে পেয়েছি তার উত্তরও দিয়েছি। তোমরা দুভাই যে কৃষ্ণ কৃপার মহা অধিকারী! তাইতো তোমাদের দর্শনে ছুটে এলাম। দ্যাখো আমার কৃপাময় কৃষ্ণের কি অপূর্ব লীলা! ব্রজধামে যাবার জন্য বেরিয়েছি, কিন্তু সোজা সেদিকে না গিয়ে অজ্ঞাত আকর্ষণে ছুটে এলাম এই অঞ্চলে। গৌড়ে আসবার আমার কোন প্রয়োজনই নেই। এসে পড়েছি শুধু তোমাদেরই জন্য।”

বৃন্দাবনযাত্রী প্রভুর পথভ্রান্তির মর্ম এবার বুঝা গেল। ভক্তেরা নীরবে দাঁড়াইয়া একে অন্যের মুখ চাহিতে লাগিলেন।

প্রভুর একি অপার অনুগ্রহ, একি অহেতুকী কৃপা! অমরদেব ও সন্তোষদেবের নয়ন বাহিয়া ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রুর ধারা! পরিত্রাতা আজ স্বয়ং অযাচিতভাবে দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত। এযে তাহাদের কল্পনারও অতীত। কান্না আর আর্তিতে উভয়ে ভাঙিয়া পড়েন।

চরণতলে পতিত হইয়া দৈন্যভরে নিবেদন করেন, “প্রভু, কৃপা করে যদি এলেই, এবার তবে এই অধমদের উদ্ধার সাধন করো। তোমার শ্রীচরণের সেবক করে নাও। বিষয়-বিষে এ জীবন হয়ে উঠেছে দুঃসহ।”

দুই ভাইকে আশিস জানাইয়া শ্রীচৈতন্য কহিলেন, “ভয় নেই তোমাদের। অচিরে কৃষ্ণ তোমাদের কৃপা করবেন, তাঁর নিজ কর্মে করবেন নিয়োজিত। তোমাদের যে আমি দেখছি কৃষ্ণের চিহ্নিত সেবকরূপে। আজ থেকে তোমাদের আমি নূতন নামকরণ করলাম। অমর আর সন্তোষ এখন থেকে পরিচিত হবে সনাতন আর রূপ নামে।”

প্রভুর সেদিনকার দর্শন ও স্পর্শ সনাতন ও রূপের জীবনে বিপ্লব ঘটাইয়া দেয়। তাঁহার আন্তরিক আশীর্বাদ হইয়া উঠে অমোঘ। উত্তরকালে দুই ভাই প্রসিদ্ধি লাভ করেন প্রভুর অন্যতম পার্ষদরূপে। সনাতন গোস্বামী নির্মাণ করেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব- ধর্মের সুদৃঢ় শাস্ত্রীয় ভিত্তি, স্থাপন করেন ভক্তিময় তপস্যার বলিষ্ঠ আদর্শ। আর তাহার অনুজ রূপ গোস্বামীর মাধ্যমে সাধিত হয় রাধাকৃষ্ণ লীলা-রসের পরিপুষ্টি ও বিস্তার উদঘাটিত হয় গোপীভজনের নিগূঢ় পদ্ধতি।

সনাতনের পূর্বপুরুষের জন্মভূমি দাক্ষিণাত্যে। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে কর্ণাটদেশের পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন সর্বজ্ঞ জগদগুরু। ইহার বংশধর

রূপেশ্বরদেব এক সময়ে রাজ্যচ্যুত হইয়া গৌড়দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। শাস্ত্রবিদ্যা ও রাজকার্য দুয়েতেই দেখা যাইত এই অভিজাত বংশের সমান পারদর্শিতা। তাছাড়া, দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবীয় সাধনার ধারাও ইহাদের জীবনে কিছুটা বহমান ছিল।

এই বংশের কুমারদেবের গৃহে ভূমিষ্ঠ হন তিন পুত্র---অমর, সন্তোষ ও বল্লভদেব। জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর জন্মগ্রহণ করেন ১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে; ইনিই উত্তরকালে বহু বিশ্রুত বৈষ্ণবসাধক---সনাতন গোস্বামী। বৃন্দাবনের ধর্মজীবনের নিয়ন্তারূপে মহাপ্রতিভাধর ভক্তি-শাস্ত্রবিদরূপে তাঁহার খ্যাতি সারা ভারতে প্রচারিত হয়। আর গৌড়ীয় সাধকসমাজে তিনি গণ্য হন প্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবন-দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকাররূপে।

সনাতনের পিতার নাম মুকুন্দদেব। গৌড় রাজসরকারের এক উচ্চপদে দীর্ঘদিন তিনি নিয়োজিত ছিলেন এবং তাহার বাসস্থান ছিল গৌড়ের উপকণ্ঠাস্থিত রামকেলীতে। ঐ স্থানটি কানাই-নাটশালা নামেও সে সময়ে পরিচিত ছিল। মুকুন্দদেব নিজে ছিলেন ভক্তিমান্ সাধক। পূজা-পার্বণ, কৃষ্ণকীর্তন ও রামলীলার উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রাসাদভবন সদাই থাকিত মুখরিত।

বালক পৌত্রদের লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করিতে মুকুন্দদেব ত্রুটি করেন নাই। সনাতন ও রূপের শিক্ষাদানের ভার পড়ে রামভদ্র বাণীবিলাস নামক পন্ডিতের উপর। প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত হইলে দুই ভ্রাতাকে পাঠানো হয় তখনকার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র নবদ্বীপে। সেখানে কয়েক বৎসরের মধ্যে নানা শাস্ত্রে তাহারা পারঙ্গম হইয়া উঠেন।

প্রথমে শিক্ষাগুরুর পদে ব্রতী হন প্রখ্যাত পন্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম। পরবর্তী কালে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির টোলে থাকিয়া সনাতন ও রূপ শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বাদি অধ্যয়ন করেন। দুজনেই অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী। তাই নবদ্বীপে থাকিতেই তাঁহাদিগকে সাহিত্য, ব্যাকরণ ও বিবিধ ধর্মশাস্ত্রে অসামান্য অধিকার অর্জন করিতে দেখা যায়।

কিন্তু সে যুগে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র অধিগত করিলেই বৈষয়িক জীবনে উন্নতিসাধন করা যাইত না। বাদশাহের দরবারের ভাষা ছিল ফার্সী। এই ফার্সী ভালভাবে আয়ত্ত করিতে না পারিলে কোন দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। পরিবারের কর্তা তাই সনাতন ও রূপের ফার্সী শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা করেন। সপ্তগ্রামে তাঁহাদের পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানকার মুসলমান শাসনকর্তা ফকর উদ্দীন মুকুন্দদেবের বন্ধু। তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া উভয়-ভ্রাতা ফার্সী ও আরবী বিশেষজ্ঞ মোল্লাদের কাছে পাঠ গ্রহণ করিতে থাকেন, অচিরে ঐ ভাষা দুইটি ভালভাবে আয়ত্ত করিয়াও ফেলেন।

ফার্সী ও আরবী সাহিত্যের ব্যুৎপত্তি কিন্তু সনাতন ও রূপের ব্যক্তিগত কৃষ্টি ও ধর্মাচরণকে কোনোদিন ব্যাহত করিতে পারে নাই। রাজ-অমাত্যপদ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, মুসলমান বাদশাহ ও আমীর ওমরাহদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও কম করেন নাই, কিন্তু নিজস্ব ধর্মীয় আচার-আচরণ ও ভাবধারাকে সদাই রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন সতর্কভাবে।

তাঁহাদের রামকেলীর ভবন বরাবরই ছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শাস্ত্রবিদ ও ধর্মাচার্যদের মিলনস্থল। বিশেষ করিয়া শিক্ষক বিদ্রাবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত সনাতনের যোগ ছিল অত্যন্ত বেশী। এই ধর্মনিষ্ঠ আচার্যকে তিনি গুরুর মতোই শ্রদ্ধা করিতেন। পরম সমাদরে প্রায়ই তাহাকে রামকেলীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইত। তাঁহার সহিত শাস্ত্রপাঠ ও ধর্মালোচনায় সনাতন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতেন উত্তরকালে চৈতন্যচরণে আশ্রয় নেবার পর হইতে সনাতনের শাস্ত্রপাঠের আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয় ভক্তিশাস্ত্রের দিকে।

বৃন্দাবনবাসের প্রথম যুগে পরমানন্দ ভট্টাচার্য নামক এক বিশিষ্ট ভক্তিসিদ্ধ আচার্যের কাছেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব হয় তাঁহার অধিগত।

পিতামহ মুকুন্দদেবের লোকান্তরের পর তাঁহারই পদে সনাতন রাজসরকারে নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র আঠার বৎসর। তারপর ধীরে ধীরে নিজের প্রখর ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও কর্মনিষ্ঠার বলে পাঠান রাজ্যের অন্যতম প্রধান অমাত্যের পদে উন্নীত হন।

রাজ্যের প্রতিরক্ষা, শাসন প্রভৃতি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যেই সুলতান হুসেন শাহকে সনাতনের পরামর্শ গ্রহণ করিতে দেখা যাইত। সনাতন ক্রমে বাদশাহের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া উঠেন; তাঁহার অনুজ রূপ এবং অনুপমও তাঁহারই প্রভাবে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হন।

তখনকার দিনে রামকেলীর দেবভ্রাতাদের পদমর্যাদা, প্রভাব ও বিত্ত-বিভবের খ্যাতি ছিল অসাধারণ। তাঁহাদের প্রাসাদের চারিদিকে ছড়ানো ছিল বহুসংখ্যক মন্দির, মন্ডপ ও নাটশালা। খ্যাতনামা হিন্দু বিদ্বজ্জন আচার্য ও সাধু-সন্ন্যাসী মাত্রেই রামকেলীতে সনাতনের সভাকক্ষে পদার্পণ করিতেন, গ্রহণ করিতেন তাঁহার সেবা ও পৃষ্ঠপোষকতা। সনাতন ও তাঁহার ভ্রাতাদের বদান্যতায় দেশের দূর দূরান্তস্থিত শাস্ত্রব্যবসায়ী বহু ব্রাহ্মণ ও দীন দরিদ্র প্রতিপালিত হইত। এই সব কারণে রামকেলীর খ্যাতি ও সনাতনের প্রভাব প্রতিপত্তি সারা গৌড়দেশে ছড়াইয়া পড়ে।

সনাতন ছিলেন হুসেন শাহের দবীর খাস---একান্ত সচিব। তৎকালীন যে কোনো শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত মুসলমানের মতো তিনি ফার্সী ও আরবীতে অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। বিধর্মী সুলতান এবং ওমরাহদের সামাজিক জীবন ও রীতিনীতির অনেক কিছু তাহাকে অনুসরণ করিতে হইত। গৌড় দরবার বা সুলতানের শিবিরে অবস্থান কালে তাহার বেশভূষা ও চালচলন দেখিয়া সাধারণ মানুষ তাহাকে ধরিয়া নিত মুসলমান ভাবাপন্ন বলিয়া। কিন্তু দিনান্তের কার্যশেষে রামকেলীতে গেলেই ফুটিয়া উঠিত তাহার আর এক রূপ। বাদশাহী দরবারের বাহ্য আচার-আচরণ, হাব-ভাব তিনি ত্যাগ করিতেন। স্নান তর্পণের পর শুরু হইত দানধ্যান পূজা-অর্চনা, শাস্ত্রপাঠ ও ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা।

কিন্তু এত দানধ্যান, ধর্মনিষ্ঠা ও দরবারী পদমর্যাদা সত্ত্বেও সনাতনের পরিবারের ভাগ্যে কিন্তু সামাজিক কৌলিন্য জুটে নাই। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের দৃষ্টিতে এই পরিবার ছিল পতিত মুসলমানের ঘনিষ্ঠতা ও স্পর্শদোষের জন্য অবজ্ঞাত। এই জন্যই বঙ্গীয় কায়স্থদের কুলজীতে ইহাদের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বিধর্মী আচার-আচরণদুষ্ট সনাতন এতদিনে পাইয়াছেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের দুর্লভ দর্শন। সারা দেহ ও মনপ্রাণে আসিয়াছে দিব্য আনন্দের জোয়ার। প্রভুর এই দর্শনের পরে নূতন মানুষে তিনি হইয়াছেন রূপান্তরিত।

সনাতনের জীবনের এ পরিবর্তন শুরু হইয়াছে দীর্ঘদিন যাবৎ, অগ্রসর হইয়াছে প্রসন্ন ধারায়। বিত্ত বিষয় ও দরবারী মর্যাদার চাপে যে জীবন চাপা পড়িয়াছিল, আকুল হইয়া এতদিন তাহা কেবলি মাগিতেছিল বন্ধনমুক্তি। এবার সে মুক্তি সমাগত।

বাহ্যজীবনে সনাতন ছিলেন প্রভাবশীল রাজ অমাত্য, আর অন্তরে দৈন্যময়, ত্যাগব্রতী মহাবৈষ্ণব। আন্তর্জীবনে তাই এতদিন ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিয়াছিল অধ্যাত্ম সাধনার পরমসঞ্চয়, একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন ভক্তি ও প্রেমধর্মের আদর্শ। তাঁহার এই গোপন প্রস্তুতিই সেদিন আকর্ষণ করিয়াছিল প্রভু চৈতন্যদেবকে। সুদূর রামকেলীতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনের চিহ্নিত পার্ষদ ও লীলাপরিকর সনাতন ও রূপ এই দুই ভাইকে তিনি অবলীলায় করিয়াছিলেন আত্মসাৎ।

সনাতনের জীবন ছিল বৈষ্ণবীয় সাধনার জন্য উন্মুখ, সদা ভক্তিধূত। তাহার পক্ষে ইহা আকস্মিক কিছু নয়। এ মনোবৃত্তি এবং সাধনধারা তাঁহার পূর্বপুরুষের মধ্যেও বর্তমান ছিল। বংশগত বৈশিষ্ট্যই অপরূপ রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল সাধননিষ্ঠ সনাতনের জীবনে। আর প্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপায় উত্তরকালে তাহা লাভ করিয়াছিল চরম সার্থকতা। হুসেন শাহের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন সনাতন। রাজ্যের জটিল কর্মের দায়িত্বভার তাঁহার উপর ছাড়িয়া দিয়া বাদশাহ নিশ্চিন্ত থাকিতেন। শুধু শান্তির সময়েই নয়, যুদ্ধাভিযানে বাহির হইলেও হুসেন শাহ তাঁহার এই প্রতিভাধর অমাত্যকে সঙ্গে রাখিতেন। কিন্তু এই রাজানুগ্রহ, এই দায়িত্বভার ও মর্যাদা ক্রমে ভারস্বরূপ হইয়া উঠে। বিষয়-কীট হইয়া দিন যাপন করা আর তাহার সহ্য

হইতে চায় না। বাদশাহের সেনাধ্যক্ষেরা সে-বার নির্মমভাবে উড়িষ্যায় দেব-দেবীর মূর্তি ধ্বংস করে। ভক্ত সনাতনের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। শুরু হয় তীব্র অনুতাপের দহন। দিনের পর দিন ভাবিতে থাকেন, একি পাষণ্ডীর জীবন তিনি যাপন করিতেছেন? সদাই অনুসন্ধান করিতে থাকেন উদ্ধারের উপায়।

রামকেলী ও তাহার আশেপাশে সনাতন গড়িয়া তুলিয়াছেন এক অপূর্ব ধর্মীয় পরিবেশ। অজস্র মঠ-মন্দির নির্মিত হইয়াছে, খনন করা হইয়াছে পবিত্র কুন্ড। প্রায়ই তিনি দেশ-দেশান্তর হইতে এখানে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন বিশিষ্ট শাস্ত্রবিদ ও ভক্ত সাধকদের। গৌড় দরবারের কাজ শেষ হইলেই রামকেলীর ভক্তিময় পরিবেশে আসিয়া হৃদয় জ্বালা জুড়াইতে বসেন, সাধন-ভজনে রত হন।

এমনি পরিবেশে বাস করিয়া সনাতনের জীবনে জাগিয়া উঠে ভক্তিপ্রেমের সুপ্ত চেতনা। রামকেলীতে তাহার নিজের তৈরি কৃষ্ণ-লীলাস্থলগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া আহরণ করেন দিব্য আনন্দ।

> বাড়ীর নিকটে অতি নিভৃত স্থানেতে
> কদম্ব কানন ধারা শ্যামকুন্ড তাতে।
> বৃন্দাবনলীলা তথা করয়ে চিন্তন,
> না ধরে ধৈর্য্য নেত্রে ধারা অনুক্ষণ। (ভক্তি রত্নাকর)

অতঃপর তীব্র আর্তি জাগে জীবনে, আর এই আর্তির মধ্য দিয়া নামিয়া আসে কৃষ্ণপ্রেমের রসস্রোত। সংসারের বিত্ত-বিভব, যশ মান, সব কিছু নিরর্থক হইয়া উঠে। আকুলভাবে চিন্তা করিতে থাকেন কোন্ পথে, কাহার নির্দেশে মিলিবে বহুবাঞ্ছিত কৃষ্ণদর্শন ? কবে অপ্রাকৃত লীলারসে অবগাহন করিবেন ? কবে এ জীবন হবে কৃতকৃতার্থ ?

এমনি সময়ে সনাতনের কানে পৌঁছিল প্রভু শ্রীচৈতন্যের কথা। নীলাচলে তাহার অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। প্রেমভক্তির প্রবল রসতরঙ্গে তিনি ভাসাইয়া নিতেছেন অগণিত ভক্ত সাধককে। এই তরঙ্গ সেদিন সনাতনের হৃদয়তটেও আসিয়া আঘাত করে। জাগিয়া উঠে পরম উপলব্ধি---এই প্রভুই যে জীবের উদ্ধারকর্তা। আর ইনি যে তাহারই জীবনপ্রভু।

আকুল আবেদন জানাইয়া সনাতন শ্রীচৈতন্যকে পত্র দিলেন--"প্রভু, তুমি আবির্ভূত হয়েছো জীবের উদ্ধারের জন্য। একটিবার আমার মতো অধমজনের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করো। আমি একে বিষয়-কীট, তদুপরি স্বেচ্ছাচারী---পতিত। আমার মুক্তির কি কোনো উপায় নেই? মনে প্রবল ইচ্ছা জেগেছে, এ ঘৃণ্য সংসারজীবন ত্যাগ করবো। আমায় অনুমতি দাও, তোমার চরণতলে নিজেকে উৎসর্গ করি, আর সারাজীবন কাটিয়া দিই তোমার দিব্য মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করে।"

নীলাচলে অন্তরঙ্গ ভক্তেরা প্রভুকে এই দৈন্যময় পত্র দিলেন। কহিলেন, "গৌড়ের বাদশাহ, দোর্দন্ড-প্রতাপ হুসেন শাহের ইনি প্রধান অমাত্য। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকুশলতার দিক দিয়ে এঁর জুড়ি নেই। এমন মানুষও তোমার নর্তনে কীর্তনে পাগল হয়ে উঠেছে; রাজৈশ্বর্য ছেড়ে দিয়ে ভিখারী। হতে চাচ্ছে--এ তো তোমার অলৌকিক কৃপালীলা ছাড়া আর কিছু নয় প্রভু।"

প্রভুর অধরে মৃদু মধুর হাসি দেখা দেয়। বার্তাবহের হস্তে তখনি তিনি এক পত্র প্রেরণ করেন। এ পত্রে আর কোনো কথা নাই, আছে শুধু একটি মাত্র শ্লোকের উদ্ধৃতি---

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু। তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ রসায়নং॥

অর্থাৎ, পরপুরুষে আসক্তা কোনো নারী যেমন গৃহকর্মে থেকেও প্রেমিকের স্মৃতি সদাই ধরে রাখতে পারে, তেমনি বিষয়ে লিপ্ত থেকেও চিত্তকে ডুবিয়ে রাখা যায় তাঁর প্রেম-রসে।

সনাতন মহাপন্ডিত ব্যক্তি, সর্ব দর্শন ও অধ্যাত্মতত্ত্বে পারঙ্গম। তাই প্রভু তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া স্বামী বিদ্যারণ্যের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ পঞ্চদশী হইতে ঐ শ্লোকটি লিখিয়া পাঠান।

প্রভুর এই শ্লোকপত্রের ইঙ্গিত পরিষ্কার। সনাতন বুঝিলেন, মিলনলগ্ন এখনো উপস্থিত হয় নই, তাই প্রভু তাঁহার সানুনয় অনুরোধ কৌশলে এড়াইয়া গেলেন। হৃদয়ের আগুন চাপিয়া রাখিয়া এখনো কিছুদিন তাহাকে সংসারে বাস করিতে হইবে।

প্রভুর কাছ হইতে ঐ পত্র পাইবার পর হইতে সনাতনের ব্যাকুলতা আরো বাড়িয়ে যায়। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয় করুণ আর্তি ও কান্নায়। অবশেষে এই সেদিন রামকেলীতে বসিয়া প্রভুর কৃপা মিলিল। সুদূর পুরীধাম হইতে ছুটিয়া আসিয়া নিজে যাচিয়া সনাতনকে তিনি দর্শন দিলেন। সংসার ত্যাগের অনুমতি সেদিন না মিলিলেও তাঁহার প্রেমস্পর্শ ও আশ্বাসবাণী প্রাপ্ত হইয়া সনাতনের তাপিত হৃদয় কতকটা শান্ত হইল।

সনাতন ও রূপের নিকট বিদায় নেওয়া হইয়াছে, শ্রীচৈতন্য এবার বৃন্দাবনের দিকে রওনা হইবেন। তাহার নয়নাভিরাম রূপ নর্তন-কীর্তন ও ভাবাবেশে এই কদিনের মধ্যেই সমগ্র অঞ্চলে আনিয়া দিয়াছে প্রাণচাঞ্চল্য। অগণিত নরনারী ভিড় করিয়াছে এই পুণ্যদর্শন দেব-মানবের আশে-পাশে। তাহাদের অনেকে প্রভুর সঙ্গী হইতে ব্যগ্র। সনাতন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী; ব্যাপার দেখিয়া তিনি প্রমাদ গণিলেন। উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তখন রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপ্টা চলিতেছে। এ সময়ে এত লোক সঙ্গে নিয়া চলিলে প্রভুর বিপদ হইতে পারে।

করজোড়ে তিনি নিবেদন করেন, "প্রভু, বৃন্দাবনেই যদি যাবে এত লোক কেন সঙ্গে নিচ্ছো? আজকাল রাজা বাদশাদের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ চলছে চারদিকে। এ সময়ে জনসজ্জাট নিয়ে চলা মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না। তাছাড়া প্রভু, বৃন্দাবনে তো একান্তে কাঙাল বেশেই যেতে হয়।"

প্রবীণ রাজ-অমাত্য সনাতনের কথাগুলি যুক্তিযুক্ত। আবার ভক্তবৃন্দকে সঙ্গচ্যুত এবং নিরাশ করিতেও প্রভুর মন সায় দেয় না। অগত্যা বৃন্দাবন-যাত্রা ত্যাগ করিয়া রওনা হইলেন শান্তিপুর অভিমুখে। সনাতন হাঁফ-ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

প্রভুর রামকেলীতে আগমন ও দর্শনদান যেন সনাতন ও রূপের নবজন্মের উন্মেষ! তাহার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে উভয়ের জীবনে আসিয়াছে কৃষ্ণপ্রেমের নূতন জোয়ার। এই জোয়ারের উচ্ছ্বাসে তাহারা এবার ভাসিয়া চলিলেন।

অনতিবিলম্বে রামকেলীর প্রাসাদে বিশিষ্ট একজন শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব সাধককে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইল। সনাতন ও রূপ তাঁহার সাহায্যে ভক্তিভরে কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণ করিলেন। রাজকর্ম এখন তাহাদের কাছে দুর্বহ ভারস্বরূপ। যত তাড়াতাড়ি ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল। উভয় ভ্রাতার মধ্যে সেদিন গভীর রাত অবধি গোপন পরামর্শ চলে। সিদ্ধান্ত স্থির হয়, রূপ আগে গৃহত্যাগ করিবেন, আর সনাতন বহির্গত হইবেন কিছুদিন পরে।

সনাতনের উপর বাদশাহের বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজ ন্যস্ত রহিয়াছে, তিনি অকস্মাৎ এখনি পদত্যাগ করিলে সারা দেশে চাঞ্চল্য পড়িয়া যাইবে, রাজকার্যে দেখা দিবে নানা বিশৃঙ্খলা। কাজেই তাহার নিষ্ক্রমণ সঙ্গত নয়। রাজকীয় দায়িত্বের বোঝা কিছুটা হালকা করিয়া তবেই তিনি সুযোগমতো একদিন সরিয়া পড়িবেন।

সনাতন ও রূপের আশ্রিত ব্রাহ্মণ পন্ডিত ও সাধু-সজ্জনদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ইহাদের এবং আত্মীয়স্বজনদের ভরণ-পোষণের মোটামুটি ব্যবস্থার জন্য রূপ তখনই তৎপর হইলেন। অল্পদিনের মধ্যে একাজ সম্পন্ন হইয়া গেল এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রূপ চিরতরে করিলেন গৃহত্যাগ। যাওয়ার আগে তিনি বিশ্বস্ত এক মুদির কাছে দশ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিয়া গেলেন। কথা রহিল জরুরী প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সনাতন এই অর্থ তাঁহার কাজে লাগাইবেন।

রূপের নিষ্ক্রমণের পর সনাতন আরো নিঃসঙ্গ হইয়া পড়েন। বিষয়বিতৃষ্ণা চরমে উঠে। ক্রমে দরবারে যাতায়াতও বন্ধ হইয়া যায়। বাদশাহকে খবর পাঠান তিনি অত্যন্ত পীড়িত, এখন হইতে স্বাভাবিকভাবে রাজসেবা সম্পন্ন করা তাহার পক্ষে আর সম্ভব হইবে না।

হুসেন শাহ বড় সন্দিগ্ধ হইয়া উঠেন। রূপ ইতিমধ্যে কাজকর্ম ছাড়িয়া কোথায় উধাও হইয়াছেন। দবীর খাসও তেমনি কোনো মতলব আঁটে নাই তো? রাজ্যের চারিদিকে যুদ্ধবিগ্রহের মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে, ঠিক এসময়ে তাঁহার মতো একজন বিশ্বস্ত ও কুশলী অমাত্য কর্মত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকিলে যে মহাবিপদের কথা।

রাজবৈদ্য প্রেরিত হইল সনাতনকে পরীক্ষা করার জন্য। বৈদ্য ফিরিয়া আসিলেন, মুচকি হাসিয়া জানাইলেন, "দবীর খাস শারীরিক বেশ সুস্থই আছেন, তার জন্য জাহাঁপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।"

হুসেন শাহ্ তো চটিয়া আগুন। পরদিনই তিনি অতর্কিতে সনাতনের রামকেলী প্রাসাদে স্বয়ং উপস্থিত হন। দেখেন, দবীর খাসের দেহে রোগের চিহ্নমাত্র নাই, সাধু সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রবিদদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া পরমানন্দে তিনি ধর্মালোচনায় নিরত।

বাদশাহ তাহাকে কার্যে যোগদানের জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। অবশেষে ভীতি প্রদর্শন করিতেও ছাড়িলেন না্ কিন্তু সনাতন তাহার সঙ্কল্পে একবারে অটল। গৌড়েশ্বরের বদলে পরমেশ্বরের আসন স্থাপিত হইয়াছে তাহার জীবনে, কোনো চাওয়া-পাওয়ার প্রয়োজনই যে আজ আর তাহার নাই। দৃঢ়স্বরে স্পষ্ট ভাষায় তিনি হুসেন শাহকে কহিলেন, "জাহাঁপনা, সত্য কথা বলতে কি, দরবারের কাজে আমি যোগদান করবো না বলেই স্থির করেছি। এখন থেকে আমি কেবলমাত্র শ্রীভগবানের দাস, আর কারুর নই। আমার এ সঙ্কল্প অপরিবর্তনীয়। আমায় আপনি মার্জনা করুন।" ক্রুদ্ধ হইয়া সুলতান তখনি সনাতনকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যে দেখা দিল এক জরুরী পরিস্থিতি। হুসেন শাহের সেনাপতি ইতিপূর্বে উড়িষ্যার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এবার তিনি নিজেই সসৈন্যে রাজা প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে চাহেন। প্রয়োজনীয় সকল কিছু ব্যবস্থা প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এসময়ে সনাতনের মতো তীক্ষ্ণধী ও বিচক্ষণ অমাত্যের সাহায্য যে তাহার পক্ষে অপরিহার্য!

কারাগৃহ হইতে ডাকিয়া আনিয়া বার বার সনাতনকে বুঝাইতে লাগিলেন, "দবীর খাস, এখনো তুমি তোমার পাগলামি ছাড়ো। আবার নিজের দায়িত্বপূর্ণ কাজে এসে যোগ দাও। আমার অনুরোধ শোন, আমার সঙ্গে তুমি উড়িষ্যা অভিযানে চল।"

সনাতন চরম কথা শুনাইয়া দিলেন, আপনার অভিযানের দৃশ্য আমি মানসপটে চমৎকার দেখতে পাচ্ছি, জাহাঁপনা। আপনার সেনাবহিনী সারা পথের দেবমন্দির ধ্বংস করবে, আর পবিত্র বিগ্রহ করবে কলুষিত। না-কোনোমতে আমি আপনার পাপকার্যের সঙ্গী হতে পারবো না।"

অমাত্যকে তখনি আবার কারাগারে প্রেরণ করিয়া হুসেন শাহ্ যুদ্ধ-অভিযান শুরু করিলেন। সনাতনের এখন একমাত্র লক্ষ্য কি করিয়া তিনি মুক্তি লাভ করিবেন, মিলিত হইবেন প্রাণপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে।

হঠাৎ সেদিন রূপের প্রেরিত এক পত্র গোপন পথে তাঁহার নিকট পৌঁছিল। তাহাতে নির্দেশ দেওয়া আছে-স্থানীয় মুদির কাছে যে টাকা গচ্ছিত আছে, তাহা হইতে সনাতন যেন এই পত্র দেখাইয়া, সাত হাজার টাকা গ্রহণ করেন এবং উহা দ্বারা ক্রয় করেন নিজের মুক্তি।

প্রভুর সহিত মিলনের জন্য সনাতন উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন। তাই উপায়ান্তর অভাবে কারামুক্তির জন্য সেদিন রূপের প্রস্তাবিত পথই তাহাকে বাছিয়া নিতে হইল। রক্ষীকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

শ্রীচৈতন্য এসময়ে বৃন্দাবনের পথে বারাণসীতে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। সনাতন আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া ধাবিত হইলেন পশ্চিম ভারতের দিকে। সঙ্গে চলিল বহু দিনের বিশ্বস্ত ও পুরাতন ভৃত্য, ঈশান। মুক্তির অমোঘ আহ্বান আসিয়া গিয়াছে সনাতনের জীবনে। এই মুক্তির জন্য চরমতম মূল্য দিতে তিনি আজ প্রস্তুত। ধন মান রাজসম্পদ সব কিছু অবলীলায় ত্যাগ করিয়া, নিষ্কিঞ্চন মুমুক্ষু সাধক ত্রস্তপদে ছুটিয়া চলিলেন।

সুলতানের রক্ষীরা তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারে এ আশঙ্কা যথেষ্টই রহিয়াছে। তাই পথ চলিতে লাগিলেন দীন দরিদ্র দরবেশের ছদ্মবেশে। পথ চলিতে চলিতে সেদিন এক ক্ষুদ্র ভুঁইয়ার অধিকারে তাঁহারা আসিয়া পড়িয়াছেন। কোনো পরিচয় নাই, কিন্তু সাক্ষাৎ মাত্রেই ভুঁইয়া তাঁহাদের মহাসমাদর শুরু করিয়া দিল, যেন সে কত দিনের বান্ধব:

এই আতিশয্য দেখিয়া সনাতন কিন্তু সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। এই শ্রেণীর ভুঁইয়াদের কুকীর্তির কথা আগেই কিছু কিছু তাঁহার শোনা ছিল। ইহারা বিদেশী পর্যটকদের আশ্রয় দেয়, প্রচুর আদর-যত্ন করে, তারপর রাত্রিযোগে সুযোগমতো যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া করে হত্যা। সনাতনের নিজের জন্য কোনো চিন্তা নাই। তিনি তো কপর্দকহীন। কিন্তু ঈশান? সে তো অর্থাদি লুকাইয়া রাখে নাই?

চাপে পড়িয়া ঈশান স্বীকার করিল - সাতটি মোহর সে সংগোপনে নিজের কাছে রাখিয়াছে। প্রয়োজন হইলে সনাতন বা তাঁহার নিজের কাজে এগুলি ব্যবহার করা হইবে ইহাই ছিল উদ্দেশ্য।

সনাতন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, কঠোর ভাষায় ভৃত্যকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে, বৈরাগ্যসাধন নিয়ে আমি পথে বেরিয়েছি। আর তুমি আমার সেই সাধনার পথে সৃষ্টি করেছো এমনিতর বিঘ্ন! ছি-ছি! তখনি ভুঁইয়া সমীপে গিয়া কহিলেন, "আমার সঙ্গীর কাছে সাতটি সঞ্চিত মোহর রয়েছে। এগুলো আপনি গ্রহণ করুন, আর আমাদের নিরাপদে পার ক'রে দিন সামনের ঐ দুর্গম পাহাড়।"

সনাতনের সততায় ও সত্যভাষণে অর্থগৃধ্নু ভুঁইয়া খুব খুশী। তখনি সে নিজে সঙ্গে করিয়া অতিথিদ্বয়কে সেখানকার বিপজ্জনক অঞ্চল পার করিয়া দিল।

ভুঁইয়া প্রস্থান করিলে ঈশান কথাপ্রসঙ্গে কহিল, "হুজুর, একটা কথা আপনার কাছে গোপন ক'রে আমি আরো অপরাধী হয়েছি। আমার কাছে আসলে আটটি মোহর ছিল। ভুঁইয়াকে সাত মোহর দিয়ে দেবার পর আর একটি মোহর অবশিষ্ট রয়েছে। মিথ্যা বলার জন্য আপনার কাছে আমি মাফ চাইছি।"

সনাতনের আনন মুহূর্তে কঠোর হইয়া উঠে। দৃঢ়স্বরে কহেন, "ঈশান, আমার অনুসরণ করা তো তোমার ঠিক হবে না। এখনো অর্থের ওপর তোমার প্রবল আকর্ষণ রয়েছে। অর্থের উপর নির্ভর করেই তুমি চলতে চাও। আর আমি নিয়েছি বৈরাগ্য সাধনের কঠিন পথ; একান্তভাবে নির্ভর করতে চাই ভগবানের উপর। নিষ্কিঞ্চন হয়ে জীবন যাপন না করলে আমি আমার ব্রত থেকে চ্যুত হবো। তুমি এখনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাও।" মনিবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ঈশান সাশ্রুনয়নে রামকেলীতে প্রত্যাবর্তন করিল।

দ্রুতপদে পথ চলিতে চলিতে সনাতন সেদিন শোনপুরে আসিয়া উপস্থিত। সেখানে তখন হরিহরছত্রের মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। হঠাৎ মেলাক্ষেত্রে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সঙ্গে। সনাতনের কৃপায় শ্রীকান্ত রাজ সরকারের দায়িত্বপূর্ন পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ছত্রের মেলায় তিনি আসিয়াছেন সুলতানের জন্য কয়েকলাখ টাকার ঘোড়া কিনিতে।

বহু অনুনয়-বিনয়েও শ্রীকান্ত সনাতনকে তাঁহার বৈরাগ্যের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না। শেষটায় ধরিয়া বসিলেন, "বেশ, যদি ঘর ছেড়ে যেতেই হয়, ভিখারীর বেশে যেতে দেবো না। অনুমতি দিন, আমি আপনাকে কিছু নূতন পরিচ্ছদ কিনে দিই।"

সনাতন দৃঢ়স্বরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অগত্যা শ্রীকান্ত ধরিয়া বসিলেন, "এখন তো প্রচন্ড শীত পড়েছে পশ্চিমে। একখন্ড ভোটকম্বল আপনাকে নিতেই হবে, নতুবা পথে যে কষ্টের অবধি থাকবে না।" ভগিনীপতির নির্বন্ধাতিশয্যে সনাতনকে ঐ কম্বলটি গ্রহণ করিতে হইল। সেটি কাঁধে ফেলিয়া আবার তিনি শুরু করিলেন পদযাত্রা। কয়েকদিন অবিরাম পথ চলার পর উপনীত হইলেন বারাণসীধামে।

বারাণসীতে পৌঁছিয়াই যে সংবাদটি সনাতন শুনিলেন, তাঁহাতে তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। প্রাণপ্রভু শ্রীচৈতন্য কিছুদিন যাবৎ এখানেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার নর্তন-কীর্তনে কাশীর ভক্তসমাজে এক প্রচন্ড সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। চন্দ্রশেখর মিশ্রের গৃহে প্রভু তখন অবস্থান করিতেছেন। দীনবেশে যুক্তকরে সনাতন মিশ্রের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহের অভ্যন্তরে বসিয়া প্রভু ভক্তদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। হঠাৎ চন্দ্রশেখর মিশ্রকে কহিলেন, "মিশ্র, আজ বড় শুভদিন। বাইরে গিয়ে দ্যাখো, তোমার দ্বারে সমাগত হয়েছেন এক মহাবৈষ্ণব। এখনি পরম সমাদরে তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

ভক্তেরা ত্রস্তেব্যস্তে বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু কই, কোনো বৈষ্ণব মূর্তি তো সেখানে নাই? দুয়ারে দন্ডায়মান ছিন্নবাস পরিহিত এক দরবেশ। কণ্ঠিমালা তিলক বা বৈরাগীর উত্তরীয় কোনো কিছুই তাঁহার নাই। প্রভু অপর কাহারো কথা বলেন নাই তো! কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর চন্দ্রশেখর মিশ্র দরবেশ-বেশী সনাতনকে বাড়ির ভিতরে নিয়া গেলেন।

প্রভুর দর্শন পাওয়া মাত্র সনাতনের ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। প্রাণপ্রিয় ভক্তের আগমনে প্রভুর আনন্দের আর অবধি নাই। ভাবাবেগে সারা দেহ কম্পিত হইতেছে, নয়নে বহিতেছে পুলকাশ্রু। ভূলুণ্ঠিত সনাতনকে সযত্নে তুলিয়া ধরিয়া তখনি আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন।

দৈন্যভরে সনাতন সরিয়া দাঁড়ান। কাতর স্বরে কহেন, "প্রভু, আমি অতি নীচ, হীনাচারী, তোমার দেবদুর্লভ অঙ্গ দিয়ে আমায় এভাবে আর স্পর্শ ক'রো না।"

চিহ্নিত লীলা-পার্ষদ এতদিন পরে আজ প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। এ আনন্দ রাখার তাঁহার যে ঠাঁই নাই। প্রেমাবেগে বার বার সনাতনকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন-

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্মা পবিত্রিতে।
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মান্ড শোধিতে।

অতঃপর প্রেমাদ্রকণ্ঠে সকলের কাছে সনাতনের নিগূঢ় পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন, তাঁহার ত্যাগ তিতিক্ষা ও বৈরাগ্য সাধনের প্রশস্তি গাহিতে লাগিলেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে।

মধ্যাহ্ন সমাগত। প্রভু কহিলেন, "সনাতন, বেলা অনেক হয়েছে। এবার তাড়াতাড়ি পতিতপাবনী গঙ্গার পুণ্যধারায় স্নান তর্পণ সমাপন ক'রে এসো। তারপর ভিক্ষা গ্রহণ করো।"

মিশ্রগৃহ হইতে একখন্ড পুরাতন বস্ত্র সনাতন চাহিয়া নিলেন। উহা দ্বিখন্ডিত করিয়া তৈরি করিলেন নিজের কৌপীন ও বহির্বাস।

স্নানের ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিতেই এক মারাঠী ব্রাহ্মণ সনাতনকে তাঁহার গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ জানাইলেন।
কিন্তু সনাতন তাঁহাতে সম্মত নন। কৃচ্ছ্রব্রত ও কাঙালের জীবনকেই যে তিনি পরম পথের প্রস্তুতি হিসেবে আজ প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন। সারা জীবন কাটিয়াছে বাদশাহী দরবারের ভোগ-বিলাস ও ঐশ্বর্যের চাকচিক্যের মাঝখানে। তাইতো বৈষয়িকতার সূক্ষ্মতম অঙ্কুরটিকে নিঃশেষে দগ্ধ না করা অবধি তাঁহার স্বস্তি নাই। চরম বৈরাগ্যের মধ্য দিয়া পৌঁছিবেন কৃষ্ণ-অনুরাগের মহাসমুদ্রে, ইহাই যে তাঁহার অভীপ্সা।
যুক্তকরে সনাতন নিবেদন করিলেন, "আপনারা আশীর্বাদ করুন, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব হয়ে গৃহে গৃহে মাধুকরী করেই যেন আমি দিনাতিপাত করতে পারি।"

ভোটকম্বলটি স্কন্ধে নিয়া, ভিক্ষার ঝুলি হস্তে সনাতন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবার বাহির হইবেন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিতে।
প্রভু তো মহা উল্লসিত, বার বার গদ্‌গদ কণ্ঠে সাবাইকে কহিতে লাগিলেন, "দ্যাখো, দ্যাখো, সনাতনের কি অপূর্ব বৈরাগ্যসাধন।"
প্রভু আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন বটে, কিন্তু এই সঙ্গে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ঘন ঘন চাহিতেছেন সনাতনের স্কন্ধস্থিত ভোটকম্বলটির দিকে।
তাঁহার এ দৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য বুঝিতে সনাতনের দেরি হয় নাই। মুহূর্তে নিজ সিদ্ধান্ত তিনি স্থির করিয়া ফেলেন, ছুটিয়া যান গঙ্গাতীরে। দীন দরিদ্র এক বৃদ্ধ নিকটস্থ ঘাটে বসিয়া তাঁহার জীর্ণ কাঁথাটি রৌদ্রে শুষ্ক করিতেছে। সনাতন তাহারই শরণ নিলেন। মিনতি করিয়া কহিলেন, "ভাই, তুমি দয়া ক'রে আমার একটা উপকার করো। আমার এই নূতন কম্বলটির বদলে তোমার ঐ ছেঁড়া কাঁথাখানি আমায় দাও। এজন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকবো তোমার কাছে।"

সংশয় ও সন্দেহে বৃদ্ধের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠে। নূতন ভোটকম্বলের বদলে এই অব্যবহার্য কাঁথা? এ আবার কি অদ্ভুত প্রস্তাব? এ অচেনা বৈরাগীর মনে কোনো অভিসন্ধি নাই তো? না কি এ তাহার পরিহাস!
বহুক্ষণ নানাভাবে বুঝাইয়া সনাতন লোকটিকে রাজী করান। তারপর মহাপ্রসন্ন মনে জীর্ণ কাঁথা গায়ে জড়াইয়া ফিরিয়া আসেন প্রভুর সমীপে। প্রভুর চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে অপার আনন্দের দীপ্তি। বিস্ময়ের ভান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "একি সনাতন! তোমার সেই ভোটকম্বলটি কোথ ায় হারিয়ে এলে?"

কম্বল বর্জনের কাহিনী শুনিয়া প্রভু আনন্দে ডগমগ। এই তো চাই। তাঁহার সনাতন যে লোকগুরু হওয়ার জন্য আবির্ভূত। যে ভক্তি সাম্রাজ্যের পত্তন প্রভু করিতেছেন তিনি যে তাঁহার অন্যতম নিয়ামকরূপে আগে হইতেই চিহ্নিত হইয়া আছেন। তাই তো লোকশিক্ষার জন্য সনাতনের জীবনে প্রকটিত হওয়া প্রয়োজন ত্যাগ বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা:-

প্রভু কহে ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয় রোগ খন্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার।
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ
রোগ খন্ডিত সদ্বৈদ্য না রাখে বিষয় রোগ।

হুসেন শাহের প্রাক্তন প্রধান অমাত্যের, এই সর্বত্যাগী মহাবৈরাগী রূপটি প্রভু শ্রীচৈতন্য সেদিন ইচ্ছা করিয়াই সর্বজন সমক্ষে প্রকটিত করিলেন। বৈষ্ণব সাধক-সামাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন কৃচ্ছ্রবরণ ও দৈন্যময়তার এক কালজয়ী আলেখ্য।

বারাণসীতে প্রভুর কাছে সনাতন এ সময়ে কিছুদিন অবস্থান করেন। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রাখিয়া প্রভু তাঁহার এই চিহ্নিত পর্ষদকে অনুপ্রাণিত করেন নিজ প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় সাধনায়। সাধ্য-সাধনার তত্ত্ব নিরূপণে দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়। সনাতন প্রকৃত জিজ্ঞাসু মহাপ্রতিভাধর সর্বোপরি প্রভুর চরণে সমর্পিত-প্রাণ। পরমোৎসাহে একের পর এক তিনি প্রশ্ন করিয়া চলেন, আর প্রভু প্রসন্নোজ্জ্বল মুখে উত্তর দিতে থাকেন। কিছুদিন আগে গোদাবরী-তীরে প্রভু ও রামানন্দের সংলাপের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নির্যাস ব্রজরসতত্ত্ব। আর আজ বারাণসীর গঙ্গাতীরে প্রভু ও সনাতনের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া উদঘাটিত হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনার ক্রম ও নিগূঢ় তত্ত্ব। প্রভুর ব্যাখ্যাত এই তত্ত্বের সংবাহকরূপে সনাতন উত্তরকালে ব্রজমন্ডলের বৈষ্ণবসমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।
একে একে প্রভু বিবৃত করিলেন কৃষ্ণ অবতার ও বৃন্দাবনলীলার মর্মকথ া। প্রকাশ করিলেন যুগলভজনের অপূর্ব পদ্ধতি। প্রথমে শ্রীমুখের বাণী শুনাইয়াই প্রভু সনাতনকে কৃতার্থ করিলেন। তারপর পরম কৃপাভরে তাঁহার মধ্যে করিলেন শক্তিসঞ্চার। সনাতনের শিরে পদ্মহস্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন, "সনাতন, আজ দেববাঞ্ছিত যে সব তত্ত্ব তুমি শ্রবণ করলে, আশীর্বাদ করি, অচিরে তা তোমার ভেতর স্ফুরিত হয়ে উঠুক।"
ইতিপূর্বে রূপকেও প্রভু এমনি কৃপা করিয়াছেন। শক্তি সঞ্চার করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন বৃন্দাবনধামে। এবার সনাতনকে সেখানে প্রেরণ করিলেন বিরাট দায়িত্বের ভার দিয়া। নির্দেশ দিলেন-

তুমি করিহ ভক্তিরসের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তি স্মৃতি শাস্ত্র করি করহ প্রচার।

আরো কহিলেন, “সনাতন, এর পর থেকে আমার কন্থা করঙ্গধারী কাঙাল বৈষ্ণবেরা দলে দলে ব্রজমন্ডলে গিয়ে আশ্রয় নেবে। তুমি তাদের উপর দৃষ্টি রেখো, রক্ষণাবেক্ষণ ক'রো।

প্রভুর এই আদেশ সনাতন নিষ্ঠাভরে পালন করিয়াছিলেন। প্রভুর ব্যাখ্যাত তত্ত্বের ধারক ও বাহকরূপে উত্তরকালে ব্রজমন্ডলেই তিনি স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন এবং অচিরকাল মধ্যে সেখানকার বৈষ্ণবসমাজের মুখপাত্ররূপে চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াই প্রবীণ ভক্ত সুবুদ্ধি রায়, লোকনাথ গোস্বামী ও ভূগর্ভ পন্ডিতের সহিত সনাতন সাক্ষাৎ করিলেন। দৈন্যভরে তাঁহাদের চরণে দন্ডবৎ করার পর আশ্রয় নিলেন যমুনা-পুলিনের আদিত্যটিলায়।

স্থানটি ঘন অরণ্যময়। এখানকার নির্জন সুগম্ভীর পরিবেশ ধ্যানভজনের বড় অনুকূল। নির্বিঘ্ন সাধক সনাতনের এ জায়গাটি বড় ভাল লাগিল। এখানে বসিয়া একান্ত নিষ্ঠায় তিনি সাধনভজন শুরু করিয়া দিলেন।

সনাতনের এই সময়কার ত্যাগ-বৈরাগ্যময়, ভজননিষ্ঠ জীবনের চিত্র ‘ভক্ত পদাবলী’ হইতে পাওয়া যায়-

কভু কান্দে কভু হাসে কভু প্রেমানন্দে ভাসে
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাঁথা, নেড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা
পরিধানে ছেঁড়া বহির্বাস।
কখনও বনের শাক অলবণে করি পাক
মুখে দেয় দুই এক গ্রাস!

মাঝে মাঝে ভজনতন্ময় সাধকের স্বাভাবিক অবস্থা যখন ফিরিয়া আসে, ঝুলি কাঁধে পদব্রজে মথুরায় চলিয়া যান। যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা সেখানে মিলে, তাহাতেই হয় উদরপূর্তি।

কিছুদিনের মধ্যেই প্রভুর নির্দেশ মতো সনাতন লুপ্ততীর্থ উদ্ধারে ব্রতী হন। আগে হইতেই লোকনাথ গোস্বামী এ কাজ কিছুটা শুরু করিয়াছেন। সনাতন তাঁহার সহিত নিজের প্রচষ্টা যুক্ত করিলেন। যে সব প্রাচীন গ্রন্থে ব্রজমাহাত্য বর্ণিত আছে সেগুলি ঢুঁড়িয়া লুপ্ত তীর্থের সন্ধান বাহির করা এখন হইতে হয় তাঁহার এক বড় কাজ। এই উদ্দেশ্য নিয়া দিনের পর দিন তিনি অরণ্যে পর্বতে ঘুরিয়া বেড়ান। শাস্ত্র মহাজনবাক্য ও লোকগাথার ভিত্তিতে রাধাকৃষ্ণের এক একটি লীলাতীর্থ উদ্ধার করেন, আর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া স্থানীয় জনগণকে নিয়া মত্ত হন কীর্তনানন্দে।

বৎসরখানেক বৃন্দাবনে অতিবাহিত করার পর প্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্য সনাতনের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। তাছাড়া, প্রভু তাঁহাকে একবার নীলাচলে ঘুরিয়া আসিতেও বলিয়াছিলেন। তাই হঠাৎ একদিন ঝুলি কাঁধে নিয়া উড়িষ্যার পথে ধাবিত হইলেন।

ঝাড়খন্ডের মধ্য দিয়া সনাতন তিন রাত পথ চলিতেছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, দেহে তাঁহার বিষাক্ত কন্ডু রোগের আক্রমণ ঘটিয়াছে। নিবিঘ্ন সন্ন্যাসী মনে মনে ভাবিতে থকেন, ‘এই দুষ্ট রোগের দুর্ভোগ যে আমার অবশ্য প্রাপ্য। দবীর খাস জীবনে ম্লেচ্ছ সুলতানের অধীনে থাকিয়া যে সব অন্যায়-অনাচার করেছি, এ যে তারই অনিবার্য পরিণতি।’ সঙ্গে সঙ্গে নিজ সঙ্কল্প স্থির করিয়া ফেলিলেন, ঘৃণ্য রোগে আক্রান্ত এই দেহভার আর শুধু শুধু বহন করিয়া বেড়াইবেন না। পুরীধামে পৌঁছিয়া শ্রীজগন্নাথ ও প্রভু শ্রীচৈতন্যের চন্দ্রবদন দর্শন করিবেন, তারপর রথচক্রতলে করিবেন প্রাণ বিসর্জন।

ধামে পৌঁছিয়াই সনাতন উপস্থিত হইলেন হরিদাসের ভজন কুটিরে। হরিদাস নিজেকে মনে করেন যবন, পতিত, দীনাতিদীন। তাই শ্রীজগন্নাথের সেবক ও চৈতন্য প্রভুর ভক্তদের স্পর্শ এড়াইয়া নগরের এক প্রান্তে নিজের পর্ণকুটির রচনা করিয়াছেন। সনাতনের মনেও এমনি দৈন্যভাব; নিজেকে মনে করেন আচারভ্রষ্ট ও অপবিত্র। তাই হরিদাসের কুটিরই যে তাঁহার আশ্রয়স্থল। জপসিদ্ধ হরিদাস আর ত্যাগনিষ্ঠ, শাস্ত্রবিদ সাধক সনাতন, এই দুয়ের মিলনে বিজন টোটা-মধ্যস্থ কুটির সরগরম হইয়া উঠে।

প্রভুর নিত্যকার এক কাজ ছিল পরম ভক্ত হরিদাসকে দর্শন দান। জগন্নাথের উপল ভোগের পর তিনি সঙ্গোপাঙ্গ সহ এই কুটিরে উপস্থিত হইতেন, দীর্ঘ সময় কাটাইয়া গৃহে ফিরিতেন।

সেদিন চৈতন্য প্রভু টোটায় পদার্পণ করামাত্র সনাতন দৈন্যভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বাহু প্রসারিয়া প্রভু যতই আলিঙ্গন করিতে যান সনাতন ততই পিছু হঠেন। কাতর স্বরে বলেন, “প্রভু কৃপা করো, আমার মিনতি রাখো। এমন ক'রে তোমার দেবদুর্লভ দেহ দিয়ে আমায় স্পর্শ করো না। আমি অতি হীন, ভ্রষ্টাচারী। তদুপরি সারা অঙ্গে রয়েছে কন্ডুর ঘৃণ্য ক্লেদ। দোহাই তোমার, এই ক্লেদ তোমার গায়ে মেখে আমায় আর পাপের ভাগী ক'রো না।”

কিন্তু প্রভুকে রোধ করিবে এমন সাধ্য কার? আনন্দের আবেশে বার বার প্রিয় পার্ষদকে বুকে জড়াইয়া ধরেন, কন্ডুরস তাঁহার সারা শরীরে লিপ্ত হয়। আর সনাতন কেবলি জ্বলিতে থাকেন অনুতাপের তীব্র দহনে।

সনাতনের আত্মগ্লানি কেবলি বাড়িতে থাকে। ভাবেন-কৃষ্ণ তাঁহাকে একি বিপদে ফেলিলেন! রোজই প্রভু তাঁহাকে এমনিভাবে প্রেমালিঙ্গন দিবে, আর তাঁহার দেহ হইবে অপবিত্র। এযে নিতান্ত অসহ্য। বরং এ পাপ-দেহ তাড়াতাড়ি বিসর্জন দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

সেদিন ভক্তগণসহ শ্রীচৈতন্য হরিদাসের ভজনকুটির আলো করিয়া বসিয়াছেন, ভাবাবেশে ও দিব্য আনন্দে তিনি উদ্দীপিত। শ্রীমুখ হইতে কৃষ্ণকথার অমৃতধারা ঝরিয়া পড়িতেছে।

হঠাৎ প্রভু সনাতনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, ‘সনাতন, একটা কথা সদাই মনে রেখো, দেহত্যাগ করিলেই কিন্তু কৃষ্ণ মিলে না; কৃষ্ণ মিলে কৃষ্ণভজনে। ওসব অশুভ সঙ্কল্প ছেড়ে দাও, ডুব দাও লীলাময়ের লীলারসের মহাপাথারে। আমি আশীর্বাদ করছি, অচিরে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, পাবে পরমপ্রভুর দর্শন।”

প্রভুর ইঙ্গিতের মর্ম সনাতন বুঝিলেন। অন্তর্যামীর কাছে সনাতনের আত্মহত্যার গোপন ইচ্ছাটি অজানা থাকে নাই।

প্রেমাবেগে সনাতন তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, “প্রভু, আমি পতিত, তায় মহাপাতকী। তবে এ দেহ জিইয়ে রেখে কি লাভ বলো? শ্রীজগন্নাথের রথচক্রতলে আমি নিজেকে নিক্ষেপ করবো, আমায় তমি অনুমতি দাও।”

উত্তরে কৃপাময় প্রভু যে কথা কহিলেন, তাঁহার মধ্য দিয়া অন্তরঙ্গ ভক্ত সনাতনের মূল্যায়ন প্রকট হইয়া উঠে:

প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজ ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ।
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে।
ধর্মাধর্ম বিচার কিবা না পার করিতে।
তোমার শরীর মোর প্রদান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন।

চিহ্নিত পার্ষদ সনাতনকে দিয়া কি ঐশী কর্ম প্রভু করাইবেন তাহার আভাস ইতিমধ্যেই কিছুটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণসেবার প্রবর্তন লীলাতীর্থ উদ্ধার, বৈরাগ্যময় আদর্শের প্রচার --- এগুলি তাঁহার সঙ্কল্পে রহিয়াছে। একাজে সনাতন তাঁহার অন্যতম প্রধান সহায়। নিজে প্রভু মাতৃআজ্ঞায় নীলাচলে বাস করিতেছেন, তাই এস্থান ত্যাগ করার ইচ্ছা তাঁহার নাই। এদিকে প্রাণপ্রিয় ব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলাধাম বৃন্দাবনের দিকে তাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে সতত নিবদ্ধ। সেখানকার নব উজ্জীবিত ভক্তিধর্ম আন্দোলনের পুরোভাগে প্রিয় পরিকর সনাতনকেই যে তিনি স্থাপন করিতে চান। সনাতনের মাধ্যমেই যে তাঁহার নিজ প্রয়োজন অনেকাংশ সিদ্ধ করিবেন।

ভর্ৎসনার পর সনাতন শির নত করিয়া রহিলেন। সত্যিই তো প্রভুর চরণে যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার উপরে যে তাঁহার সত্যকার কোনো অধিকার নাই। তবে সে জীবন এখন নিজ ইচ্ছায় কি করিয়া বিসর্জন দিবেন?

প্রভুর বাণী শুনিয়া হরিদাসের আনন্দ আর ধরে না। প্রেমভরে সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "সনাতন, তোমার সৌভাগ্যের সীমা নেই। স্বয়ং প্রভু তোমার দেহকে নিজ ধন বলে দাবি করছেন। শুধু তাই নয় নিজ দেহ দিয়ে যে কাজ সম্ভব নয়, তা করাতে মনস্থ করছেন তোমায় দিয়ে। তাই, তুমি সত্যই ধন্য। আমরা নিতান্ত অধম, তাই প্রভুর কোনো কাজে লাগতে পারলুম না।"

"এ কি অদ্ভুত কথা তুমি বলছো, শ্রীপাদ?" -সনাতন যুক্তকরে উত্তর দেন। "প্রভুর এই মন্ডলীতে তোমার মতো ভাগ্যবান্ আর কে আছে? প্রভুর আবির্ভাব নামধর্ম প্রচারের জন্য। এ কাজে তুমিই যে সবার অগ্রগণ্য। প্রভুর ভক্তদের সবাই সাধনভজন করছে নিজ নিজ কল্যাণের জন্য। কিন্তু তুমি হচ্ছো ব্যতিক্রম। নিজের উদ্ধারের জন্য ব্যগ্র না হয়ে, অবিরাম উচ্চ কণ্ঠে জপ ও কীর্তন ক'রে তুমি জীবের উদ্ধারের জন্য তৎপর হয়েছো বেশী। তোমার প্রেমের তুলনা কোথায়, শ্রীপাদ?"
সনাতন ও হরিদাসের এমনিতর প্রণয়-দ্বন্দ্বে ভজনকুটির মুখর হইয়া উঠিতে থাকে।

শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত জগদানন্দ পন্ডিত দেশ হইতে নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সেদিন তিনি সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করার পর সনাতন কহিলেন, "পন্ডিত আপনি প্রভুর একান্ত আপনার জন। আপনি আমায় সদুপদেশ দিন। প্রভু রোজ আমায় আলিঙ্গন করেন, আর তাঁর কনককান্তি দেহে লিপ্ত হয় আমার বীভৎস কন্ডু-রোগের রস। এ এক মহা অপরাধে আমি অপরাধী হয়ে পড়েছি। প্রভুকে নিরস্ত করা অসম্ভব। তাই ভেবেছিলাম, আত্মহত্যা করে এ সমস্যার সমাধান করবো, তাও হলো না। অন্তর্যামী প্রভু আগে থেকে সব বুঝতে পেরে তাতে বাদ সাধলেন। এখন আমি কি করি, বলুন তো!"

জগদানন্দ স্বভাবতই প্রভু-অন্ত প্রাণ। প্রভুর শরীর বিষাক্ত রোগের স্পর্শ নিত্য লাগিতেছে শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, "সনাতন, তুমি এক কাজ করো। বৃন্দাবনধাম থেকে তুমি ছুটে এসেছো প্রভুর দর্শনের জন্য, সেই আসল কাজটি তো ভাই সাঙ্গ হয়েছে। তবে আর এখানে থেকে রোজ বিপদ ডেকে আনছো কেন? সামনেই রয়েছে রথযাত্রা উৎসব - তারপরেই তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনে চলে যাও। তোমায় আর রূপ গোস্বামীকে প্রভু বৃন্দাবনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, আরো দিয়েছেন কত দুরূহ কাজের ভার। তোমার কি ভাই বৃন্দাবন ছেড়ে অন্যত্র বাস করা সাজে? বৃন্দাবনই যে তোমার স্বস্থান। কালবিলম্ব না ক'রে সেই স্বস্থানেই তো তোমার চলে যাওয়া উচিত।"
পন্ডিতের কথাগুলি যুক্তিযুক্ত। ভাবিয়া-চিন্তিয়া সনাতন তাহাতে সায় দিলেন।

পরদিন হরিদাস ও সনাতনকে প্রভু দর্শন দিতে আসিয়াছেন। অভ্যাসমতো সেদিন তিনি সনাতনকে বক্ষে ধারণ করলেন। তীব্র অনুশোচনার দহন শুরু হইল সনাতনের মনে। করজোড়ে কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, রোজ রোজ এই পাপীর দেহ তুমি স্পর্শ করো, বিষাক্ত কন্ডুর ছোঁয়া তোমার পবিত্র দেহে লাগে, আর আমি জ্বলে পুড়ে মরি। প্রভু, এবার আমি স্থির করেছি, নীলাচলে আর থকবো না, রথযাত্রার পরেই বৃন্দাবনে চলে যাবো। তাছাড়া এইতো কাল পন্ডিত জগদানন্দের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। তিনিও আমায় উপদেশ দিলেন, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাবার জন্য।"

প্রভু রোষে গর্জিয়া উঠেন। হুঙ্কার দিয়া কহেন, "কি বললে তুমি সনাতন! সেদিনকার জগা, সে আসে তোমায় উপদেশ দিতে। এত বড় তার স্পর্ধা। সে কি জানে না বুদ্ধিতে শাস্ত্রজ্ঞানে, ভজন সাধনে তুমি তার গুরু হবার যোগ্য? আমাকেও তুমি শাস্ত্রে নিগূঢ় তত্ত্ব শেখানোর শক্তি ধরো। তাছাড়া, তুমি আমার প্রাণাধিক প্রবীণ সুহৃদ। বালকবুদ্ধি জগা তোমায় উপদেশ দিতে আসে, এ ধৃষ্টতা তার কি ক'রে হলো?"
প্রভুর ক্রোধোদ্দীপ্ত মূর্তির দিকে সনাতন নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন, গন্ড বাহিয়া ঝরিতেছে প্রেমাশ্রুর ধারা।

ক্ষণপরে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, "প্রভু আজ আমার পরম সৌভাগ্য - তোমার এই প্রেমমনোহর রূপটি আমার সামনে এমনি ক'রে উদ্ঘাটিত হলো। আরো বুঝলাম, ভক্তপ্রবর জগদানন্দের মতো ভাগ্যবান ভক্ত খুব কমই রয়েছেন। তাকে তুমি যে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলে, তা করলে একান্ত আত্মজন জ্ঞানে। তোমার সহজ আত্মীয়তার সে অধিকারী। একি সহজ কথা, প্রভু? আসলে দেখছি, প্রকৃত অন্তরঙ্গ জন জগদানন্দের জন্য তুমি রেখেছ একাত্মতার মধু। আর দূর ব্যবধান থেকে আমাদের পান করাচ্ছো গৌরবস্তুতির নিম্ব নিশিন্দা রস।"

সনাতনের এই কথায় প্রভু একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। তারপর প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "সনাতন, আসল কথাটি শোন। তোমার চাইতে জগদানন্দ আমার প্রিয় নয়। আর জেনে রেখো, কারুর মর্যাদা লঙ্ঘন আমি কখনো সহ্য করতে পারিনে। তোমায় উপদেশ দিতে এসে জগদানন্দ তোমার মতো ব্যক্তির মর্যাদাকে লঙ্ঘন করেছে। এই জন্যই আমি তাকে ভর্ৎসনা করেছি। আর বহিরঙ্গ জ্ঞানে আমি তোমার প্রশংসা করেছি, তা মনে করো না। তোমার নিজস্ব গুণই প্রশংসা উৎসারিত ক'রে।"

ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া প্রভু আরো কহিলেন, "তোমরা জানো, আমি একজন সর্বত্যাগী সর্ববন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসী চন্দন ও পঙ্কে আমার সমজ্ঞান রাখাই তো উচিত। তবে সনাতনের কন্ডুরস আমার গায়ে লাগায় তোমরা এত চঞ্চল হচ্ছো কেন, বল তো?"

প্রবীণ ভক্ত হরিদাস এবার নিবেদন করিলেন, "প্রভু, তুমি স্বেচ্ছাময়, স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তোমার লীলার মর্ম আমরা কি বুঝবো। বৈষ্ণবাপরাধ ক'রে বাসুদেব ঠাকুর কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তা সত্ত্বেও তুমি তার প্রতি কৃপা করতে কার্পণ্য করোনি। তোমার প্রসাদে তার দুরারোগ্য কুষ্ঠ হয়েছিল নিরাময়। অথচ আজ দেখতে পাচ্ছি তোমাতে সমর্পিতপ্রাণ পরমভাগবত সনাতনের বিষাক্ত কন্ডু কিছুতেই দূর হচ্ছে না। এর রহস্য শুধু তুমিই জানো, প্রভু।"

মুচকি হাসিয়া প্রভু উত্তর দিলেন "হরিদাস, সনাতন আমায় সমর্পণ করেছে তার দেহ মন প্রাণ। আর আমি আমার সব সমর্পণ ক'রে বসে আছি আমার প্রাণপ্রভু কৃষ্ণের কাছে। সনাতনকে তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন।
ভক্তেরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই সনাতনের দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত হইল, সারা দেহে ফুটিয়া উঠিল অপূর্ব লাবণ্যশ্রী।

ক্রমে পবিত্র রথযাত্রা আসিয়া পড়ে। গৌড়ীয়া ভক্তগণ এ সময়ে সদলবলে নীলাচলে সমবেত হন, প্রাণপ্রভুকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের আনন্দরঙ্গ উচ্ছল হইয়া উঠে। এইসব প্রেমিক এবং প্রভুগতপ্রাণ ভক্তদের সাথে একে একে সনাতন পরিচিত হন, নিজেকে গণ্য করেন মহাভাগ্যবান।
এ সময়কার আর এক বড় আকর্ষণ-শ্রীজগন্নাথের রথের অগ্রভাগে ভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্যের নর্তন। এবার এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া সনাতন আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান।

চাতুর্মাস্য শেষ হইলে গৌড়ীয়া ভক্তগণ দেশে চলিয়া গেলেন। প্রভু কিন্তু সনাতনকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। তাই দোলযাত্রা অবধি সনাতনকে নীলাচলে অবস্থান করিতে হইল।
বারাণসীতে থাকা কালে বৈষ্ণব তত্ত্ব ও সাধনার যে শিক্ষা প্রভু সনাতনকে দিয়াছিলেন, এবার সমাপ্ত হয় তাঁহার পরবর্তী অধ্যায়। তাছাড়া, বৃন্দাবনে প্রভু নূতন ভক্তিসাম্রাজ্য গঠন করিতে চান এবং তাঁহার ভিত্তি নির্মাণ ও সংগঠনের ভার দিয়াছেন প্রিয় পার্ষদ সনাতনেরই উপর। বিশেষ করিয়া এই দুইটি কারণে মাসের পর মাস সনাতনকে প্রভু ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রাখেন, দান করেন বহুতর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ।

দোলযাত্রা উৎসব সাড়ম্বরে সমাপ্ত হইয়া গেল। এবার সাশ্রুনয়নে প্রভুর চরণে বিদায় নিয়া সনাতন নীলাচল ত্যাগ করিলেন।
বৃন্দাবনের আদিত্য টিলার পর্ণকুটিরে বসিয়া আবার শুরু হইল তাঁহার ভজন কীর্তন ও প্রভুর নির্দেশিত কর্মসাধন।

স্থানটি ইষ্ট-ধ্যানের পক্ষে বড় অনুকূল। উপরে দিগন্তবিস্তৃত নীলাকাশ।

নিচে কল্লোলিনী কৃষ্ণপ্রিয়া যমুনা বহিয়া চলিয়াছে অপরূপ লীলাভঙ্গিমায়। দূরে বনানীবেষ্টিত সারি সারি পাহাড়ের গায়ে জড়ানো নীল সবুজের মাধুরিমা। সমগ্র পরিবেশে যেন ওতপ্রোত হইয়া আছেন প্রাণপ্রিয় ইষ্টবিগ্রহ-শ্যামসুন্দর। পরামানন্দে দিনের পর দিন এই নির্জন রমণীয় অরণ্যাবাসে সনাতনের তপস্যা অগ্রসর হইয়া চলে।

বৃন্দাবনের আশেপাশে তখন জনমানবের বসতি খুব কম ছিল, তাই ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে হইলে সাধুদের যাইতে হইত মথুরা অঞ্চলে। সনাতনকেও মাঝে মাঝে তাঁহাই করিতে হইত। হঠাৎ একদিন এই ভিক্ষার মধ্য দিয়া উন্মোচিত হইল তাঁহার সাধন জীবনের এক নূতন বাতায়ন। ইষ্টদেব প্রকটিত করিলেন তাঁহার কাছে এক নূতনতর সেবালীলা।

মাধুকরী করিতে গিয়া সনাতন সেদিন মথুরার দামোদর চৌবের বাড়িতে উপস্থিত হইয়াছেন। অঙ্গনে পা দিতেই চোখে পড়িল নয়নাভিরাম বিগ্রহ, নাম শ্রীশ্রীমদনগোপাল। দর্শন মাত্রেই সনাতন কি জানি কেন এক অপূর্ব প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া গেলেন। এই শ্রীমূর্তি যেন তাঁহার কত আপনার, কত পরিচিত। কত জন্মের সাধনার ধন আজ যেন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

ভাবাবিষ্ট সাধকের অন্তরে জাগিয়া উঠে প্রবল আর্তি, আর জাগে এই শ্রীবিগ্রহ সেবার জন্য দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু অতি কষ্টে তাঁহাকে আত্মসংবরণ করিতে হয়। নিজে তিনি কন্থাকরঙ্গধারী কাঙাল বৈষ্ণব, শ্রমূর্তির সেবার সামর্থ্য তাঁহার কই? তাছাড়া, চৌবে-পরিবার তো প্রাণ গেলেও এই ইষ্ট-বিগ্রহ ত্যাগ করিবে না। ভিক্ষা গ্রহণের শেষে, লোভাতুর নয়নে বার বার ঐ শ্রীমূর্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন।

আদিত্য টিলার বিজন আবাসে সনাতন ফিরিয়া আসেন, দৈনন্দিন ধ্যানভজনে হন নিবিষ্ট। কিন্তু একি বিপদে আজ তিনি পড়িলেন? যখনি নয়ন মুদিয়া ভজন আসনে উপবেশন করেন, কোথা হইতে সেই মদনগোপাল মূর্তি মানসপটে ভাসিয়া উঠে, প্রাণ মন কাড়িয়া নিয়া আবার কোথায় মিলাইয়া যায়। সনাতনের মনে আর স্বস্তি নাই, শান্তি নাই। মাঝে মাঝেই কাজে বা অকাজে মথুরায় ছুটিয়া যান, চৌবেজীর অঙ্গনে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষে চাহিয়া থাকেন ঐ নয়নমনবিমোহন ঠাকুরের দিকে।

ক্রমে চৌবে-পরিবারের সঙ্গে সনাতনের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। চৌবেজীর বিধবা পত্নীর সেবার ভাবটি বড় সহজ সুন্দর। এই শ্রীবিগ্রহ তাঁহার আদরের বালগোপাল। নিজের বালক জ্ঞানেই দিনরাত তিনি ইহার সেবা-পরিচর্যা করেন। চৌবে গৃহিনীর পুত্রের নাম সদন। এই সদন যেমন তাঁহার এক পুত্র মদনগোপালজীও তেমনি আর একটি। প্রাণপ্রিয় দুই পুত্রের লালনপালন তিনি সম্পন্ন করেন একভাবে একই সহজ সরল মাতৃভাবের মধ্য দিয়া।
নিষ্ঠাবান ভক্ত সনাতনের মন কিন্তু খুঁতখুঁত করিতে থাকে। ইষ্টবিগ্রহে সেবা পরিচর্যা চলিবে গৃহেরই একটি বালকের সমপর্যায়ে? প্রকৃত ইষ্টনিষ্ঠা থাকিবে না, ইষ্টের সেবা ও পূজার বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে না, এ কেমন কথা?
সেদিন চৌবের গৃহিণীকে ডাকিয়া কহিলেন, "মা তুমি পরমস্নেহে মদনগোপালজীর সেবা-যত্ন ক'রে যাচ্ছো,তা ঠিক। কিন্তু আমার মনে হয়, এতে একটু ক্রটি রয়ে যাচ্ছে। তুমি মাতৃভাবে, যশোদাভাবে, প্রভুজীকে লালন করছো। কিন্তু মা-যশোদার বাৎসল্য রস তো সাধারণ জীবের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই আমার মনে হয়, তুমি প্রভুজীর সেবা সম্পন্ন করো সত্যকার ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়ে। যে প্রণালীতে ভক্ত বৈষ্ণবেরা ভগবানকে সেবা পূজা ক'রে, সেই প্রণালী তুমি অনুসরণ করো।"
মহিলা সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "তাই তো, বাবাজী। তুমি যে আমায় নূতন ক'রে ভাবিয়া তুললে। বেশ, তাই হবে, তোমার উপদেশ মতো এবার থেকে ঠাকুরের জন্য বিধিমতো সেবা-অর্চনার ব্যবস্থাই করবো।"
ইতিমধ্যে কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়াছে। মদনগোপালজীর দর্শনের জন্য সনাতন সেদিন মথুরায় গিয়েছেন, অঙ্গনে পদার্পণ করা মাত্রই চৌবে পত্নী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া অসিলেন। স্মিত হাস্যে কহিলেন, "নাঃ বাবাজী, তোমার কথামতো কাজ আর করা গেল না। মদনগোপালজী বড় ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সেদিন আমায় স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন, 'ওগো, তুমি আমার মা হয়ে ছিলে, সেই তো ছিল ভালো। এখন ঠাকুর জ্ঞানে আমায় দূরে সরিয়ে রাখছো, পূজো অর্চনার ভিড় লাগিয়েছো। এ আমার ভালো লাগছে না, বাপু তোমার দুই ছেলে, সদন আর মদনের ভেতর তফাত রাখা কি ভালো?"

সনাতন চমকিয়া উঠিলেন। তাই তো। সহজাত প্রেম ও প্রাণের স্বাভাবিক টান ইহাই যে ঠাকুরের সেবার শ্রেষ্ঠ উপচার! চৌবে গৃহিণীর স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে এই মূলতত্ত্বটিই যে মদনগোপাল আজ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। প্রভুজীর এই কৃপা নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়া বার বার সনাতনের নয়ন দুটি অশ্রু সজল হইয়া উঠিতে থাকে।

মদনগোপালজীর আকর্ষণ কিন্তু সনাতনের জীবনে দিন দিনই হইয়া উঠে দুর্নিবার। দৈন্যময় সাধকের অন্তরের অন্তস্থল হইতে নিয়ত উদগত হয় কাতর প্রার্থনা "হে প্রভু, হে দয়াল, তোমার বিরহ যে আর আমি সহ্য করতে পারছিনে। তুমি এসো- এসো, এই দীনহীন কাঙালের কোলে এসো। এই দুর্ভাগার জীবনে যে তীব্র দহন শুরু হয়েছে, তোমায় না পেলে তার নিবৃত্তি আর হবে না।"

অচিরে এই প্রার্থনা ও আর্তির ফল ফলিয়া যায়। দামোদর পত্নী সেদিন ম্লানমুখে সনাতনের কাছে আসিয়া দাঁড়ান। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহেন, "বাবাজী, আজ থেকে তুমিই নাও আমার মদনগোপালের সেবার ভার। গোপাল এখন বড় হয়েছে, মায়ের আঁচলের তলে আর বসে থাকতে চাইবে কেন? তোমার ঝুপড়িতে যাবে বলে বায়না ধরেছে, কাল রাতে স্বপ্নে এ কথা বার বার আমায় জানালে। তাছাড়া আমাদের সাংসারিক অবস্থাও ক্রমে অসচ্ছল হয়ে পড়েছে। ঠাকুরকে পাছে কষ্ট দিতে হয়, এই দুশ্চিন্তায়ই আমি মরছি। বাবাজী আজই এ বিগ্রহ তুমি নিয়ে যাও।"

সনাতনের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এভাবে পূর্ণ হইল। পরম আনন্দে শ্রীবিগ্রহ কোলে করিয়া তখনি ছুটিয়া চলিলেন বৃন্দাবনের ভজনকুটির অভিমুখে। সেখানে সযতনে স্থাপন করিলেন তাঁহার প্রাণপ্রিয় এই কৃষ্ণমূর্তি।

চৌবেজীর ঘর হইতে যে মদনগোপাল বিগ্রহ সনাতন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার একটি বিশেষ ঐতিহ্য রহিয়াছে। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র মহারাজ বজ্রনাভ এক সময় সারা ব্রজমন্ডলে অনুসন্ধান চালাইয়া যে আটটি প্রাচীন বিগ্রহ আবিষ্কার করেন, মদনগোপাল শ্রীমূর্তি তাঁহাদেরই অন্যতম।

প্রাণপ্রিয় বিগ্রহ তো হস্তগত হইল। কিন্তু এখন ইহার সেবা পরিচর্যার কি উপায়? সনাতন মহাসমস্যায় পড়িলেন। ভাবিয়া-চিন্তায় অবশেষে ভজনকুটিরের নিকটে এক ঝুপড়ি বাঁধিলেন, পরম যত্নে ঠাকুরকে সেখানে করিলেন সংস্থাপিত। সেবার জন্য নূতন উৎসাহে শুরু হইল মাধুকরী। ভিক্ষাস্বরূপ সামান্য যাহা কিছু আটা মিলিত তাহাই পিন্ডাকৃতি করিয়া আগুনে পোড়াইয়া নিতেন। তারপর প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে দীন ভক্ত রোজ ইহা নিবেদন করিতেন আরাধ্য ঠাকুরের সম্মুখে। অগ্নিদগ্ধ এই আটার পিন্ডই ব্রজমন্ডলের বৈষ্ণবসমাজে খ্যাতিলাভ ক'রে সনাতন গোসাইর আঙাকড়ি-ভোগ নামে। উত্তরকালে বড় বড় ধনী ব্যক্তিরা মদনগোপালজীর সেবায় প্রচুর অর্থদান করিতে আগাইয়া আসেন। তখনকার সে বিপুল আয়োজন, ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের দিনেও কাঙাল সনাতনের দগ্ধ আটাপিন্ড ছিল শ্রীবিগ্রহের নিত্যকার ভোগের অপরিহার্য অঙ্গ।

আঙাকড়ি ছাড়া আর একটি বস্তুও সনাতনকে নিবেদন করিতে দেখা যাইত। টিলার সানুদেশে ইতস্তত ছড়ানো ছিল নানা ধরনের বুনে শাক; রোজ তিনি এগুলি তুলিয়া আনিতেন। সৈন্ধব প্রায়ই জুটিত না, দীনহীন বৈষ্ণব অধিকাংশ দিনই অলবণে রান্না-করা ঐ শাক দ্বারা ভোগ চড়াইতেন। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হয়। অত:পর শ্রীবিগ্রহ একদিন বড় গোল বাধাইয়া বসেন। স্বপ্নে সনাতনকে দর্শন দিয়া কহেন, "ওগো তোমার দেওয়া এই ভোগ আর গলাধঃকরণ করা যাচ্ছে না। তোমার আঙাকড়ি আর সৈন্ধব-মসলাহীন রান্না খেয়ে আর কতকাল চালাবো, বল?"

সনাতনের নয়ন দুটি অশ্রু ছলছল হইয়া উঠে। কাতরস্বরে নিবেদন করেন, "প্রভু, তুমি তো জানো, আমি তোমার এক নিষ্কিঞ্চন অধম সেবক। তুমি বিশ্বব্রহ্মান্ডের অধিরাজ, তোমার উপযুক্ত রাজভোগ আমি কি ক'রে

যোগাবো? দগ্ধ আটা আর এই শাকসেদ্ধ খেতে রুচি না হয়, তুমি নিজেই নিজের সেবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা ক'রে নাও।

বড় জটিল, বড় দুর্জ্ঞেয় প্রভুর লীলাখেলা। চৌবে গৃহিণীর এত দিনের বাৎসল্য ও সমাদর ছাড়িয়া স্থান নিয়াছেন এই সহায় সম্পদহীন কাঙাল সাধুর ঘরে। আবার এখানে আসিয়া বায়না ধরিয়াছেন রুচিকর আহার্যের জন্য। কিন্তু ডোর-কৌপীন মাত্র সম্বল সনাতন এ ব্যাপারে কি করিতে পারেন? তিনি যে একবারে নিরুপায়।
দিনের পর দিন সনাতন চিন্তা করেন স্বপ্নে মদনগোপালজীর দর্শনদানের কথা। অন্তর তাঁহার তীব্র ব্যথায় মুহ্যমান হয়, কপোল বাহিয়া ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা।

নিরন্তর আকুতি ও অশ্রুর অর্ঘ্য এবার অন্তর্যামীর অন্তর স্পর্শ ক'রে। ভক্তাধীন ভগবান অল্প কয়েক দিনের ভিতরই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের ব্যবস্থা করিয়া দেন। পাঞ্জাবের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রামদাস কাপুর সেদিন রাত্রে নৌকা করিয়া বৃন্দাবনের পাশ দিয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে একরাশ মূল্যবান মালপত্র দূর শহরে গিয়া এগুলি বিক্রি করিবেন। হঠাৎ আদিত্য টিলার নিচে সূর্যঘাটের কাছে আসিয়া নৌকাটি এক বৃহৎ চড়ায় আটকাইয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে কাত হইয়া পড়ে। মাঝি-মাল্লারা বহুক্ষণ ঠেলাঠেলির পর হার মানিতে বাধ্য হয়, মালভর্তি ভারী নৌকা কোনোমতেই নাড়ানো সম্ভব হয় না।

কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রি। বৃন্দাবনের অরণ্যে ও টিলায় টিলায় ঘন অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। নিকটে কোথাও জনবসতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। রামদাস কাপুর প্রমাদ গনিলেন। কিছু সংখ্যক স্থানীয় লোকজন সংগ্রহ করিতে পারিলে নৌকাটি চড় হইতে টানিয়া বাহির করা যাইত। কিন্তু সে আশা দুরাশা। এই নিশুতি রাতে জনমানবহীন যমুনার তীরে কে আর তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিবে?

ক্রমে রামদাসের দুশ্চিন্তা বাড়িয়া চলে। নৌকা এরূপ কাত হইয়া থাকিলে অবশ্যই ডুবিবে এবং তাঁহার সর্বস্ব বিলীন হইবে জলগর্ভে। তাছাড়া, না ডুবিলেও বিপদের আশঙ্কা কিছু কম নয়। তীরস্থিত এই বিজন অরণ্যে দস্যুদের আনাগোনা আছে। কখন তাঁহারা হা-রে-রে করিয়া নৌকায় চড়াও হয়, মালপত্র, টাকাকড়ি লুটপাট করিয়া নেয়, কে জানে?
নিরুপায় হইয়া কেবলি ভাবিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়ে, অদূরস্থিত টিলায় এক মৃদুদীপশিখা। সঙ্গে সঙ্গে আশার আলো জ্বলিয়া উঠে রামদাসের অন্তরে। একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা যাক না কেন। হয়তো টিলার উপরে কোনো বসতি রহিয়াছে। ওখানকার কাহাকেও দিয়া কি আশপাশ হইতে লোকজন সংগ্রহ করা যায় না?
সাঁতরাইয়া তখনি তীরে উঠিলেন, আলো লক্ষ্য করিয়া ত্রস্তপদে আরোহণ করিলেন টিলার শীর্ষদেশে।

সঙ্গে সঙ্গে নয়নপথে পতিত হইল এক পর্ণকুটির। ভিতরে প্রদীপের ক্ষীণ আলো মিটিমিটি জ্বলিতেছে, আর এক পাশে স্থাপিত রহিয়াছেন নয়নাভিরাম কৃষ্ণবিগ্রহ। সম্মুখে এক দেবপ্রতিম বৈষ্ণব সাধক ভজরত। কি জানি কেন এই সাধককে দর্শন করা মাত্র রামদাসের অন্তরে জাগিয়া উঠিল সুদৃঢ় বিশ্বাস। অতি ভক্তিবরে সন্তর্পণে তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন।
উঠিয়া দাঁড়াইতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সাধক সনাতন আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিলেন। রামদাস করজোড়ে নিবেদন করিলেন তাঁহার বিপদের কাহিনী। কাতর কণ্ঠে মিনতি করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমি আজ বড় বিপন্ন, যমুনাগর্ভে আমার সর্বস্ব খোয়াতে বসেছি। ভাগ্যক্রমে এই বিজন স্থানে আপনার কৃপা ছাড়া আমার উদ্ধারের কোনো আশা নেই। অকপটে চরণতলে আশ্রয় নিলাম, আপনি আমায় বাঁচান।"

আর্তের কাতরোক্তিতে সনাতনের হৃদয় বিগলিত হইল। স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা তুমি এত অধীর হয়ো না, শান্ত হও, আমার মদনগোপালজী তোমায় কৃপা করবেন। এ বিপদ থেকে তুমি মুক্ত হবে। যাও নির্ভয়ে নেমে গিয়ে যমুনা তীরে অপেক্ষা করো।"

আশীর্বাদ ও অভয় লাভে রামদাসের হৃদয় কিঞ্চিৎ শান্ত হইল। টিলা হইতে অবতরণের আগে কহিলেন, "মহারাজ, আমি সঙ্কল্প করলাম, এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে আমার এবারকার বাণিজ্যের সবটা মুনাফা আপনার এই দেববিগ্রহের সেবায় অমি নিয়োজিত করবো।"
সনাতনের শুভেচ্ছায় সেই রাত্রেই রামদাস কাপুরকে বিপদমুক্ত হইতে দেখা যায়। হঠাৎ কোথা হইতে অলৌকিকভাবে যমুনাবক্ষে প্রবাহিত হয় নূতন স্রোতধারা। চড়ায় আবদ্ধ পণ্যবাহী বিপন্ন তরী আবার নিজপথে ভাসিয়া চলে।

বাণিজ্য হইতে ফিরিয়া রামদাস কাপুর তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনে চলিয়া আসেন, সনাতন গোস্বামরি নিকট হইতে সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। তাছাড়া, সেবারকার বাণিজ্যের সবটা লভ্যাংশ মদনগোপালজীর সেবায় তিনি উৎসর্গ করেন। প্রচুর ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া ঠাকুরের সেবা ও ভোগ বিতরণের স্থায়ী ব্যবস্থাও এই সঙ্গে করা হয়।
সনাতনের সেবিত এই মদনগোপাল কিন্তু ক্রমে জনসাধারণের কাছে মদনমোহন নামেই পরিচিত হইয়া উঠেন। উত্তরকালে নানা ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া এই লীলাময় শ্রীবিগ্রহ জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন।
ইষ্টদেবের মন্দির নির্মাণ ও সেবাকার্যের চমৎকার বন্দোবস্ত এভাবে আপনা হইতেই হইয়া যায়। সনাতনের সকল দুশ্চিন্তা দূর হয়, প্রাণমন ভরিয়া উঠে অপার তৃপ্তিতে।

প্রেমপূরিত হৃদয়ে, গলদশ্রুনয়নে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দন্ডবৎ করিয়া কহিতে থাকেন, "ঠাকুর, আগে ছিলে চৌবে ভবনে, তারপর এলে কাঙাল ভক্ত সনাতনের ঝুপড়িতে। এবার তুমি এসে দাঁড়িয়েছো ব্রজমন্ডলের তীর্থকামী ভক্তসমাজের নয়নসমক্ষে তীর্থরাজরূপে। জীবের কল্যাণের জন্য কৃপাভরে যে সেবালীলা এখানে তুমি প্রকট করছো, তা অব্যাহত থাকুক, এই মোর একান্ত প্রার্থনা। এবার এখান থেকে আমায় ছুটি দাও প্রভু।"
নবনির্মিত সুরম্য ঐ ইষ্ট মন্দিরে সনাতন কিন্তু একদিনও বাস করেন নাই। পূর্ববৎ বৃক্ষতল আর পর্ণকুটিরই হয় সর্বত্যাগী কৃচ্ছ্রব্রতী সাধকের একমাত্র আশ্রয়।
এখন হইতে কখনো গোবর্ধনের পাদমূলে, কখনো রাধাকুন্ডের তীরে কখনো বা গোকুলের অরণ্য অঞ্চলে ঝুপড়ি বাঁধিয়া একান্ত নিষ্ঠায় তিনি ভজন করিতে থাকেন।

লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের যে নির্দেশ প্রভু শ্রীচৈতন্যের নিকট হইতে সনাতন পাইয়াছেন ক্ষণেকের তরেও তিনি তাঁহা বিস্মৃত হন নাই। এ সময়ে যখন যেখানে অবস্থান করিতেন তাহার চারিদিকে তীর্থ ও তীর্থবিগ্রহের আবিষ্কার চেষ্টা ছিল তাঁহার সাধনার অন্যতম অঙ্গ। প্রভুর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সনাতন ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি তীর্থকে পুনরুজ্জীবিত করেন, তারপর সেগুলিকে তুলিয়া ধরেন জন-চৈতন্যের সমক্ষে। এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, নন্দগ্রামে নন্দ, যশোদা, বলভদ্র ও কৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তিনি ভক্তসমাজের ধন্যবাদভাজন হন।

লোকনাথ গোস্বামী ও ভুগর্ভ পন্ডিত আগে হইতেই শ্রীচৈতন্যের নির্দেশ অনুযায়ী ব্রজমন্ডলে সাধনভজন করিতেছেন। অতঃপর একে একে আসিয়া উপস্থিত হন রূপ গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতি। প্রত্যেকেই ভক্তিসাধনার এক একটি দিক্পাল। ইহাদের অত্যুগ্র সাধনা, ত্যাগ বৈরাগ্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের প্রভায় সারা উত্তর ভারতের অধ্যাত্মজীবন উদভাসিত হইয়া উঠে। আর এই সাধকগোষ্ঠীর মধ্যমণিরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন অশেষ-শাস্ত্রবিদ ধীর-গম্ভীর আপ্তকাম মহাপুরুষ সনাতন গোস্বামী।

প্রভু শ্রীচেতন্যের নির্দেশ ছিল, ভক্তিশাস্ত্র উদ্ধার করিতে হইবে এবং প্রবল উদ্যমে প্রচার করিতে হইবে নব নব বৈষ্ণবীয় দর্শন, স্মৃতি ও সাধনভজনের গ্রন্থ। এই সুস্পষ্ট নির্দেশ সনাতন কোনোদিন বিস্মৃত হন নাই। ভক্ত ও অনুগত বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ইহাদের সাহায্যে দিনের পর দিন তিনি সংগ্রহ করেন অজস্র প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থ। শুধু তাঁহাই নয়, নবতর রচনার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত----নিজে কতকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ যেমন রচনা করেন তেমনি তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রেরণায় ও নেতৃত্বে লিখিত হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, স্মৃতি ও ভজন-পূজনের গ্রন্থ ও নানা ধরনের টীকা ভাষ্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শাস্ত্রভিত্তি নির্মাণে ও গৌরবময় ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিতে যে অবদান সনাতন গোস্বামী রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার তুলনা বিরল। এই মহান কর্মকে তিনি গণ্য করিয়াছিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের আদিষ্ট ব্রতরূপে। বলাবাহুল্য, এ ব্রত সাফল্যের সহিত তিনি উদযাপন করিয়া যান।

ত্যাগ তিতিক্ষা, বৈরাগ্যময় সাধনা কৃষ্ণপ্রেমের পরম অনুভুতির সহিত সনাতন গোস্বামীর জীবনে মিলিত হইয়াছিল অসাধারণ প্রতিভা, শাস্ত্রজ্ঞান ও শ্রমনিষ্ঠা। বহুতর নিজস্ব রচনা, সংকলন ও সম্পাদনার মধ্যে তাঁহার এই জীবন-বৈশিষ্ট্যের ছাপ পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে।

পন্ডিতের শাস্ত্রচর্চা ও সাধকের প্রত্যক্ষীভূত সূক্ষ্মলোকের অনুভুতি--- এই দুইটি পৃথক বস্তু। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে এই দুটির সমাবেশ ঘটে, তাহা হইয়া উঠে এক দুর্লভ সম্পদ। সনাতনের রচনা ও সম্পাদনায় এই বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থাদির মধ্যে রহিয়াছে: লীলাস্তব, বৈষ্ণবীয় স্মৃতি, হরিভক্তি বিলাসের 'দিগদর্শিনী টীকা', বৃহৎ ভাগবতামৃত, ভাগবতামৃতের টীকা ও বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টীকা।

ইষ্ট-বিগ্রহের ভজন-পূজনের সময় আপ্তকাম সাধক সনাতনের শ্রীমুখ হইতে অজস্রধারে নির্গত হইত লীলামাহাত্ম্যের স্তব ও দৈন্যময় প্রার্থনা। ইহারই সংকলন হইতেছে 'লীলাস্তব'।

গোস্বামী গোপাল ভট্টকৃত 'হরিভক্তিবিলাস' এক মহামূল্যবান বৈষ্ণব-স্মৃতি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কৃত্য ও আচারসমূহ ইহাতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গোপাল ভট্টের নামে এই গ্রন্থ প্রচারিত হইলেও ইহার সংকলনে সনাতনের পান্ডিত্য ও প্রতিভার প্রভাব ছিল দূরপ্রসারী। সনাতন নিজে এই বিরাট স্মৃতিগ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার এই টীকার উদ্দেশ্য, প্রামাণ্য শাস্ত্র বাক্যের উদ্ধৃতি ও যথোচিত যুক্তিতর্ক প্রয়োগের দ্বারা জটিল সমস্যাসমূহের সমাধান করা। 'হরিভক্তি বিলাস'-এর গ্রন্থকাররূপে বয়ঃকনিষ্ঠ গোপাল ভট্টকে আগাইয়া দিয়া দিক্‌পাল শাস্ত্রবিদ্ সনাতন যেভাবে বিরাট বনস্পতির মতো ছায়া বিস্তার করিয়াছেন, নানা সিদ্ধান্তময়, বিতর্কবহুল, ঐ স্মৃতিগ্রন্থের পৃষ্ঠরক্ষার্থ দন্ডায়মান হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মতো প্রবীণ সাধক ও মনীষীরই উপযুক্ত।

বৃহৎ-ভাগবতামৃত নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সনাতন ভক্তিশাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়ছেন। একদিকে বৈষ্ণবধর্মের মর্মকথা যেমন ইহাতে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি বিস্তারিত হইয়াছে বিভিন্ন অবতারের তত্ত্ব ও প্রেমভক্তি-ধর্মের সাধনপ্রণালী। বৈষ্ণব সাধকদের কাছে এই গ্রন্থ অমৃতের খনি বিশেষ। এ গ্রন্থের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ সহজতর করার উদ্দেশ্যে সনাতন একটি বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করেন, তাঁহা 'দিগ্‌দর্শিনী' নামে পরিচিত।

সনাতনের শাস্ত্রসাধনার চরম অবদান---বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী নামক ভাগবতের টীকা। বেদান্তের নিগূঢ় পরমতত্ত্ব ও ভগবৎ ভক্তির অমৃতময় ব্যাখ্যার মিলন ঘটিয়াছে মহামুনি বেদব্যাস রচিত শ্রীমদ্ভাগবতে। বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক ও টীকা-ভাষ্য-কারেরা প্রধানত প্রেমভক্তিশাস্ত্রের এই অমৃতনির্ঝর হইতেই পরম পথের পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছেন, যাঁর যাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও সাধনার ধারা উন্মুক্ত করিয়া নিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের পক্ষ হইতে প্রবীণ সাধক সনাতন এই মহান আকরগ্রন্থের দশম স্কন্দ বা কৃষ্ণ জন্মখন্ডের এক বিস্তীর্ণ টীকা প্রণয়ন করেন। পান্ডিত্য ও রসমাধুর্যের দিক দিয়া সনাতনের বৈষ্ণবতোষণী ভক্তিশাস্ত্রের জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বিশিষ্ট গবেষকদের মতে, সনাতনের 'বৈষ্ণবতোষণী' যে ভাবে ভাগবতের দুরূহ স্থলের ব্যাখ্যায় আলোকপাত করিয়াছে, অনেক প্রাচীন টীকায়ও তাহা পাওয়া যায় না।

বৈষ্ণবতোষণী টীকা রচনা করার কালে সনাতন ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ, প্রায় চলৎ শক্তিহীন। এসময়ে বয়ঃকনিষ্ঠ ও অনুগত গোস্বামীদ্বয় রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস সর্বদা তাঁহার সেবক ও সহকারীরূপে সঙ্গে থাকিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়নে নানাভাবে সাহায্য করেন। বৈষ্ণবতোষণীই সনাতন গোস্বামীর শেষ রচনা, যে বৎসর এই মহাগ্রন্থ সমাপ্ত হয়, সেই বৎসরই তাঁহার জীবনদীপ হয় নির্বাপিত। সনাতনের দেহান্তের প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, শিষ্যপ্রতিম শ্রীজীব গোস্বামী, সুবিস্তৃত বৈষ্ণবতোষণীর এক সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহার নাম দেওয়া হয় লঘুতোষণী।

অনুজ রূপ গোস্বামীর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র উপরও সনাতন গোস্বামীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। গোপাল ভট্টের হরিভক্তিবিলাস-এর মতো রূপের এই গ্রন্থখানির পশ্চাতেও রহিয়াছে সনাতনের অধ্যাত্ম-প্রেরণা, ক্ষুরধার পান্ডিত্য ও পরম তত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। ভক্তিসাধনার নিগূঢ় ভাবরসের মাধুর্য প্রভৃতি যাহা কিছুই ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে, অনেকাংশে তাহা সনাতনেরই প্রতিভা ও সাধনানুভূতির স্বাক্ষর বহন করে।

সমকালীন ব্রজমন্ডলে গৌড়ীয় সাধক ও শাস্ত্রবিদদের মধ্যে সনাতন ছিলেন বয়ঃজ্যেষ্ঠ। তাছাড়া কৃচ্ছ্রব্রত, সাধনা, পান্ডিত্য ও প্রজ্ঞার দিক দিয়াও তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। তাই দেখা যায়, এই মহাপুরুষের সুদীর্ঘ জীবনকালে সারা ব্রজমন্ডল তাঁহার ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও সিদ্ধির কাছে মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে। ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে যিনিই যে গ্রন্থ এ সময়ে লিখিতেন, যে সিদ্ধান্ত ও মতবাদ স্থাপন করিতেন, সনাতনের সম্মতি ও সমর্থন ছাড়া তাহা ভক্তসমাজে গৃহীত হইতে পারিত না।

শ্রীচৈতন্য নীলাচলে অপ্রকট হন ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই দুঃসংবাদ শোনার পর হইতেই সনাতনের বহিরঙ্গ জীবনে ছেদ পড়িতে দেখা যায়। কর্মজীবন হইতে নিজেকে প্রায় গুটাইয়া নিয়া ইষ্ট বিগ্রহের নিরন্তর ধ্যান ও ভজনে তিনি তন্ময় হইয়া যান। তারপর ধীরে ধীরে মহাসাধক প্রবিষ্ট হন বক্তি সাধনার গভীরতম স্তরে।

সনাতনের ত্যাগ, বৈরাগ্য, পান্ডিত্য ও প্রেমভক্তি সাধনার ঐশ্বর্যের কথা ইতিমধ্যে শুধু ব্রজমন্ডলেই নয়, সারা উত্তর ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। দূর দূরান্ত হইতে ভক্ত সাধকেরা দলে দলে আসিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য ভিড় জমায়। কুঞ্জকুটির আলো-করা এই দেবমানবের চরণে লুন্ঠিত হইয়া সকলে হয় কৃতকৃতার্থ।

সনাতনের এ সময়কার সাধনৈশ্বর্য সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। সেবার বারাণসী হইতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হন্তদন্ত হইয়া সনাতনের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত। বর্ধমান জেলার মানকরে তাঁহার বাড়ি, নাম জীবনঠাকুর। সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ বলিয়া লোকে তাঁহাকে জানে; চিরজীবন কাটাইয়া আসিয়াছেন দারিদ্র্যের সহিত নিরন্তর যুঝিয়া। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে আর যেন দমে কুলাইতেছে না। সেদিন আর্তভাবে বিশ্বনাথের চরণে বার বার প্রার্থনা জানাইলেন, "বাবা, দারিদ্র্যের এ জ্বালা আর যে সহ্য হচ্ছে না, এবার কৃপা ক'রে আমায় রক্ষা করো, অর্থ প্রাপ্তির কোনো সন্ধান বলে দাও।"

নিশাযোগে প্রত্যাদেশ মিলিল -"ওরে, তুই শিগ্‌গীর ব্রজমন্ডলে চলে যা। সেখানে গিয়ে সনাতন গোস্বামীর শরণ নে। মহার্ঘ রত্ন পড়ে রয়েছে তার সন্ধানে। তার করুণা হলে তোর সর্ব দারিদ্র্য-দুঃখ চিরতরে দূর হবে।"

কালবিলম্ব না করিয়া জীবনঠাকুর ব্রজমন্ডলে আসিয়া উপস্থিত হন। সনাতন গোস্বামীর পদতলে পড়িয়া সবিস্তারে নিবেদন করেন স্বপ্নাদেশের কথা।

এ কাহিনী শুনিয়া গোস্বামী প্রভু তো মহা বিস্মিত। নিজে তিনি কাঙাল বৈষ্ণব, রিক্ত সন্ন্যাসী। ব্রাহ্মণের এই দুঃখ দারিদ্র্য তিনি কি করিয়া ঘুচাইবেন? আজকাল ভজন-পূজন সারিবার পর যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহা অতিবাহিত হয় ইষ্টদেবের ধ্যান জপে। বাহিরের কাহারো সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না। এ ব্রাহ্মণের সাহায্যের জন্য কাহাকে ধরিবেন, কাহার কাছে উপস্থিত হইবেন, ভাবিয়া পান না। সহসা তাঁহার স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠে পুরাতন একটি ঘটনার কথা। তাইতো! দারিদ্র্যক্লিষ্ট এই মানুষটির সাহায্য তো তিনি করিতে পারেন। সে অনেক দিন আগের কথা। যমুনার বালুকা-তট ধরিয়া সনাতন আপন মনে ভজন করিতে করিতে যাইতেছেন, হঠাৎ পায়ে ঠেকিল এক দুর্লভ রত্ন। মৃত্তিকা হইতে তখনি তাড়াতাড়ি উহা তুলিয়া নিলেন। পরক্ষণেই মনে খেলিয়া গেল চিন্তার ঝলক। সর্বত্যাগী কৃচ্ছ্রব্রতী সন্ন্যাসী তিনি, এ রত্ন দিয়া তাঁহার কোন্ কাজ? বরং যত শীঘ্র এটিকে যমুনায় বিসর্জন দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। আবার ভাবিলেন, শ্রীভগবানের কি ইচ্ছা তাহা কে জানে? হয়তো এই রত্ন দিয়া কোনো দুঃখী বা বিপন্ন মানুষের প্রাণ বাঁচিতে পারে। জলে ফেলিয়া না দিয়া তটের বস্ত তটে রাখিয়া দেওয়াই সমীচীন। সামনেই একটি চিহ্নিত স্থানে রত্নটি প্রোথিত করিয়া সনাতন আপন কুটিরে ফিরিয়া আসিলেন।

এতকাল সেই রত্নের কথা তাহার স্মরণে ছিল না। এবার মহা উৎফুল্ল হইয়া ভাবিলেন, ভালই হইল, এই অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণই তবে উহা গ্রহণ করুক।
যেস্থানে উহা প্রোথিত আছে তাঁহার সন্ধান তখনি বলিয়া দিলেন, প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, ঐ রত্ন তুমি এখনি তুলে নিয়ে যাও, দারিদ্র্যক্লেশ তোমার দূর হোক।" কথা কয়টি বলার পরই গোস্বামী প্রভু আবার মগ্ন হইলেন ইষ্টধ্যানে।
জীবনঠাকুর সোৎসাহে তখনি যমুনার তীরে ছুটিয়া যান। নির্দেশিত গোপন স্থান হইতে উদ্ধার করেন সেই দুর্লভ সম্পদ।

হস্তস্থিত রত্নখন্ড সূর্যাকারে ঝলসিয়া উঠে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে হন হতবাক। একি অদ্ভুত দৈবী লীলা প্রকটিত তাঁহার জীবনে? সাত রাজার ধন মানিক আজ যে তার মতো চির কাঙালের মুঠোর মধ্যে। এই মহার্ঘ বস্তু বিক্রয় করা মাত্র মিলিবে অগণিত অর্থ, ঐশ্বর্যের তাঁহার সীমা থাকিবে না। সনাতনের কৃপাতেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ আজ এই বিপুল সম্পদের অধিকারী। তাই তাঁহার কথা মনে হইতেই কৃতজ্ঞায় নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়া আসে।

হঠাৎ জীবনঠাকুরের চেতনার দ্বারে এক প্রচন্ড আগাত লাগে। সমগ্র সত্তায় জাগে আলোড়ন। সবিস্ময়ে ভাবিতে বসেন, ধন-সম্পদের লোভে পুণ্যধাম বারাণসী হইতে বৃন্দাবন অবধি তিনি পদব্রজে ছুটিয়া আসিয়াছেন, আর সনাতনের কৃপার ফলে করায়ত্ত হইয়াছে রাজভোগ্য রত্ন। অথচ সেই সনাতন গোস্বামীর বিন্দুমাত্র হুঁশ নাই এই মহার্ঘ বস্তুটির দিকে। এতকাল এটির কথা বিস্মৃতই ছিলেন, যদিই বা আর্তের কাতর ক্রন্দনে সে কথা মনে পড়িয়াছে, তাঁহার সন্ধানটি বলিয়া দিয়াই আবার ডুবিয়া গেলেন ধ্যান ভজনে। কোন্ অমৃত ভুঞ্জনের ফলে গোস্বামী এমন বিভোর হইয়া আছেন? কোন্ পরম ধনের অধিকারী তিনি যাহা এমন রাজবাঞ্ছিত রত্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করায়? অতুল বিত্তবৈভব, রাজসম্মান ত্যাগ করিয়া আসিয়া সনাতন ভজনানন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া আছেন, রূপান্তরিত হইয়াছেন দেবমানবরূপে। আর জীবনঠাকুর দৈবীকৃপায় সেই দেবমানবেরই সান্নিধ্য ও কৃপাপ্রসাদ পাইয়া তুচ্ছ রত্নের মোহে হইয়াছেন আচ্ছন্ন, ঘৃণ্য বিষয়কীটের জীবন আঁকড়াইয়া ধরিতে চলিয়াছেন আরো দৃঢ়হস্তে।
পরম ধন লাভের তীব্র আকুতি জাগিয়া উঠে ব্রাহ্মণের অন্তরে, এক অভূতপূর্ব দিব্য চেতনায় হন উদ্বুদ্ধ। মুহূর্তমধ্যে সেই মহার্ঘ রত্ন লোষ্ট্রবৎ নিক্ষেপ করেন যমুনায়। তারপর ত্রস্ত পদে সনাতনের কুঞ্জে ফিরিয়া যান। দন্ডবৎ করিয়া গলদশ্রু লোচনে নিবেদন করেন, "প্রভু, আমি জীবাধম। তাই নিজের তুচ্ছ ঘর-সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে আছি। দারিদ্র্য নিষ্পিষ্ট হয়ে সদাই উদগ্র হয়ে আছি অর্থলাভের জন্য। আজ আপনার সান্নিধ্যে এসে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে। যে ধনে ধনী হয়ে মণিকেও আপনি মণি বলে গণ্য করছেন না, কৃপা ক'রে তারই কিছুটা আমায় দিন। অর্থের বদলে দিন পরমার্থ। আজ থেকে আপনার চরণেই নিজেকে উৎসর্গ করলাম।"

সনাতনের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর শুরু হয় জীবনঠাকুরের অধ্যাত্মজীবনের অভিযাত্রা। নূতন মানুষে তিনি রূপান্তরিত হন। উত্তরকালে তাঁহার বংশ-খ্যাত হইয়া উঠে কাঠমাণ্ডুরার গোস্বামী পরিবার নামে।

জীবনের শেষ পর্যায়ে সনাতন নন্দীশ্বরের মানসগঙ্গা নামক পুণ্য সরোবরের তীরে আসিয়া সঙ্গোপনে অবস্থান করিতে থাকেন। উত্তরকালে এ স্থানটি বৈঠান বলিয়া খ্যাত হয়। নিকটেই চক্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই স্থানে এক বৃক্ষতলে বসিয়া মহাসাধক ব্রতীহন তাঁহার চরম অধ্যাত্ম-সাধনায়। স্নানাহারের দিকে কোনো হুঁশ নাই, একবারে অজগর বৃত্তি। অন্তরে সদা চলিয়াছে কৃষ্ণভজন আর কৃষ্ণলীলার অনুধ্যান।

সনাতন এ সময়ে অতিবৃদ্ধ, বয়স নব্বই বৎসরের কাছাকাছি। কথিত আছে, এই বয়সে প্রাণপ্রিয় ভক্তের এই কৃচ্ছ্রসাধন দেখিয়া ইষ্টদেব নিজেই ব্যগ্রভাব বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হন। গোপ বালকের ছদ্মবেশে ভার গ্রহণ করেন তাঁহার দৈনন্দিন আহার্যের। 'ভক্তিরত্নাকর' এই রসমধুর লীলার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন-

কৃষ্ণ গোপবালকের ছলে দুগ্ধ লৈয়া।
দাঁড়াইলা গোস্বামী সম্মুখে, হর্ষ হৈয়া।
গোরক্ষক বেশ, মাথে উষ্ণীষ শোভয়।
দুগ্ধভান্ড হাতে করি গোস্বামীরে কয়।
আছহ নির্জনে, তোমা কেহ নাহি জানে।
দেখিলাম তোমারে আসিয়া গোচারণে।
এই দুগ্ধ পান কর, আমার কথায়।
লইয়া যাইব ভান্ড, রাখিও এথায়।
কুটিরে রহিলে, মো সভার সুখ হবে।
ঐছে রহ, নহিলে ব্রজবাসী দুঃখ পাবে।

ক্রমে ভক্ত ভগবানের এই প্রেমলীলার কথা লোকমুখে প্রচারিত হইয়া পড়ে। সনাতনের ভক্ত ও গুণগ্রাহীরা ব্যাকুল হইয়া বৈঠানে ছুটিয়া আসেন। ইহাদের অনুরোধ উপরোধে সনাতন কৃচ্ছ্রসাধন হ্রাস করিতে বাধ্য হন। সবাই মিলিয়া ঐ বৃক্ষতলে তাঁহার জন্য এক কুটির বাঁধিয়া দেন। এ কুটির ত্যাগ করিয়া সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে আর ফিরিয়া যান নাই, শেষের দিন কয়টি এখানেই অতিবাহিত করেন। রূপ, রঘুনাথ প্রভৃতি বৃন্দাবনের গোস্বামীরা, সারা ভারতের দিগ্‌বিজয়ী পন্ডিত ও সার্থকনামা সাধুরা, প্রায়ই আসিয়া উপস্থিত হইতেন বৈঠানের এই নিভৃত পর্ণকুটিরে। আপ্তকাম সাধক সনাতনকে দর্শন করিয়া তাঁহারা ধন্য হইতেন, তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া হইতেন উপকৃত।

গিরি-গোবর্ধনের পরিক্রমা ছিল সনাতনের জীবনের এক প্রধান ব্রত। এই পুণ্যগিরি বৈঠান হইতে বেশী দূরে নয়। প্রথম প্রথম জরাজীর্ণ অশক্ত দেহ নিয়াও সনাতন পরিক্রমা সম্পন্ন করিতেন। পরের দিকে আর দৈহিক সাধ্যে তেমন কুলাইয়া উঠিত না। তখন তাঁহার সারা মনপ্রাণ পড়িয়া থাকিত ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপূত ঐ গিরির প্রদক্ষিণ পথের দিকে। অনুশোচনা ও বেদনায় পরম ভাগবতের অন্তর হইয়া উঠিত ভারাক্রান্ত।

ভক্ত হৃদয়ের আর্তি আবার সেদিন টানিয়া আনে ইষ্টদেবকে। নয়নাভিরাম মূর্তিতে গিরিধারীজী আবির্ভূত হন সনাতনের সমক্ষে। প্রসন্ন মধুর হাস্যে কহেন, "সনাতন, তোমার অন্তরে খেদ জেগেছে, আমার গোবর্ধন গিরির পরিক্রমা আর তুমি করতে পারছো না। সেই জন্যেই তো আমি ছুটে এলাম। এই দ্যাখো, আমার হাতে রয়েছে গোবর্ধনের শিলাখন্ড। আর এতে অঙ্কিত রয়েছে আমার চরণচিহ্ন। এই চরণ-পাহাড়ী ভক্তিভরে তোমার কুটিরে স্থাপন করবে, আর ভজন শেষে রোজ করবে এটিকে প্রদক্ষিণ। তাতেই হবে তোমার গোবর্ধন পরিক্রমণের ব্রত উদ্‌যাপন। এত এই জীর্ণ দেহে তোমার শ্রম লাঘব যেমন হবে, তেমনি আমারও বাড়বে আনন্দ।"

এখন হইতে এই চরণ-পাহাড়ীকে কেন্দ্র করিয়াই সনাতনের ভজন ও তপস্যার ধারা বহিয়া চলে। অতঃপর ধীরে ধীরে সমাগত হয় ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ়ী পূর্ণিমার তিথি। সনাতন গোস্বামীর জীবনদ্বারে সেদিন ধ্বনিত হয় তাঁহার প্রাণাধিক নওল কিশোরের পরম আহ্বান। চরণ-পাহাড়ীর পুণ্যময় বেদীতে দন্ডায়মান হইয়া জ্যোতির্ময় মূর্তিতে ইষ্টদেব তাঁহার পরম ভক্তকে দর্শন দেন। মায়িক জগতের যবনিকা ভেদ করিয়া সনাতন গোস্বামী প্রবিষ্ট হন শাশ্বত লীলাধামে।

এই মহাপ্রয়াণের ফলে উত্তর ভারতের বৈষ্ণবীয় সাধনার, সারস্বত সাধনার, এক তুঙ্গ শিখর যেন সেদিন ধসিয়া পড়ে। সারা ব্রজমন্ডলে নামিয়া আসে করুণ শোকের ছায়া। আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ তাহার প্রেমভক্তির মহান আলোকস্তম্ভটি হারাইয়া বিহ্বল হইয়া পড়ে।

সহস্র সহস্র শোকার্ত ব্রজবাসীর সম্মুখে, প্রভু মদনমোহনজীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে সনাতন গোস্বামীর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়। অগণিত ভক্তের শ্রদ্ধার্ঘ্য আজিও নিবেদিত হয় সেই পবিত্র ভূমিতে।

ভক্ত কবীর

শংকর নাথ রায়

(ভারতের সাধক বই থেকে সংকলিত)

শীতের রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। চারিদিকে ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। আচার্য রামানন্দ কাশীর অসিঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছেন। ব্রাহ্মমুহূর্তের বেশী দেরী নাই, তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরিয়া তাহাকে কৃত্যাদি শেষ করিতে হইবে। পথ ঘাট একেবারে জনশূন্য; নীরব নিস্তব্দ্ধ। মাঝে মাঝে শুধু শোনা যাইতেছে প্রত্যূষচারী পাখীর ডানা-ঝাপটানি, আর গঙ্গার জলস্রোতের ছলছলাৎ শব্দ। অস্ফুট আলোকে ঘাটের সিংড়িটি তেমন ভাল দেখা যায় না। অবশ্য তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নাই, এখানে উঠানামা করিতে তিনি অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কমণ্ডলু ও বহির্বাস ঘাটের উপর রাখিয়া রামানন্দ কেবল নীচের সিঁড়িটাতে পা বাড়াইয়াছেন। হঠাৎ এসময়ে কাহার স্পর্শ তাঁহার পায়ে লাগিল। ছি-ছি একি কোন মৃতদেহ? বলিয়া উঠিলেন, --- "রাম রাম রাম।" নীচের দিকে ঝুঁকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কে হে শীতের রাতে এমন ক'রে ঘাটের সিঁড়িতে শুয়ে? উঠে দাঁড়াও তো বাবা। তুমি কে?"

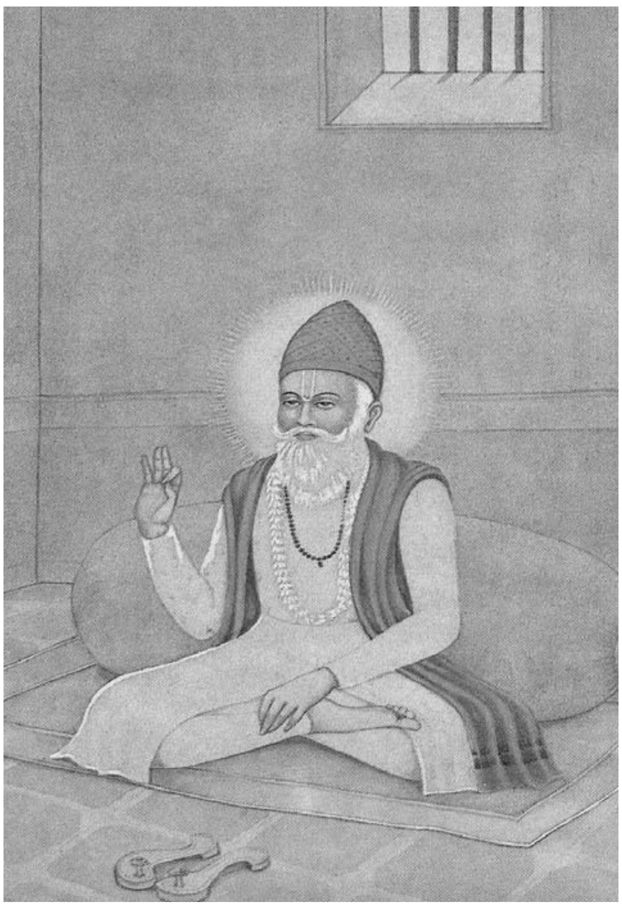

শায়িত মানুষটি ত্রস্তব্যস্তে ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রদ্ধানত শিরে যুক্তকরে সে নিবেদন করিল, "প্রভু আমি কবীর দাস, আপনার অনুগৃহীত শিষ্য।"

"সে কি কথা! এ আবার কি বলছো? তোমায় তো বাবা আমি কখনো শিষ্যরূপে গ্রহণ করিনি। এ তোমার ভ্রম।"

"না, প্রভু, আমার ভ্রম নয়, এর চাইতে বড় সত্য আমার জীবনে আর কখনো প্রতিভাত হয়ে উঠেনি। অন্ত্যজ নিরক্ষর জোলার ঘরে আমার জন্ম। বন্ধনদশার মধ্যে এ দেহ মন এতদিন ছিল মৃতকল্প হয়ে, মুক্তির কোন আশাই ছিল না। আজ আপনার কৃপায় তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। আজ এ দেহে পবিত্র পদস্পর্শ দিয়ে যে নাম দীক্ষা আপনি দান করলেন, তাই হবে আমার মুক্তিপথের পাথেয়। এ অধমকে আপনি আশ্রয় দিন, আর আর্শীবাদ করুন প্রভু।"

ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিয়া কবীরদাস গঙ্গার ঘাট হইতে চলিয়া গেলেন। অপসৃয়মান তরুণের দিকে রামানন্দ নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। অন্তরপটে সেদিন তাঁহার নবলব্ধ শিষ্যের কোন্ ভবিষ্যৎ চিত্রটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কে বলিবে?

রামানু সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য এই রামানন্দ স্বামী। স্বীয় সম্প্রদায়ের অনেক কিছু বিধিনিষেধের গণ্ডীকে তিনি অতিক্রম করেন, ভক্তিসাধনার উদারতার অঙ্গনতলে আসিয়া তিনি দাঁড়ান। ভারতের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মকেন্দ্র কাশীতে আসিয়া শুরু করেন নিজস্ব মতবাদের প্রচার। উত্তরকালে জাতিধর্ম নির্বিশেষে বহু মুমুক্ষু তাঁহার আশ্রয় পাইয়া ধন্য হয়। তাই তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে একদিকে যেমন দেখি শুদ্ধাচারী, রক্ষণশীল মালাতিলক-ধারী রামাইৎ বৈষ্ণব, তেমনি আর একদিকে দেখি অন্তরঙ্গ প্রেমসাধনার বাণী উদ্গাতা মরমিয়া সাধক।

আচার্য রামানন্দের ভক্তিধারা বাহিয়া অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন বহুতর সমর্থ সাধক। মুসলমান জোলা করীরদাস, চর্মকার রইদাস, জাঠ জাতীয় ভক্ত ধনা ও ক্ষৌরকার সেনা ইহাদের অন্যতম। কিন্তু কবীরদাসই তাঁহার উদার প্রাণময় ধর্মকে উত্তর ভারতের দিগবিদিকে ছড়াইয়া দিয়া যান। হিন্দীর একটি সুপ্রচলিত দোঁহা এ সম্পর্কে বলিতেছে---

ভক্তি দ্রাবিড় উপজি
লায়ে রামানন্দ,
প্রগট্ কিয়া কবীরনে
সপ্তদ্বীপ নও খণ্ড।

অর্থাৎ, ভক্ত উপজিত হয় দ্রাবিড় দেশে, তাহা আনয়ন করেন রামানন্দ, আর কবীর তাহা বিস্তারিত করিয়া দেন সারা পৃথিবীতে। কবীরের পরবর্তীকালে মধ্যযুগে এমন কোন ধর্মান্দোলন ছিল না যাহা তাঁহার শরণাগতি ও প্রেমভক্তির স্পর্শে প্রভাবিত হয় নাই। বারণসীর এক দরিদ্র মুসলমান জোলার ঘরে কবীরদাসের জন্ম। নিরক্ষর, অর্থ সংস্থানহীন এই পরিবারকে প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হয় বস্ত্র বয়নের উপর। পিতা নিরু ও জননী নীমা তাই একান্তভাবে চান যে কবীর তাঁহার পৈত্রিক বৃত্তি গ্রহণ করুক, এ কাজে দক্ষ হোক। সে সংসারের কিছুটা ভার নিলে তবেই না স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাঁহারা বাঁচেন। কিন্তু কবীরকে নিয়া পারিয়া উঠা দায়। স্বভাবতঃই সে খুব উদাসীন, সংসারের কোন কাজেই আঁট নাই। কোথাও হয়তো কোন ফকীর বা সাধু সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, সোৎসাহে সেবার কাজে সে লাগিয়া যায়, পাগলের মত তাঁহার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া দিন রাত কোথা দিয়া কাটিয়া যায়। বড় ঘর-ছাড়া বৈরাগী মন এ বালকের। তাঁতের টানা-পোড়েনের সম্মুখে তাহাকে বসানো বড় সহজ নয়। বহু চেষ্টার পর পুত্রের সম্বন্ধে আশা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মায়ের মনে কেবলই জ্বলিতে থাকে অশান্তির চাপা আগুন। ধর্মাচরণ করা, ফকীর পীর ও সাধুসন্তের কথা শোনা খারাপ কিছু

নয়। এ পরিবারের সকলেই ধর্মপরায়ণ, কেহ ইহাতে বাধা জন্মাইবে না। কিন্তু সংসারের দায়িত্ব গ্রহণও তো একটা বড় কর্তব্য। তরুণ পুত্র যদি সে দায়িত্ব কেবলি এড়াইয়া যায় তবে বৃদ্ধ বয়সে তাহাদের কি গতি হইবে? এ দারিদ্র্য-দুঃখ যে কোন কালেও আর ঘুচিবে না।

বাল্যকাল হইতেই কবীরদাসের অন্তরে জাগ্রত হয় তীব্র বৈরাগ্য আর মুক্তির অদম্য পিপাসা। পিতা মাতার সরলতা ও স্বভাবগত ভক্তি নিয়াই কবীরের জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। তদুপরি রহিয়াছে ধর্মান্তরিত পরিবারের পূর্ব ঐতিহ্যের প্রভাব। উত্তরভারতের এ জোলার দল একসময়ে ছিল হিন্দু, নাথপন্থী যোগী। মাত্র দুই তিন পুরুষ আগে তাঁহারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। পূর্বের আচার ও সংস্কার, যোগী-জীবনের আদর্শ ও সাধনার ঐতিহ্য তখনো তাহাদের মধ্যে ক্ষীণধারায় প্রবাহিত। কবীরের সহজাত ভক্তি-পরায়ণতা ও ধর্মজীবনের মূল খুঁজিতে হইবে বংশের এই প্রাচীন বৈশিষ্ঠ্যের মধ্যে। বারাণসীতে বহু হিন্দু সাধুসন্তের বাস, এ তীর্থের নানা পবিত্র স্থানে দেখা যায় শক্তিমান মহাপুরুষদের আনাগোনা। এই সব মহাত্মাদের কিছুটা সঙ্গ পাইয়া কবীরের মুমুক্ষা তীব্রভাবে জাগিয়া উঠিল। স্থির করিলেন, ইঁহাদের কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন, আশ্রয়ে থাকিয়া সাধন ভজনে দিন কাটাইবেন। কিন্তু অন্তরায়ও কম নাই। তিনি মুসলমান। কোন উচ্চকোটির সাধক বা সন্ন্যাসী যে তাহাকে দীক্ষা দিতে সম্মত হইবেন না। কিন্তু অন্তরে আজ জ্বলিয়া উঠিয়াছে অসহ্য জ্বালা, সাধন যে তাঁহার অবিলম্বে গ্রহণ করা চাই।

আচার্য রামানন্দ রাম মন্ত্রের উপাসক, দলে দলে মুক্তিকামী নরনারী তাঁহার আশ্রম ভবনে আসিয়া ভীড় জমায়। প্রেম ভক্তির মাধুর্যে, সাধনশক্তির ঐশ্বর্যে সকলের তিনি প্রাণমন কাড়িয়া নেন। তাছাড়া, কবীর শুনিয়াছেন, অপর আচার্যদের অপেক্ষা রামানন্দের উদারতা অনেক বেশী। যেমনি সমর্থ মহাপুরুষ তেমনি তিনি পরম কৃপালু। কিন্তু কবীরের ভয়, আচার্য যদি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বসেন, তবে উপায়? ঠিক করিলেন, বরং একাজে তিনি এক ক্ষুদ্র ছলনার আশ্রয় লইবেন। সর্বজ্ঞ গুরু তাঁহার অন্তরের কথাটি কি আর বুঝিয়া নিবেন না? ক্ষমা তাঁহার অবশ্যই মিলিবে। আগ্রহে অধীর কবীর তাই এমনি অদ্ভুতভাবে গঙ্গার ঘাটে সেদিন দীক্ষা নিলেন।

রামমন্ত্র গ্রহণ করিয়া কবীরদাস এবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কোন কাজেই তাঁহার আর আকর্ষণ নাই, উৎসাহ নাই। সারা দেহে, মনে বহিতেছে ভাবগঙ্গার এক প্রবল প্রবাহ। আপনাকে তিনি এই প্রবাহে একেবারে হারাইয়া বসিয়াছেন। বৃদ্ধ পিতামাতা শঙ্কিত হইয়া পড়েন, এমন করিলে কাজ-কর্ম ঘর-সংসার সব যে ভাসিয়া যাইবে। পরিবার প্রতিপালনের মস্ত দায়িত্ব তাঁহার, সে কথা ভুলিলে চলিবে কেন? তাঁতঘরে গিয়া কবীর কাজে ব্যাপৃতও হন, কিন্তু হাতের মাকু হাতেই থাকিয়া যায়, টানাপোড়েনের সূতা ছিঁড়িয়া বয়ন পণ্ড হয়। হাল ছাড়িয়া দিয়া তাই তাহাকে বলিতে হয়---

দীন দয়াল ভরোসে তেরে।
সভ পরবারু চঢ়াইআ বেড়ে।

---হে আমার দীনদয়াল, তোমার উপরই যে আমার ভরসা। আমার সারা পরিবারকে তোমারি নৌকায় চড়িয়ে দিলাম প্রভু।

শরণাগতি ও আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া ভক্ত কবীরের সাধনা দিনের পর দিন আগাইয়া চলে। কিন্তু এ ঔদাসীন্য, এ ভাবাবেশ চলিতে থাকিলে সংসারের ব্যয় নির্বাহ কি করিয়া হইবে? কবীরের মাতা ও পিতা প্রমাদ গণিলেন। চরম দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া নিরু ও নীমার জীবন কাটিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র ভরসাস্থল এই পুত্রটি। নিরক্ষর হইলেও বুদ্ধি দক্ষতা তাঁহার যথেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু কোন কাজ করার মত মনই যে আর তাঁহার নাই। কবীরমাতা নীমার এ সময়কার দুঃখদৈন্য ও আশান্তির ছবিটি কবীরের রচিত একটি দোঁহায় ফুটিয়া উঠিয়াছে---

মুসি মুসি রোয়ৈ
কবীর কী যায়,
এই বারক কৈসে
জীয়হি রঘুরায়॥
তন্‌না বুন্‌না সব তজ্যো
হৈ কবীর,
হরিকা নাম লিখি
নিয়ো শরীর।

অর্থাৎ, দুঃখভরে বোদন করতে থাকেন কবীরের মা---রঘুরায়, এবার কি ক'রে জীবন রক্ষা হবে, তা বল। কবীর তার সারা শরীরের উপর লিখে নিয়েছে হরির নাম, আর তানা বোনা সব কিছু কাজ যে ক'রেছে পরিত্যাগ।

শক্তিমান আচার্য রামানন্দের স্পর্শ, তাঁহার প্রদত্ত রামমন্ত্র আজ চৈতন্যময় হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরের লোক কবীরকে উন্মাদ ভাবিলে কি হয়, তিনি যে আজ এক নূতন মানুষে রূপান্তরিত। ভগবৎ প্রেমের উচ্ছলিত তরঙ্গভঙ্গ সমস্ত চেতনাকে একাকার করিয়া দিতেছে। নামরসে নিরন্তর অবগাহনের ফলে যে অবস্থাটি তাঁহার সাধনজীবনে দেখা দেয় কবীর তাঁহার বর্ণনা দিতেছেন---

নাম অমল উতরৈ না ভাঈ।
ঔর অমল ছিন ছিন চঢ়ি উতরৈ,
নাম-অমল দিন বঢ়ৈ সওয়াই
দেখত চঢ়ৈ সুনত হিয় লাগৈ
সুরত কিয়ে তন দেত ঘুমাঈ।
পিয়ত পেয়ালা ভয়ে মতওয়ালা,
পায়ো নাম মিটী দুচিতাই!
জো জন নাম অমল রস চাখা,
তর গঈ গণিকা সদন কসাঈ।
কহ কবীর গূঁগে গুড় খায়া
বিন রসনা কা করৈ বড়াঈ।

অর্থাৎ---ভাইরে, নামের নেশা কখনো যায় না টুটে। সব নেশারই রয়েছে হ্রাস আর বৃদ্ধি, কিন্তু নাম-নেশা কেবলই যায় বেড়ে। নামের দিকে তাকালে নেশা বেড়ে ওঠে, শ্রবণ করলে হিয়াতে লাগে তার স্পর্শ, নামে প্রেম জন্মালে তনু হয় আবেশাচ্ছন্ন। নামের পেয়ালায় যে দেয় চুমুক, সে হয়ে যায় মাতাল। নাম যে পেয়েছে সব দ্বিধা তার গেছে কেটে। নামরসের পানপাত্র যে চেখেছে, গণিকা হোক আর সদন কসাই হোক---সে গেছে ত'রে; কবীর কহে, বোবা খেয়েছে গুড়, তাই রসনায় নামের মহিমা সে বলবে কি ক'রে? মহাপুরুষ রামানন্দের আশ্রয় তাঁহার মিলিয়াছে। গুরুকৃপার আলোকে অন্তরের মণিকোটা আজ আলোকিত। জন্মান্তরের সাত্ত্বিক সংস্কাররাশি এবার উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। কবীর হইয়াছেন প্রেমের পাগল, পরম উদাসীন---'মস্ত'।

উত্তরকালে কবীর কহিয়াছিলেন 'রাগ লখৈ সো তরিয়া'---প্রেমকে যে ---- দর্শন করিয়াছে, মুক্তি মিলিয়াছে তাহারই। কিন্তু এ সৌভাগ্যদয়টি ভক্ত কবীরের জীবনে বড় সহজে আসে নাই। এজন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। সামাজিক বাধাবিঘ্ন, কঠোর জীবনসংগ্রাম ও তীব্র ত্যাগতিতিক্ষার ভিতর দিয়া দিনের পর দিন তিনি পথ চলিয়াছেন। নিতান্ত সাধারণ জোলার ঘরের ছেলে কবীর। মাতা পিতা ও পাড়া-পড়শীরা তাঁহার এ প্রেমোন্মত্ত জীবনের ধর্ম বুঝিতে চাহিবে কেন? ঘর সংসারের দিকে তাঁহার মন ঘুরানোর জন্য সকলে উৎসাহিত হইয়া উঠে। চাপিয়া ধরিয়া কবীরকে বিবাহ দেয়, কোন মতে যদি তরুণী বধূ তাঁহার মন ফিরাইতে পারে। কিন্তু গুরু রামানন্দের স্পর্শ যে অমোঘ। এ স্পর্শে রামনামের আগুন কবীরের জৈব জীবনের পরতে পরতে আজ লাগিয়াছে। জনক জননীর স্নেহ, পত্নীর প্রেম, সংসারের মোহবন্ধন সব কিছু তাঁহার

কাছে তাই নিরর্থক। উদাসীন ভাবোন্মত্ত অবস্থায় আগেরই মত তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন। সংসারে থাকিয়াও গার্হস্থ্য জীবনকে কোনদিন আর গ্রহণ করিলেন না। সাধনার দিব্য অনুভূতি পর পর উদ্‌ঘাটিত হইয়া চলিয়াছে, লোকোত্তর জীবনের স্বাদে ও নেশায় তিনি বুঁদ। রূপান্তরিত জীবনটি নিয়া নির্লিপ্তভাবে গৃহ পরিবেশে তিনি রহিয়া যান।

কবীরের পত্নী, গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য আজ আর পাইবার উপায় নাই শুধু জানা যায়, তাঁহার পুত্র কামালও উত্তরকালে এক মহাসাধকে পরিণত হন। পিতার সাধনার নির্দিষ্ট ধারাটি অনুসরণ না করিলেও এক বিশিষ্ট মরমিয়া সাধকরূপে সারা উত্তরভারতে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

কবীরের সাধনা হইতেছে: নিগূঢ় প্রেমের সাধনা। প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের আবর্তে তিনি অধীর, আবার বিরহের তীব্র বেদনায় তিনি জর-জর। দিবানিশি নাম গান করিয়া আর দোঁহা ও ভজন গীত গাহিয়া তাঁহার দিন অতিবাহিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞানহীন এই নিরক্ষর সাধকের রচনায় দানা বাঁধিয়া উঠে অন্তর সাধনার মধুর রস, আর এগুলিতে ঝকমক করিয়া উঠিতে থাকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির দীপ্তি। শুধু সাধারণ মানুষই নয়, সমকালীন সাধুসন্তদের মনেও কবীরের ভাব ও সুর চমক লাগাইয়া দিতে থাকে। বিস্মিত হইয়া সকলে ভাবে---পরম সত্যের বাণী, শাশ্বত জীবনের গূঢ় তত্ত্ব এমন সহজ সাচ্ছন্দ্যে এ জোলার মুখ হইতে কি করিয়া বাহির হয়?

জন্ম-জন্মান্তরের সাধন ঐশ্বর্য সঞ্চিত তাঁহার অন্তরের মণিকোঠায়। এবার রামানন্দের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ তাঁহার রুদ্ধ দুয়ারটি খুলিয়া দিয়া গিয়াছে। ভক্ত কবীর খুঁজিয়া পাইয়াছেন তাঁহার সম্পদ---অপরূপ দাক্ষিণ্যে দুই হাতে তাহা ছড়াইয়া চলিয়াছেন। সাধনা ও সিদ্ধি, বিরহ ও মিলনের রসবৈচিত্র্যে তাঁহার দোঁহা হইয়া উঠিয়াছে অপরূপ, প্রেমসাধকের আর্তিতে ও আনন্দোল্লাসে এগুলি দিকে দিকে জাগাইয়াছে প্রাণচাঞ্চল্য। প্রেমসাধক কবীরের সর্বসত্তা, দেহমনপ্রাণ প্রিয়মিলনের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। কিন্তু কই, তাঁহার দর্শন তো মিলিতেছে না? তিনি তাই স্বরচিত পদে খেদোক্তি করিতেছেন, "ওগো, পথ চেয়ে চেয়ে আঁখি দুটিতে আমার পড়লো ছানি, নাম নিতে নিতে জিভের ছিঁড়ে গেল ত্বক, চোখদুটি বৈরাগী হয়ে গেল, হাতে নিয়ে বিরহের কমণ্ডলু---দরশন মাধুকরী তারা মেগে বেড়াচ্ছে, তারা এ নিয়ে বিভোর রয়েছে দিন রাত!" কিন্তু কই, সে বহু-ঈপ্সীত পরমবস্তুটি তো আজো মিলিতেছে না। প্রেমপাগল কবীরের বিরহী চিত্ত তাই এবার চরম আত্মদানের ভয় দেখাইয়া দয়িতকে কহিতেছে---

লহু তন জালৌ মসি করৌ, লিখৌ রামকা নাঁউ।
লেখনি করু করংককী,
লিখি লিখি রাম পঠাউ।।
ইস তনকা দীওয়া করৌ
বাতী মেলু জীব,
লোহী সীঞ্চৌ তেল জ্যু
কব মুখ দেখোঁ পীর।
কৈ বিরহিনকু মীচ দে,
কে আপা দিখলাই!
আঠ পহরকা দাঝণা,
মোপৈ সহা ন জাই।।

অর্থাৎ, আমার এই তনু পুড়িয়ে বানাবো কালি, তা দিয়ে লিখবো রামের নাম। আর বুকের পাঁজরকে লেখনি ক'রে তাই দিয়ে লিখে পাঠাবো রামকে! এই তনুকে করবো প্রদীপ, আর আমার প্রাণ হবে তাতে সল্‌তে। রক্তরূপ তেল দিয়ে সিঞ্চন করবো এই সল্‌তে। এই প্রদীপের আলোয় আমি কবে দেখবো প্রিয়ের মুখ? হে প্রভু, হয় তোমার দর্শন দাও, নয় তো এ বিরহিনীকে দাও মৃত্যু। অষ্ট প্রহরের এ দহন জ্বালা আর তো আমার সহ্য হয় না।

দুঃখের দহন ও প্রেমের মন্থনের পর এবার সাধক জীবনে আসিতেছে প্রিয় মিলনের পালা। কবীরের দুয়ারে পরম প্রভুর বার্তা আসিয়া গিয়াছে। এবার তাঁহার প্রেমাভিসার----

ভীজৈ চুনরিয়া প্রেম-রস বুদন।
আজত সাজকে চলী হৈ সুহাগিন
প্রিয় অপনেকো ঢুঢ়ন।
কাহেকী তোরী বনী হৈ চুনরিয়া
কাহাকে লগে চারো ফুদন।
পঁচ তত্ত্বকী বনী হৈ চুনরিয়া
নামকে লাগে ফুদন।
চড়িগে মহল খুল গঈরে কিবরিয়া
দাস কবীর লাগে ঝুলন।

অর্থাৎ "প্রেমরসের ফোঁটায় ভিজে গেছে চুনরিয়া---বুটিদার ওড়না প্রিয়তমের সন্ধানে প্রেমিকা চলেছে ব্যাকুল হয়ে। ওগো, তোমার চুনরিয়া কি দিয়ে তৈরি? চারদিকের ঝালরই বা কিসের? পঞ্চতত্ত্বের তৈরী এ চুনরিয়া, তাতে লাগানো হয়েছে নামের ঝালর। ওরে প্রিয়মহলে এবার ওঠ্ গিয়ে, দুয়ার যে তার গিয়েছে খুলে---কবীরদাস তাই দেখেই তো আজ দুলছে পরম আনন্দে।"

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তাঁহার এ প্রিয় মিলন ও পরম প্রাপ্তি। এ মহা সৌভাগ্যের সংবাদটি নিজেই তিনি সানন্দে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন---

'কৈহে কবীর সুনো ভাগ হমারা পায়া অচল সোহাগ রে।'

সাধক কবীর সত্যই বড় ভাগ্যবান, প্রেমময়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রেম লাভ করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন। এই মিলন রঙ্গের আনন্দ সংবাদ, রঙমহলের এ নিগূঢ় কাহিনী তিনি সকল ভক্ত, সকল অন্তরঙ্গ প্রেমসাধকের কাছে অকপটে ব্যক্ত না করিয়া শান্তি পান না। তাই অপরূপ ভাব ও ব্যঞ্জনায় বলিতেছেন---

ভোগ জুগত সো রঙ্ মহলমে,
প্রিয় পাঈ অনমোল রে।
কহৈঁ কবীর আনন্দ ভয়ো হৈ
বাজত অনহদ ঢোল রে।।

অর্থাৎ, যোগ সাধন ক'রে আমি আমার প্রিয়তমকে, রঙমহলের সেই অমূল্য ধনকে পেয়েছি---কবীর বলে, আজ বড় আনন্দ, শোন ঐ অনাহত মৃদঙ্গ বেজে চলেছে। প্রিয় মিলনের এই মধুর রস মরমী সাধকের জীবনে আরো গাঢ় হইয়া উঠে---

লিখালিখি কী হৈ নহী
দেখা দেখী বাত!
দুলহা দুলহিনী মিলি গয়ে
ফীকী পরি বরাত।

---ওগো, এতো লেখালেখি বা বর্ণনার কথা নয়, এ হ'লো দেখাদেখির কথা, প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা---বর কনে মিলে গেল, আর ফিকে হয়ে গেল চারিদিকের বরযাত্রীর দল।

কবীরের এই প্রেমসাধনা শুধু অন্তরতমের সহিত নিবিড় মিলনেই থামিয়া যায় নাই, একীকরণ ও একাত্মকরণের মধ্যে পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া ছাড়িয়াছে---

উলটি সমানা আপনে,
প্রগটি জ্যোতি অনন্ত।
সাহেব সেবক এক সঙ্গ
খেলৈ সদা বসন্ত।।

অর্থাৎ সাধক কবীর এবার উলটিয়া আপন সত্তার মধ্যেই প্রবেশ করিলেন। অনন্ত জ্যোতি সেখানে প্রকটিত, প্রভু ভৃত্য সেখানে এক হইয়া গিয়াছে, আর চির বসন্ত সেখানে রহিয়াছে বিদ্যমান।

কিন্তু সাধক কবীরের খ্যাতি তখন উত্তর ভারতের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বারাণসীর মত বিখ্যাত ধর্মকেন্দ্রে সাধু সন্ন্যাসী ও ফকীরের ভীড় লাগিয়াই আছে। এখানেও ভক্ত কবীর এক মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করিলেন। আচার্য রামানন্দের শিষ্য হইলেও রামানন্দ-সম্প্রদায়ে কবীর স্থান পান নাই। কোন সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার মত লোকও তিনি ছিলেন না। গুরুর আশীবাদপূত এক অপূর্ব জনপ্রিয় সহজসাধ্য ভক্তিবাদের প্রচার তিনি শুরু করেন। জটিল অনুষ্ঠান ও বাহ্যাচারকে এড়াইয়া তিনি স্থাপন করেন এক উদার সার্বজনীন ধর্মমত যাহা সেদিন শিক্ষিত, উচ্চবর্ণ ও অন্যান্য সকলেরই গ্রহণীয় হইয়া উঠে।

সমসাময়িক যুগের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাই ভক্ত কবীরের জনপ্রিয়তার সীমা রহিল না। তিনি চিহ্নিত হইলেন এক উদার অধ্যাত্ম-নেতা ও উচ্চকোটি ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে। এই প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা প্রাপ্তির পরেও কবীরদাস গুরু রামানন্দ প্রদত্ত শরণাগতি ও ভক্তির আদর্শ হইতে একদিনের জন্যও বিচ্যুত হন নাই। স্বরচিত দোঁহাগুলিতে এই বহু-বিশ্রুত সিদ্ধপুরুষ তাঁহার আত্মসমর্পণের এক অপূর্ব নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন---

কবীর কুতা রামকা,
মুতিয়া মেরা নাঁউ!
গলৈ রামকী জেবড়ী,
জিত খিঁচৈ তিত জাউ।।
তো তো করৈ তো বাহুড়ৌ
দুরি দুরি করৈ তো জাউ।।
জ্যু হরি রাখৈ ত্যু রহৌ
জো দেবৈ সো খাউ।।

অর্থাৎ, কবীর বলছে---আমি হচ্ছি রামেরই কুকুর। মুতিয়া আমার নাম, আমার গলায় রয়েছে রামেরই দড়ি। তিনি যে দিকে টানেন সে দিকেই আমাকে যেতে হয়। তু-তু ক'রে ডাকলে কাছে আসি, আবার দূর করে দিলে সরে যাই। হরি যেমন আমায় রাখেন তেমনি আমি থাকি---যা তিনি যোগান তাই খেয়ে করি প্রাণ ধারণ।

রামমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবীরদাসের অন্তর্জীবনের কপাটটি হঠাৎ খুলিয়া যায়, রামনাম রসে ডুবিয়া এক ভাবুক সাধকে তিনি পরিণত হন। সেদিনকার এই প্রেমোন্মাদ সাধককে আমরা বলিতে শুনিয়াছি---

কো বীনৈ প্রেম লাগৌ রী মাঈ, কো বীনৈ।
রাম-রসায়ন মাতে রী মাঈ, কো বীনৈ।

অর্থাৎ---মাগো, আমি যে পড়েছি প্রেমে, বলতো এখন কাপড় বুনবে কে। মাগো, আমি যে রাম-রসায়ন পান করে হয়ে গেছি একবারে প্রমত্ত, কাপড় আর বুনবে কে?

রামনামের এ রসায়নই সেদিন কবীরকে উত্তরকালে করিয়া তুলে এক সিদ্ধ সাধক, তাঁহার ইষ্ট মূর্তি ছড়াইয়া পড়ে নিখিল ভুবনে। শুধু রাম নয়--হরি, গোবিন্দ, কেশব সাহিব প্রভৃতি নানা নামে তিনি তাঁহার প্রভুকে ডাকিয়া গিয়াছেন, আর ইহাদের মধ্য দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে অচিন্তা, অবর্ণনীয় ব্রহ্মের পরম তত্ত্ব। কবীরদাসের মতে তাঁহার প্রভু, রাম হইতেছেন বেদ কোরাণের অগম্য এক সর্বাতীত পরম বস্তু।---বেদ কুরোণৌ গমি নহী। সগুণ, না নির্গুণ---কোন্ তত্ত্বটি কবীর সমর্থন করেন। উত্তরে বলিতেছেন নির্গুণেরই কথা---

দাস কবীর গাবৈঁ নিরগুণহো,
সাধো করি লে বিচার।
নরম গরম সৌদা করি লে হো,
আগে হাট না বাজার।।

আপন সাধনার এই সাকার ও নিরাকারের রূপ ও অরূপের অপরূপ সামঞ্জস্য বিধান তিনি করিয়াছেন। তাঁহার রচিত পদে এই তত্ত্বটি চমৎকাররূপে ফুটিয়া উঠিতে দেখি। তিনি বলিতেছেন---

রেখ-রূপ কোহি হৈ নহিঁ,
অধর ধরো নহিঁ দেহ।
গগন-মণ্ডলকে মাধ্যমেঁ,
রহতা পুরুষ বিদেহ।
সাঁঈ মেরা এক তু,
ঔর ন দূজা কোই,
জো সাহব দূজা কহৈ
দূজা কুলকো হোই।।
সগুণকী সেবা করৌ
নির্গুণকা করু জ্ঞান।
নির্গুণ সগুণকে পরে,
তহৈঁ হামারা ধ্যান।।

অর্থাৎ রূপ ও আকার যাঁর নেই সেই অধরা দেহ ধারণ করেন না, সেই বিদেহী পুরুষ সদা বিরাজিত গগনমণ্ডলে। ওগো মোর প্রভু, একমাত্র তুমিই আছো, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। যে বলে আমার প্রভুর দ্বিতীয় আছে, সে অন্য কুলের মানুষ। সগুণের সেবা ক'রে যাও, আর জ্ঞানলাভ কর নির্গুণের। সগুণ নির্গুণের অতীত যিনি, আমার ধ্যান যে তাঁরই জন্য।

কবীর হইতেছেন মরমীয়া প্রেমসাধক, তাই সাকার ইষ্টের স্মরণে, তাঁহার নাম গানে চলে তাঁহার নিরন্তর রসভুঞ্জন। অনন্ত ভাবময় বিগ্রহ তাঁহার এই ইষ্ট। জাগরণে হোক, স্বপনে হোক, ভক্ত সাধক সেখানে তুমি-আমির পার্থক্য আর প্রভুভক্তের দ্বৈত-রূপ বজায় রাখিয়া চলিতে ব্যগ্র। রস ও রসিকের ভাবটি সেখানে সদা বিদ্যমান। প্রভুকে তিনি তাই মিনতি জানান---

নয়না অন্তর আও তুঁ
জ্যোহি নয়নে ঝঁপেউ
নাঁ হৌ দেখোঁ ঔরকু
না তুঝ দেখন দেউ।।
কেরা 'মুঝমেঁ কুছ নহী
জো কুছ হৈ সো তেরা।
তেরা তুঝকো সৌপত,
ক্যা লগ গৈ হৈ মেরা।।

---ওগো প্রভু, আমার নয়নের ভেতরে তুমি এসো। যেমনি তুমি আসবে, অমনি আমি নয়ন ফেল্‌বো মুদে। আর কাউকে আমি দেখতে পাবো না, তোমাকেও দেখতে দেব না কাউকে।---আমার মধ্যে আমার যে কিছুই নেই, যা কিছু রয়েছে তা শুধু তোমারই। তোমার বস্তু তোমায় সঁপে দেব, তাতে আমার কি আসে যায় বল?

প্রিয়-মিলন ও একৈকনিষ্ঠার এ এক পরম কবিত্বময় বাণী, যাহার অনুসরণ চিরকালের ভক্তহৃদয়ে তরঙ্গ না তুলিয়া ছাড়িবে না। সাধক কবীরদাসের স্বপ্ন-মিলনের ছবি তাঁহার জাগর-মিলনের মতই অপরূপ মাধুর্যে মন্ডিত। তিনি কহিতেছেন---

সুপনেমেঁ সাঈ মিলে,
সোওয়ত লিখা জাগায়।
আখি ন খোঁলু ডরপতা,
মত সুপনা হৈ জায়।
সাঈঁকের বহুত গুণ লিখে
জো হিরদে মাহি,
পিউ ন পানী ডরপতা
মত উহই ধোয়ে জাহি।।

অর্থাৎ, স্বপনে মিললো আমার প্রভু। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, তিনি জাগিয়ে নিলেন আমায়। ভয়ে খুলিনে আঁখি পাছে এ স্বপন যায় টুটে। প্রভু আমার গুণময়---সব গুণ তাঁর হৃদয়ে আমার লিখে রাখি। ভয়ে করিনে জল পান,

পাছে হৃদয়ের এ লেখা যায় ধুয়ে।

মরমী সাধকের এই পদ কয়েকটিতে প্রেমকল্পনা ও ভাবাবেগের সহিত কবিত্বরসের অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছে। কবীর তাঁহার সাধনায় দুর্বল ভাবালুতার প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার এ প্রেমের সাধনা আত্মত্যাগদীপ্ত নির্ভীক বৈরাগ্যবান সাধকের সাধনা। 'সুরত' আর 'নিরত' এর কঠোর সাধন নির্দেশ তিনি শিষ্যদের দিয়া গিয়াছেন। তাহাদের কোন আতিশয্য বা দুর্বলতার প্রশ্রয় কোনকালে তাঁহাকে সহ্য করিতে দেখা যায় নাই। শিষ্য হোক বা বাহিরের কোন ভক্ত সাধকই হোক, মিথ্যাচার বা বেশভূষার অনাবশ্যক আড়ম্বর দেখিলেই শাণিত শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা তিনি বিদ্ধ করিতেন। বীর ভক্তদের আহ্বান জানাইয়া কবীর তাঁহার রচিত এক পদে কহিয়াছেন---'ওরে ভাই, যে বীর সাধক সে সংগ্রাম দেখে পলায়ন করবে কেন? যে পলায়ন করে সে তো কখনো বীর হ'তে পারে না। যুঝতে হবে কাম-ক্রোধ লোভ-মোহের সঙ্গে, এ দেহের প্রান্তরে শুরু হ'বে প্রচণ্ড যুদ্ধ। সেখানে সাধকের সঙ্গী হ'ল শীল, সত্য ও সন্তোষ---নামের তরবারি ঝন্‌ঝন্ শব্দে উঠলো বেজে। কবীর বলে, বীর সাধক যদি একবার যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তবে সকল কাপুরুষতা দূর হয় সেখান থেকে।" এ অধ্যাত্ম সংগ্রাম বড় কঠোর, ইহাতে বিরতি নাই, স্বল্পস্থায়ীও মোটেই নয়। এ সংগ্রামের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া বলিতেছেন---

সাধকো খেল তো বিকট বেঁড়া মতী,
সতী ঔর সুরকী চলে আগে।
সুর ঘমসান হৈ পলক দো চারকা',
সতী ঘমসান পল এক লাগৈ।
সাধ সংগ্রাম হৈ
রৈন দিন জুঝনা,
দেহ পরজন্তকা কাম ভাঈ।

অর্থাৎ সাধুদের কর্মের ভেতর রয়েছে অদ্ভুত প্রয়াস, সতী আর বীরের কর্মের চাইতেও তা তীব্রতর। বীর ঘোরতর যুদ্ধ করে দু'চার পলকের জন্য, সতীর যুদ্ধেও লাগে এক পলক। কিন্তু ভাই সাধুর সংগ্রাম চলে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া---যতদিন থাকে দেহ ততদিন দিবারাত্র চলে তাঁর এ সংঘাতময় জীবন।

নির্ভয়ে একান্ত নিষ্ঠায় কবীরদাস এ প্রেমসাধনা চালাইয়া যাইবার পক্ষপাতী। তিনি বলেন, "ভাইরে, স্বামীর সঙ্গে মিলন হওয়া বড় কঠিন কথা! চাতকের মত পিপাসার্ত হয়ে 'প্রিয় প্রিয়' বলে ডাকতে হবে। দিনরাত পিপাসায় প্রাণ ধড়ফড় করছে তবুও ইচ্ছে হয় না জলপানের জন্য। শব্দ শুনে মৃগ ভয় পায় না, ছুটে এগিয়ে গিয়ে দেয় প্রাণ---সতী যেমন আগুন দেখে ভীত না হয়ে হাসিমুখে চিতার উপর উঠে স্বামীর করে অনুগমন। কবীর বলে---হে ভাই সাধু শোন, তেমনি তুমি আপন দেহের আশা ছাড়ো, নির্ভয়ে প্রভুর গুণ গাও, নইলে জন্ম যাবে ব্যর্থতায়।" নিরন্তর সংগ্রাম, কঠোর ত্যাগ ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের মধ্য দিয়া কবীরদাসের প্রেমসাধনার এ অভিযাত্রা। পদে পদে ইহাতে রহিয়াছে দুঃসহ দুঃখ আর বিরহের যন্ত্রণা! প্রেমভক্তি সাধনার এই দুর্গম পথে কবীর যে পাথেয় সঙ্গে নিবার কথা বলিলেন তাহা হইতেছে---নাম, জপ, ভজন এবং সেবা। একনিষ্ঠ সাধনার ফলে এ পথে গুরুকৃপার শক্তি ভক্তজীবনে সঞ্চারিত হয়, নামিয়া আসে দিব্য করুণার ধারা।

কবীরের ভক্তিবাদে রহিয়াছে ভাব-জীবনের সংযম। নিষ্ঠা, বৈরাগ্য ও ত্যাগ-ব্রতের মধ্য দিয়া চলিয়া ইহা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেই বড় করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে। নাথপন্থী যোগীদের প্রভাব তখনও তাঁহার বংশে, বারাণসীর এই জোলা পরিবারে কিছুটা ছিল। ইঁহাদের যোগদর্শন এবং কায়াসাধনের তত্ত্ব কবীরের ভক্তিবাদকে তাই কিছুটা প্রভাবিত না করিয়া পারে নাই। সুফী পীর তক্কিসাহেবের ব্যক্তিত্বের প্রভাবও তাঁহার উপর অনেকাংশে পড়ে। এজন্যই তাঁহার প্রচারিত তত্ত্বে ভক্তি, জ্ঞান ও কঠোর সাধনার সমন্বয় ঘটিতে দেখা যায়।

কবীর তাঁহার মত প্রচার করিয়াছেন স্বরচিত 'সাখী (উপদেশ) এবং 'শব্দ' -এর (সঙ্গীত) মাধ্যমে। সহজ ভাব ও ভাষার জন্য এগুলি জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য হয় এবং সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। তিনি ছিলেন মরমী সাধক ও সিদ্ধপুরুষ, নিজের অনুভূত সত্য ও প্রজ্ঞার আলোক তাই সমাজ জীবনে ছড়াইয়া দিয়া যান! একাধারে সন্ত ও কবিরূপে, সিদ্ধসাধক এবং পতিত অন্ত্যজদের বন্ধুরূপে সর্বত্র তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের অন্তরে এক অসামান্য মর্যাদার আসন তিনি গ্রহণ করেন।

শুধু সমকালীন মানুষেরই অন্তরে নয়, হিন্দি ভাষাার আসরেও কবীরদাসের কবিত্ব তাঁহার সহানুভূতির মাধুর্য ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। সিদ্ধ সাধকের দিব্য জীবনরস এই ভাষার পরতে পরতে ঢালা হইয়াছে, এমন দরদী ও ব্যক্তিসম্পন্ন লেখকের আবির্ভাব হিন্দি ভাষার ক্ষেত্রে এযাবৎ খুব কমই ঘটিয়াছে। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যঞ্জনায় ও মর্মস্পর্শিতা, উপমা ও রূপকের ব্যবহারে শ্লেষ ও ব্যঙ্গের কশাঘাতে কবীরের রচনাগুলি সমুজ্জ্বল।

কবীরের সময়ে এদেশে মুসলমান রাজশক্তি স্থায়ী ও সুদৃঢ় আসন নিয়া বসিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান, প্রাচীন ও নবাগত এই দুই সমাজেই বাহ্য আচারের বড় প্রাবল্য। ভেদ বিসম্বাদের উগ্রতাও ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে। এ সময়ে তিনি তুলিয়া ধরিলেন ধর্মের শাশ্বত রূপটিকে শুরু করিলেন ভক্তিধর্ম ও আন্তর সাধনার কথা।

বাহ্যস্ফোট ও ধর্মীয় জাঁকজমক নিয়া যাহারা ব্যস্ত তাহাদের বিরুদ্ধে কবীরদাসের ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ ক্ষুরধার হইয়া উঠে। তাঁহার আঘাতে পুরোহিত ও মোল্লার দল ভীত হয, আবার তেমনি জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার উদার ভক্তিবাদ ও আশ্বাসবাণী ছড়াইয়া পড়ে। হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের চিত্তে ফুটিয়া উঠিতে থাকে ধর্মের ঐক্যবোধ ও সার্বজনীন আদর্শ। বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠানরত ব্রাহ্মণদের পরিহাস করিয়া কবীর কহেন---

মালা ফেরত জনম গয়া, গয়া ন মনকা ফের।
করকা মালা ছোড়কে মনকা মালা পের।

অর্থাৎ, মালা ফেরাতে ফেরাতে তোমার এই জনম প্রায় কেটে গেল, মনের দ্বিধা সন্দেহ তবুও গেল না। ওগো, এবার থেকে তুমি মনের মালাটি ফেরাও।

সন্ন্যাসী যোগীর সাজে সজ্জিত সাধককে তিনি বিদ্রুপ করেন---

মন না রগাঁয়ে
রগাঁয়ে যোগী কাপড়া।
আসন মড়ি মন্দিরমে বৈঠে,
ব্রহ্ম ছাড়ি পূজন লাগে পথ্‌রা।

অর্থাৎ, রে যোগী, মন না রাঙায়ে রাঙালি কাপড়। আসন ক'রে বস্‌লি এসে মন্দিরে- সেথায় তুই পূজো করলি পাথর।

তেমনি মুসলমান মোল্লাকে উদ্দেশ্য করিয়াও শাণিত শ্লেষ প্রয়োগ করিতে ছাড়েন না।---

না জানৈ সাহব কৈমা হৈ।
মুল্লা হোকর বাংগ জো দেবৈ,
ক্যা তেরা সাহব বহরা হৈ।
কীড়কে পগ নেবর বাজে,
সো ভি সাহব সুন্‌তা হৈ।

অর্থাৎ, ওরে জানিনে তোর প্রভু কিরকম। মোল্লা হয়ে চেঁচিয়ে আজান দিস্--কেন, তোর প্রভু কি বধির? ক্ষুদ্র কীটের পায়ে বাজে যে নূপুর তাও তিনি শুনেন---তা কি তোর জানা নেই?

ধর্ম ও সমাজকে এরূপে আঘাতের পর আঘাত হানিয়া, প্রেম ভক্তির

আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া কবীরদাস এক সহজতর সাধনার পথ সেদিন উন্মুক্ত করিয়া দিতে থাকেন। মন্দির ও মসজিদ, শাস্ত্রাচার ও বাহ্য জীবনের সমস্ত কিছু ভেদ বিভেদ ও গণ্ডীর উর্ধে তাঁহার 'বেড়ুরী' বা সর্ববন্ধনহীন ভক্তিবাদের চেতনাকে জাগ্রত করেন। প্রচলিত সামাজিক অনুশাসনের প্রতি তাঁহার এই তাচ্ছিল্য ও বিরোধীতা তৎকালীন সমাজনেতাদের উত্তেজিত করিয়া তোলে।

বাদশাহ্ ইব্রাহিম লোদীর কাছে অভিযোগ পৌছায়, নব সার্বজনীন ভক্তিধর্মের প্রবর্তক, মুসলমান সাধক কবীর ধর্মের সমস্ত কিছু আনুষ্ঠানিক অঙ্ককে বিদ্রূপ করেন, জনসমক্ষে হেয় করিয়া তুলেন। তাছাড়া দেখা যায়, হজ্ব, মসজিদ, মোল্লা প্রভৃতি কোন কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন না। বাদশাহ্ সেবর জৌনপুরে আসিয়াছেন। এসময়ে তাঁহার দরবারে একদিন কবীরদাসের ডাক পড়িল। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কবীরদাস, তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা বড় গুরুতর। মুসলমান জোলার ঘরে জন্মে তুমি ধর্মের কোন অনুশাসনই মানছো না। তুমি কি ধর্ম পরিত্যাগ করেছো? আসল কথাটি কি, সরলভাবে খুলে বল।" কবীর উত্তর দিলেন, "হুজুর, আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই। আমার দেশ হচ্ছে অমরধাম, সেখানে জাতের বিচার নেই। আমার কাজ হচ্ছে, সে দেশের বার্তা সকলকে জানানো।"

ইব্রাহিম লোদী নীরবে এই সাধকের কথাবার্তা ও আচরণ লক্ষ্য করিতেছেন। সভায় উপবিষ্ট আমীর ওমরাহেরা ইতিমধ্যে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। কি স্পর্ধা এই তুচ্ছ জোলার! একটি অমাত্য আর ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না। তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "চুপ করো কবীরদাস। তোমার দুঃসাহস কিন্তু সকলেরই সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। বাদশাহের মুখের উপর এ কথাগুলো বলতে তোমার একটুও ভয় হচ্ছে না।"
কবীর একবারে অকুতোভয়। স্মিত হাস্যে কহিলেন---

কবীর কাঁহাকো ডরে, শিরপর সৃজনহার।
হস্তী চঢ়ী ডরিয়ে নহী, কুতিয়া ভুজে হাজার।

"অর্থাৎ কবীর কাউকেই করে না ভয়, শিরের উপর তার রয়েছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। আচ্ছা বলুন তো, 'হাতিতে চড়ে যে যাচ্ছে, কুকুরের ঘেউ ঘেউ রব তার কি করবে?"

বাদশাহ্ যেমন বুদ্ধিমান তেমনি উন্নতমনা। সাধক কবীরদাসের অবস্থাটি বুঝিয়া নিতে তাঁহার দেরী হইল না। সভাসদদের উত্তেজনা থামাইয়া তাঁহাকে তিনি সসম্মানে বিদায় করিয়া দিলেন। তিনি বুঝিয়া নিয়াছিলেন, এই সিদ্ধপুরুষকে রাজশক্তি নিয়ন্ত্রণ করা সঙ্গত নয়, সম্ভবও নয়।

রক্ষণশীল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কবীরের আদর্শ তেমন সমাদর লাভ করে নাই, কিন্তু জনসাধারণের মর্মে উদার ভাবধারা প্রবেশ করিয়াছিল। সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের মরমিয়া সাধক ও সংস্কারপন্থী ধর্মনেতাদের উপর তাঁহার জীবন ও বাণীর প্রভাব দীর্ঘদিন ব্যাপিয়া দেখা গিয়াছে।

উত্তরকালের মরমিয়া সিদ্ধসাধক, দাদু ছিলেন কবীরেরই এক প্রশিষ্য। তাছাড়া আরও দেখি, কবীরের ভক্তি ও প্রেমের বাণী, সাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় রচিত পদ সমূহ পরবর্তীকালে তুলসী দাসের প্রচার পদ্ধতিকেও প্রভাবিত করে। ভক্তকবি রইদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতি কবীরের 'সাখি' ও 'শব্দ' শ্রবণ করিয়া অশ্রুজলে সিক্ত হইতেন।

গুরু নানক তাঁহার কাশী পরিক্রমার সময়ে কবীরের দোঁহা ও ভজন সঙ্গীতগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁহার ধর্মোপদেশের অনেক জায়গায় কবীরের বাণীর ছায়া পড়িতে দেখা যায়। পবিত্র গ্রন্থসাহিবের নানাস্থানে ইহার সন্ধান মিলে।

হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের যে সমন্বয় আদর্শ কবীরদাস প্রচার করিতেন নানকের প্রচারিত তত্ত্বের উপর তাঁহার ছায়া কম পড়ে নাই।

অযোধ্যার জগজীবনদাস, মালবের বাবালাল, গাজীপুরের শিবনারায়ণ, আলোয়ারের চরণদাস, প্রভৃতি সাধক সম্প্রদায়ের জীবনে কবীরের আদর্শ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাঁহার মতবাদ উত্তর ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূর করিতেও সে সময়ে কম সাহায্য করে নাই। কাশীর গোঁড়া মুসলমান ও রাজপ্রতিনিধিরা ইহাদের সংস্কারপন্থী ধর্মমতকে কোনদিনই সুচক্ষে দেখিতেন না। ইহাদের আক্রোশে ও বিরোধিতায় কবীর উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার উপর রহিয়াছে অগণিত ভক্ত দর্শনার্থীর ভীড়। নির্জনতা প্রয়াসী কবীর এবার তাই বারাণসী ত্যাগ করিয়া চলিলেন। প্রথমে ফতেপুর জেলার গঙ্গাতীরস্থ মানিকপুরে তিনি সাধনভজন করিতে থাকেন। ইহার পর কিছুকাল অবস্থান করেন এলাহাবাদের অপর তীরে ঝুঁসির চরায়। এইখানে সুফী সিদ্ধ ফকীর তক্কী সাহেবের সহিত কবীরদাসের সাক্ষাৎ ঘটে। ইহার নিকট নানা নিগূঢ় সাধন লাভ করিয়া তিনি উপকৃত হন।

কবীরের সাধনজীবন এবার পূর্ণ পরিণতির দিকে আগাইয়া আসিতেছে। তিনি বুঝিতেছেন, এ মরদেহ এবার ছাড়িতে হইবে। প্রাণ মন তাঁহার সদাই চায় ইষ্টধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতে আর আত্মাবগাহন করিতে। গোরখ্‌পুর জেলার মগহর-এ একান্তে বাসের জন্য তিনি রওনা হইলেন। ভক্ত ও অনুরাগীর দল তাঁহাকে পবিত্র ভূমি কাশীতে ফিরাইয়া নিতে ব্যকুল, এ দেহ যদি তাঁহাকে ত্যাগ করিতেই হয় কাশী ছাড়িয়া মগহর-এ যাওয়া কেন? বারবার তাঁহারা অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন!
কবীর কিন্তু স্থিরসঙ্কল্প, শুভার্থী বন্ধু ও ভক্তদের উদ্দেশ করিয়া স্মিত হাস্যে কহিলেন---

জস্ কাশী তস্ মগহর ঊষর
হিরদৈ রাম সতি হোঈরে।

অর্থাৎ, কাশী আর মগহর দুই-ই ঊষর---পরম সত্য বস্তু হচ্ছেন হৃদয়স্থিত রাম। কাজেই মগহর-এ বাস করিতে যাওয়ায় তাঁহার তো ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নাই।

শত শত শিষ্য ও অনুরাগীর দল এই সময়ে ভক্ত কবীরদাসের সঙ্গ নেয়, তাঁহার সাথে সেখানেই অবস্থান করিতে থাকে। আর এদিকে কাশীর ভক্তদের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠে। মগহর-এর এক প্রান্ত দিয়া বহিয়া চলিয়াছে স্নিগ্ধ; স্বচ্ছতোয়া অমী নদী ইহারই তীরে অরণ্য অঞ্চলে এক প্রাচীন সাধুর পরিত্যক্ত পুরাতন কুটির পাওয়া গেল। বৈরাগী কবীর দাস এই ভগ্ন কুটিরটিতেই আসন বিছাইয়া বসিলেন। পরম লগ্নটি ক্রমে আসিয়া পড়িতেছে, প্রেমভক্তির রস-সমুদ্রে মহাসাধক একবার ভাসিতেছেন আবার ডুবিতেছেন। প্রাণ প্রভুর রসে তিনি হইয়া উঠিয়াছেন রসায়িত! শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁহার পবিত্র সন্নিধ্যের জন্য, উপদেশামৃতের জন্য শয্যার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান। কিন্তু প্রেমমত্ত সিদ্ধপুরুষের কোথায় অবসর? হুঁশই বা কোথায়?

চরখা চলৈ সুরত বিরহিনকা
কায়া নগরী বনী অতি সুন্দর
মহল বনা চেতনাকা।
সুরত ভাঁবরী হোত গগনমে'
পীঢ়া জ্ঞান রতনকা।
মিহীন সূত বিরহিন কাতৈঁ,
মাঁঝা প্রেম-ভকতিকা।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো,
মালা গূথোঁ দিন রৈনকা।
পিয়া মোর ঐহৈঁ পগা রখিহৈঁ
আঁসু ভঁট দেহোঁ নৈনকা।

---সুরতি বিরহিনীর চরখা চলছে। কায়ানগরী রচিত হয়েছে অতি সুন্দর, তাতে রয়েছে চেতনার মহল। গগনে, অর্থাৎ, সহস্রারে সুরতিরূপী বধূ

ও বরের চলছে অগ্নি-প্রদক্ষিণ---আর তাদের জন্য রাখা হয়েছে জ্ঞান-রতনের পিঁড়ি। বিরহিনী কেটে চলেছে মিহি সূতো, পরেছে প্রেমভক্তির হলুদরঙা বিয়ের শাড়ী। কবীর বলছে, ভাই সাধু শোন, ঐ সূতো দিয়ে দিন আর রাতের মালাগাছা তৈরী ক'রে ফেল। প্রিয় আমার করবেন পদার্পণ, অশ্রুজলে দেব তাঁকে আমার প্রেমের ভেট।

বিরহসন্তপ্ত কবীরদাসের হৃদয়ে এক একদিন পরমপ্রভুর এই বহু প্রতিক্ষিত পদার্পণ ঘটে। মিলনের আনন্দে সিদ্ধ সাধক বিভোর হইয়া উঠেন, এ আনন্দ বিচ্ছুরিত হয় অণুপরমাণুতে আর সর্বসত্তায়। বড় সহজ, বড় স্বচ্ছন্দ তাঁহার এই দিব্য মধুর অনুভূতি ও আনন্দঅবগাহন। কবীর ইহাকে বলিয়াছেন সহজ সমাধি---

আঁখ ন মূঁদূ কান না রূঁধূ,
কায়া কষ্ট ন ধারূ।
খুলে নৈন মেঁ হঁস দেখুঁ।
সুন্দর রূপ নিহারূ।
কহূঁ সে নাম সুনূ সো সুমিরন
জো কছু করূঁ সো পূজা!
গিরহ-উদ্যান এক সব দেখুঁ,
ভাব মিটাউ দূজা,
জহঁ জহঁ জাঁউ সোঈ পরিকরমা,
জো কছু করূ, সো সেবা।
জব সোউ, তব করূ দণ্ডবত,
পূজু ঔর ন দেবা।।

অর্থাৎ, এ অবস্থায় আমি আঁখি মুদিনে, কান করিনে রুদ্ধ, দেহকে কষ্ট দিইনে। স্মিত হাস্যে নয়ন মেলে আমি তাকাই, সুন্দর সে রূপ করি নিরীক্ষণ। যা বলি তা-ই হয়ে যায় নাম, যা শুনি তাই হয় তাঁর স্মরণ, যা কিছু করি কাজ তাই হয় তাঁর পূজো। গৃহ আর উদ্যান আমি দেখি, দ্বৈতভাব দিই মিটিয়ে। যেখানে যেখানে যাই, তাই হয় আমার প্রভুর পরিক্রমা, যা কিছু করি তাই হয় তাঁর সেবা। শয়ন হয়ে ওঠে আমার দণ্ডবৎ---দেবতার পূজা করা তো আর হয়ে ওঠে না।

এই সহজ সমাধি, এই দিব্য সুরতির মধ্য দিয়াই পরম প্রাপ্তির মহালগ্নটি একদিন ঘনাইয়া আসে। কবীরদাস ব্রহ্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়েন---'হংস পায় মানস সরোবর'।

অমী নদীর তটে ক্ষুদ্র কুটিরটিতে ভক্তেরা কবীরকে ঘিরিয়া বসেন। ভক্ত-ভগবানের মিলনের আনন্দবার্তা শুনিতে সকলে আগ্রহে অধীর। দুই একটি কথা যদি বা সংগ্রহ করা যায়, তাহাই যে হইবে তাঁহাদের সাধন-জীবনের পরম পাথেয়। শত শত 'সাখী' ও 'শব্দের' যিনি রচয়িতা, প্রেম ও ভক্তিসঙ্গীতের রসে এতকাল সিক্ত করিয়াছেন আপামর জনসাধারণকে, আজ তিনি মৌনের গভীরে প্রবিষ্ট আত্মসমাহিত। ভক্তেরা বাণীর জন্য আনুনয় বিনয় করিলে বলিলেন--

কবীর জম হম গাওয়াতে
তম ব্রহ্ম জানা নহী।
অব ব্রহ্ম দিলমে দেখা,
গাওন কু কছু নহী।

অর্থাৎ, আমি কবীর যখন পরম প্রভুর স্তবগান করতাম তখন ব্রহ্মের তত্ত্ব কিছু ছিল না জানা। এখন আমি ব্রহ্মকে করেছি দর্শন হৃদয়পটে, গান করার তাই আর তো কিছুই নেই!

সাধকভক্তেরা ছাড়েন না, মিনতি করিয়া বলেন, "যে প্রভুর সাথে আনন্দে রসে এতদিন কাটিয়েছেন, শেষের দিনে তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলুন আমরা শুনি।"

প্রাণপ্রভুর স্বরূপের বর্ণনা? সে কি? সে যে এক অসম্ভব কথা। কবীরদাস তাই শুধু কহিলেন---

কহনা থা সো কহ দিয়া,
অব কুছ কহা ন জায়।
একা রহা দুজা গয়া,
দরিয়া লহর সমায়
উনমুনিসোঁ মন লাগিয়া,
গগনহিঁ পহুচা আয়।
চাঁদ-বিহুনা চাঁদনা
অলখ নিরঞ্জন রায়।।

অর্থাৎ, আমার বলার যা কিছু ছিল তা তো দিয়েছি ব'লে---এখন আর তো কিছু যাবে না বলা। দুই চলে গিয়ে রয়েছে---এক, নদী এবার প্রবেশ করেছে সাগরে। সমাধিতে মগ্ন হয়েছে মন---পৌঁছে গিয়েছে গগনের মহাশুন্যে। চাঁদবিহীন চাঁদনী---অখণ্ড মহাজ্যোতি রয়েছে বিরাজিত। ওরে এই তো আমার প্রভু অলখ নিরঞ্জন!

জীবনের শেষ অধ্যায়টি এবার সমাপ্ত হইয়া আসিল। অন্তরঙ্গ ভক্তদের ক্রন্দনোচ্ছ্বাসের মধ্যে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কবীরদাস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সহস্র সহস্র শোকার্ত শিষ্য ও ভক্তের সমাগমে মগহর এর নদীতট সেদিন জনপূর্ণ হইয়া উঠে, মহাপুরুষের উদ্দেশে তাহাদের অন্তরের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়।

কবীরদাসের দেহের সৎকার সম্বন্ধে এক কিম্বদন্তী শোনা যায়। তাঁহার ভক্তদের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই সংখ্যা ছিল যথেষ্ট। হিন্দুরা এ দেহের অগ্নি সংস্কার করিতে চান, কিন্তু মুসলমানেরা সম্মত নন, কবর দিবার জন্যে তাঁহারা কোমর বাঁধেন।

এই আসন্ন সংঘাতের মুখে সিদ্ধপুরুষ কবীরদাসের অলৌকিক বাণী শোনা যায়। শুভ্র বস্ত্রখন্ডে মৃত দেহটি ঢাকা রহিয়াছে, প্রত্যাদেশ অনুযায়ী আচ্ছাদন খুলিয়া দেখা গেল, দেহটি অন্তর্হিত হইয়াছে, পড়িয়া আছে একরাশ পদ্মফুল।

কথিত আছে, হিন্দুরা কিছু সংখ্যক ফুল কাশীতে নিয়া যান, এগুলি সেখানে যথারীতি সৎকার করেন। আজিও সেখানকার কবীরচৌরায় তাঁহার স্মৃতিমন্দির দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

মুসলমান ভক্তেরা অবশিষ্ট ফুলগুলি মগহর-এ কবরস্থ করিলেন। এই সমাধি স্থানটি উত্তরকালে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তদের এক পবিত্র তীর্থরূপে পরিচিত হইয়া ওঠে। আজিও শত শত ভক্তসাধক কবীরদাসের এই পবিত্র সমাধিমন্দির দর্শন করিতে আসে ও দণ্ডবৎ করিয়া কৃতার্থ হয়।

"Misfortune is the best fortune. Rejection by all is victory."

— Valmiki

শ্রীশ্রীলোকনাথ-জীবনীর অলৌকিকত্ব বা অলৌকিক জীবনী-প্রসঙ্গ

কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত

(শ্রী শ্রী লোকনাথ-মাহাত্ম্য বই থেকে সংকলিত)

বাবা লোকনাথের জীবনীর ঘটনাবলীতে কিরূপ মহত্ত ও জগতের ভাবী মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে, তাহা যদি আমরা ধরিতে চেষ্টা করিতে পারি--সম্প্রদায়-নির্বিশেষে, ধর্ম-নির্বিশেষে ও জাতি-নির্বিশেষে জগন্মঙ্গলার্থ আত্মোৎসর্গ করিতে হইলে যে সমস্ত অপার্থিব উপকরণের প্রয়োজন, সেই সমস্ত উপকরণ কি কি অলৌকিক উপায়ে মহাপুরুষ উপার্জন করিয়াছিলেন, যদি তাহা আমরা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তবেই মহাপুরুষ-চরিতের আলোচনা সার্থক হয়, ইহা আমার বিশ্বাস। তবে একথা স্বীকার্য যে, মহাপুরুষ-চরিতের সমস্তই অমৃতময়, কিন্তু সেরূপ অমৃতের আস্বাদ ভক্তগণকে দিতে আমি নিজে অনধিকারী, সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি। গুরুদেবের স্বহস্তলিখিত পুস্তকে অবশ্য কিছু কিছু আছে, কিন্তু তাহা সামান্য এবং তাহা তিনি নিজে শুনিয়াছেন বলিয়াই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, লোকনাথের বাহ্য-জীবনীর আলোচনা করা গুরুদেবের মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না। সে উদ্দেশ্য থাকিলে, তিনি তাঁহার নিকট হইতে, যত দূর সম্ভব, জানিয়া লইতে পারিতেন। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন যে, যে ব্যক্তির আম্রফল খাইতে বাসনা, তাঁহার আম্রেরই প্রয়োজন; সুতরাং, যে ব্যক্তি মহাপুরুষের মহামহিমাময় অলৌকিক পরমতত্ত্বে ডুবিতে গিয়াছেন, তিনি কেন তাঁহার বাহ্য-জীবনের মাধুর্যে আত্মহারা হইবেন? তথাপি আমরা সংক্ষেপে বাবা লোকনাথের বাহ্য-জীবনী লিপিবদ্ধ করিব।

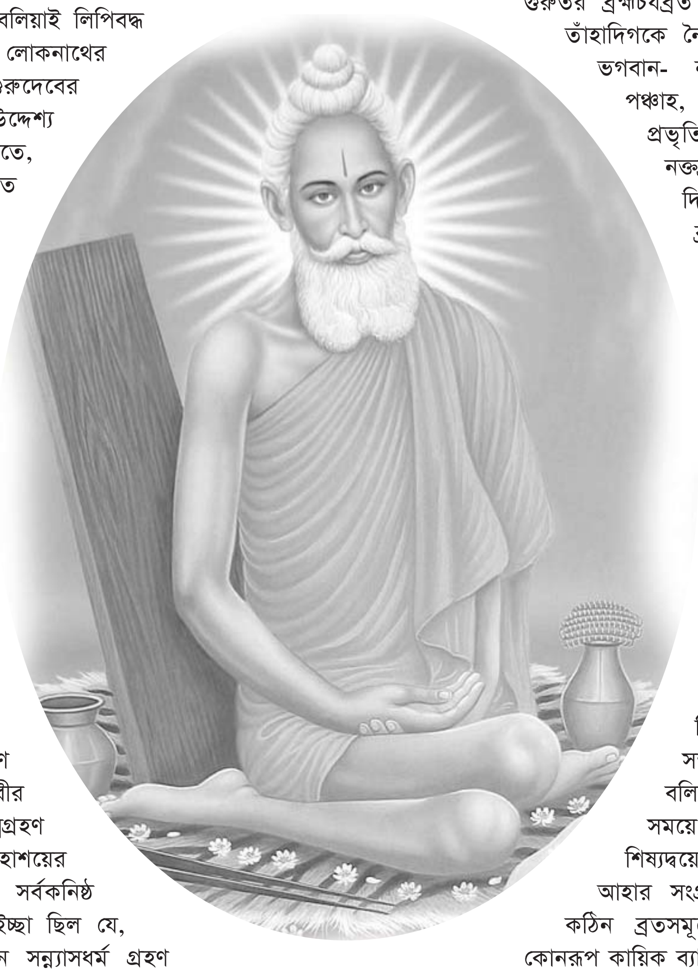

বাবা লোকনাথ চব্বিশ পরগনার অধীন বারাসত সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত চৌরাশী চাকলা গ্রামে রামনারায়ণ ঘোষালের ঔরসে, কমলাদেবীর গর্ভে, বাঙ্গালা ১১৩৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন। রামনারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের চারি পুত্র ছিল; লোকনাথ সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। লোকনাথের পিতার ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার পুত্রদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ এবং ভগবানের নাম কীর্তন করিয়া বংশের পবিত্রতা সম্পাদন করে। লোকনাথ জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহার পিতা তাঁহাকেই সন্ন্যাসব্রত প্রদানের ইচ্ছা করেন। ঐ সময়ে, ভগবান গাঙ্গুলী নামে এক সর্বশাস্ত্রপারদর্শী মহাজ্ঞানী পন্ডিত ঐ দেশে বর্তমান ছিলেন। লোকনাথের পিতার ইচ্ছানুসারে ভগবানই লোকনাথের উপনয়ন-ক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক তাঁহাকে লইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে অভিলাষী হন। একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, ১১৪৮ সালে, লোকনাথের উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদিত হয়। উপনয়নের পর, ঐ দন্ডীর বেশেই লোকনাথ আচার্য গুরু ভগবানের সঙ্গে বনবাসী হন। ঐ সময়ে বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নামক লোকনাথের সমবয়স্ক অপর এক ব্যক্তিও তাঁহাদের সহগামী হন।

লোকনাথ উপনয়নের পূর্ব পর্যন্ত কোনরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাই। ভগবান--লোকনাথ ও বেণীমাধবকে লইয়া কোনরূপ লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই। তৎপরিবর্তে তিনি শিষ্যদিগকে গুরুতর ব্রহ্মচর্যব্রত অভ্যাস করাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী করিবার জন্য, ভগবান- নক্তব্রত, একান্তরা, ত্রিরাত্র, পঞ্চাহ, নবরাত্র, দ্বাদশাহ ও মাসাহ প্রভৃতি ব্রত উদযাপন করাইয়াছিলেন। নক্তব্রতানুষ্ঠানে ব্রহ্মচারীকে দিবাতে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে ব্রহ্মচর্যোপযোগী আহার করিতে হয়; একান্তরাতে অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পরদিন আহার করিতে হয়; ত্রিরাত্র ব্রতে তিন অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া চতুর্থ দিবসে আহার করিতে হয়। এইরূপে যথাক্রমে ব্রতসমূহ উদযাপন করিয়া, মাসাহব্রতে সম্পূর্ণ একমাস উপবাসী থাকিয়া, মাসান্তে আহার করিতে হইত। লোকনাথ দুইবার এই মাসাহব্রত পালন করিয়াছিলেন; কিন্তু বেণীমাধব দ্বিতীয়বার এই ব্রতের অনুষ্ঠানে সক্ষম হন নাই। লোকনাথ বলিয়াছিলেন যে, এই ব্রহ্মচর্য-শিক্ষা-সময়ে, ভগবান ভিক্ষা করিয়া প্রিয় শিষ্যদ্বয়ের এবং নিজের ব্রহ্মচর্যোপযোগী আহার সংগ্রহ করিতেন; এবং উপযুক্ত কঠিন ব্রতসমূহের অনুষ্ঠাকালে শিষ্যদ্বয়কে কোনরূপ কায়িক ব্যাপারের পরিশ্রম স্বীকার করিতে দিতেন না। এমন কি, মলমূত্রত্যাগ সময়েও তাঁহাদিগকে কোনরূপ অঙ্গ-সঞ্চালন করিতে দিতেন না। তিনি স্বয়ং তাঁহাদের শৌচকর্ম পর্যন্ত সম্পাদন করাইয়া দিতেন,আশঙ্কা, পাছে অঙ্গসঞ্চালনাদি দ্বারা

ক্লান্ত হইলে শিষ্যদ্বয়ের উপবাসের ব্যাঘাত ঘটে। লোকনাথ এই কঠোর ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করিবার সময়ে, একদিন ভগবানের নিকট লেখাপড়া শিক্ষার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে ভগবান বলিয়াছিলেন যে, "তোমাদের পক্ষে লেখাপড়া শিখিবার ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। তোমাদিগকে যে বিদ্যা শিক্ষা দিতেছি, তৎপ্রভাবেই তোমাদের অনন্ত শাস্ত্রজ্ঞান জন্মিবে এবং আমার প্রতি তোমাদের যে অসীম নির্ভরতা আছে, তাহাতে আমার সমস্ত বিদ্যা, বিনা অধ্যয়নে তোমাদের মধ্যে অণুরনিত হইবে।"

লোকনাথের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের পর, ভগবান দ্বাদশ বর্ষ লোকনাথকে তীর্থাদি পরিদর্শন করাইয়া, তাঁহাকে স্বীয় জন্মভূমিতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন; এবং ভগবান তাঁহাকে ছয়মাসকাল স্বদেশে রাখিয়াছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে লোকনাথের সঙ্গে তাঁহার স্বগ্রামস্থ একটি ব্রাহ্মণকন্যার অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। লোকনাথ যখন দ্বাদশ বর্ষ পরে বাড়িতে আসিলেন, তৎকালে ঐ ব্রাহ্মণ-কন্যা বালবিধবারূপে ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছিলেন। লোকনাথ গৃহে আসিলে ঐ বাল্যসুহৃৎদ্বয়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল। যখন লোকনাথ পুনরায় গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য ভগবানকে অনুরোধ করেন, তখন ভগবান তাঁহাকে আরও কিছুকাল তথায় অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। লোকনাথ ইহাতে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হওয়ায়, ভগবান এবার জন্মের মত লোকনাথকে লইয়া তাঁহার জন্মভূমি হইতে বহির্গত হন। বিদায়গ্রহণের সময় ঐ ব্রাহ্মণ-কন্যা লোকনাথের সহচারিণী হইবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু লোকনাথ তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্মের কঠোরতা ও বিভীষিকা বুঝাইয়া দিয়া ঐ সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। ভগবান লোকনাথকে ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ মনঃসংযমের উপায় এবং কঠোর তপশ্চর্যা অভ্যাস করাইয়াছিলেন। লোকনাথ বলিয়াছেন, যাহাতে তাঁদের মনঃসংযমের কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে, তজ্জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন; এবং যাহাতে সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও, তাঁদের মনঃসংযমের অক্ষুন্নতা সম্পাদিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে, কখনও বা নানা প্রকার কীট-পতঙ্গ-সমাকুল বন-প্রদেশে, কখনও বা জনকোলাহলশূন্য মহাবিজনবনে লোকনাথ ও বেণীমাধবকে লইয়া বাস করিতেন। এই প্রকারে শিষ্যদ্বয়ের মনঃসংযম সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইলে, তাঁহাদিগকে লইয়া মহাজ্ঞানী ভগবান তুষারাবৃত হিমালয়ে গমন করেন। তথায় লোকনাথ বহু বৎসর কঠোর যোগসাধনায় মগ্ন থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করেন।

এই সময়ে লোকনাথের বয়স প্রায় ৯০ বৎসর এবং ভগবানের ১৫০ বৎসর হইয়াছিল। লোকনাথ সিদ্ধিলাভের পর, গুরুর অবস্থা দর্শন করিয়া, কাতর প্রাণে ক্রন্দন করিয়াছিলেন; এবং ভগবানকে বলিয়াছিলেন, **"গুরুদেব, আপনি অসীম কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, কিন্তু আপনাকে এখনও পূর্বাবস্থাপন্ন দেখিয়া আমি ধৈর্যধারণ করিতে পারিতেছি না।"** ভগবান- লোকনাথের এই অপার সিদ্ধিলাভের বিষয় অবগত হইয়া বলিলেন, "আমি চিরকালই জ্ঞানমার্গাবলম্বী, সুতরাং কর্মমার্গাবলম্বন পূর্বক সিদ্ধিলাভের জন্য কখনও চেষ্টা করি নাই। এখন কর্মমার্গে এই অপার সিদ্ধিলাভ প্রত্যক্ষ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। **"আমি শীঘ্রই আমার দেহপাত করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিব, তখন তুমি কর্মমার্গ চালাইয়া আমার উদ্ধারের উপায় বিধান করিও।"**

তৎপর ভগবান- লোকনাথ ও বেণীমাধবকে লইয়া কাশীধামে উপস্থিত হন, এবং তথায় হিতলাল মিশ্র নামক এক সিদ্ধ মহাপুরুষের হস্তে শিষ্যদ্বয়কে সমর্পণ করিয়া, নিজে মণিকর্ণিকার ঘাটে যোগাসনে বসিয়া দেহত্যাগ করেন।

উপযুক্ত কঠোর তপশ্চর্যাসময়েই লোকনাথ জাতিস্মরতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে অলৌকিক, পূর্ণ ঐশী-শক্তি ও সিদ্ধিসমূহ লইয়া তিনি নিম্নভূমিতে আগমন করিয়া জনপদবাসিগণকে কৃতার্থ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ের ইতিহাস কিছুই জানা নাই। কারণ ঐ সকল বক্তব্য নহে। আমরা স্থানান্তরে ঐ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিব।

গুরু ভগবানের লীলাসম্বরণের পর হইতে লোকনাথের বারদীতে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কেবলমাত্র তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে দুই-এক কথা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। লোকনাথ কাবুলে যাইয়া মোল্লাসাদীর বাড়িতে গুরু ভগবানসহ কোরান শিক্ষা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ লোকনাথের সিদ্ধিলাভের পরেই, গুরু ভগবান শিষ্যদ্বয়কে লইয়া কাবুলে গমন করেন এবং তথায় কোরান শিক্ষা করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে কাশীধামে চলিয়া যান এবং তথায় নিজে লীলা সম্বরণ করেন। এই অনুমানের কারণ আমরা একটু পরে আলোচনা করিব।

গুরু ভগবানের দেহত্যাগের পরেই লোকনাথ পদব্রজে মক্কায় গমন করেন। লোকনাথ তিনবারই হাঁটিয়া মক্কায় গমন করিয়াছিলেন। তথায় আবদুল গফুর নামে ৪০০ বৎসর বয়স্ক এক যোগীপুরুষের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উক্ত মহাপুরুষ লোকনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কে?" লোকনাথ উত্তর করিলেন, "আমি কে তাহা তোমার নিকট জানতে এসেছি।" মহাপুরুষ এই উত্তর শুনিয়া এত প্রীত ও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন যে, লোকনাথকে অতি স্নেহভরে নিজের বক্ষস্থলে টানিয়া লইয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। আবদুল গফুর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ক'দিনের লোক?" লোকনাথ উত্তর করিলেন, "আমি দুই দিনের লোক।" অর্থাৎ আমি দুই জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারি। আবদুল গফুর বলিয়াছিলেন যে, "তিনি চারিদিনের লোক" অর্থাৎ তিনি চারি জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারেন। লোকনাথ বারদী আসিয়া প্রসঙ্গক্রমে একদিন বলিয়াছিলেন যে, তিনি এত পাহাড়-পর্বত ভ্রমণ করিয়াও মাত্র ২ জন বৈ ব্রাহ্মণ দেখেন নাই। একজন "আবদুল গফুর" অপরজন "ত্রৈলঙ্গস্বামী"। লোকনাথের মক্কা থাকার সময়ে তথাকার মুসলমানগণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন এবং তাঁহারা আপন আপন মুখ বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া লোকনাথের জন্য আহার্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন, লোকনাথ তাহা স্বচ্ছন্দে ভোজন করিতেন।

পশ্চিমদেশে ভ্রমণকালে হিতলাল মিশ্র ও বেণীমাধব লোকনাথের সঙ্গেই ছিলেন। তবে, সময়ে সময়ে মহাপুরুষগণ পরস্পর পৃথক হইতে পারেন; কিন্তু কার্যকালে যে আবার সকলে একত্র হইয়াছেন, তাহা নিশ্চয়। লোকনাথ আরবদেশ পরিত্যাগপূর্বক অপর মহাপুরুষদ্বয় সহ পশ্চিমদিকে অস্তাচলের দিকে গমন করেন। এবং আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত গমন করিয়া পুনরায় হিমালয়ে ফিরিয়া আসেন। ঐ সময় তাঁহাদের উত্তরদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা হয়, কিন্তু কিছুদিন তুষারাবৃত হিমালয়-শিখরে অবস্থান করেন। এস্থলে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, মহাপুরুষগণ হিমালয়ে অবস্থান করিয়া স্ব স্ব শরীর হিমালয় প্রদেশে গমনের উপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। আমরা লোকনাথ সম্বন্ধে এই অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করি। পাতঞ্জলোক্ত যোগে সিদ্ধিলাভ করিলে শরীর স্বতঃই শীতসহিষ্ণু হয়। এই সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিব। তবে লোকনাথের সঙ্গী বেণীমাধবের এই অনুমান প্রযোজ্য কি না বলিতে পারে না। হইতে পারে যে, লোকনাথের কোন সঙ্গীর শরীরের অপরিপক্বতাহেতু মাহাপুরুষগণ সকলেই তাঁহার জন্য হিমাচলে বিলম্ব করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তৎপর তিনজনে সুমেরু পর্বত দর্শন-মানসে ক্রমশঃ উত্তরদিকে ভ্রমণ করিতে থাকেন। মহাপুরুষত্রয় উলঙ্গ ছিলেন। বহুদিন হিমালয় প্রদেশে থাকাহেতু তাঁহাদের শরীর শ্বেতবর্ণ হইয় গিয়াছিল। বস্তুতঃ এই সময়ে তাঁহাদের অপরূপ কান্তি দর্শন করিলে কেহই তাঁহাদিগকে মানুষ বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারিত না। মহাপুরুষগণের শ্বেতবর্ণ সুদীর্ঘ দেহযষ্টি, আজানুলম্বিত বাহুযুগল, শ্বেত রক্ত, সুদীর্ঘ জটাকলাপ, ভাস্করসদৃশ প্রদীপ্ত নয়নযুগল এবং তদুপরি দেহের অলৌকিক জ্যোতিরাশি দেখিলে তাঁহাদিগকে এক অতি পুরাতন অপার্থিব দেশের অভিনব জীব বলিয়া প্রতীয়মান হইত। এই সময়ে মহাপুরুষগণ দিব্যদেহ লাভ করিয়াছিলেন; অদ্ভুত দৈবপ্রভায় সকলেরই

দেহ দেবময় হইয়া গিয়াছিল। যাঁহারা বারদীতে মহাপুরুষকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য মহাপুরুষের এই অপরূপ দেহকান্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

লোকনাথ সুমেরুর দিকে গমন করিতে করিতে বর্তমানে পৃথিবীর পরিজ্ঞাত উত্তরসীমা অর্থাৎ উত্তরমেরু অতিক্রমপূর্বক বহুসহস্র মাইল উত্তরে গমন করিয়াছিলেন, ঐরূপ প্রদেশে যাতায়াতে মহাপুরুষগণ প্রায় ২০ বৎসর ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ প্রদেশ সর্বদা তমসাচ্ছন্ন ও তুষারবৃত থাকিত, মহাপুরুষগণ ঐ তমোময় প্রদেশেও দিবালোকর ন্যায় চক্ষে দেখিতেন। লোকনাথ বলিয়াছিলেন যে, হিমালয়-পর্বত-শিখরে অবস্থান কালে তিনি ফল ও কন্দমূল খাইয়া থাকিতেন। শরীরের উপর বরফ জমিয়া পুনরায় জল হইয়া যাইত। সেই সময় শরীরে রক্ত ছিল না বলিলেই হয়। তাঁহার পায়ের "নালায়" একটি চিহ্ন দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি ঐ স্থানে একটু ক্ষত করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ঐ স্থান হইতে রক্তের পরিবর্তে ঈষৎ লাল আঠার ন্যায় এক রকম পদার্থ বাহির হইয়াছিল। হিমালয় প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহারা উদয়াচল দর্শন-মানসে পূর্বাভিমুখে গমন করিতে করিতে চীনদেশে উপস্থিত হন। ঐ স্থানে চীনরাজ কর্মচারিগণ তাঁহাদিগকে অতি অদ্ভুত ও অভিনব জীব মনে করিয়া আবদ্ধ করেন। অবশেষে যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, ইহারা ভারতবাসী মহাপুরুষ- বহুদিন হিমময় দেশে অবস্থান হেতু শরীর বরফাকার হইয়া গিয়াছে- তখন তাঁহারা মহাপুরুষগণকে ছাড়িয়া দেন। ঐ সময় হিতলাল লোকনাথকে বলিলেন, "তোমার নিম্নভূমিতে কার্য রহিয়াছে সুতরাং তুমি আর আমাদের সঙ্গে না আসিয়া তথায় যাও।"

লোকনাথ ইহার পর ভ্রমণ করিতে করিতে পূর্ববঙ্গে আগমন করিয়া চন্দ্রশেখর পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং তথা হইতে ক্রমে ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত দাউদকান্দি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ সময়ে ঢাকা জিলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ সাব- ডিভিসনের অধীন বারদীনিবাসী ডেঙ্গু নামক জনৈক কর্মকার বিষয়- কর্মোপলক্ষে দাউদকান্দি বাস করিত। সে এক দিবস এক বৃক্ষের নীচে উলঙ্গ মহাপুরুষকে দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন করে। মহাপুরুষের আকৃতি দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে ভক্তির সঞ্চার হয়, এবং ঐ কর্মকার যত্নসহকারে মহাপুরুষকে স্বগ্রামে (বারদী) আনয়ন করে।

আজ প্রায় ২০ বৎসর অতীত হইল, একদিন গুরুদেবের আশ্রমে বসিয়া শুনিয়াছিলাম যে, যে সময় লোকনাথ উলঙ্গাবস্থায় দাউদকান্দিতে ছিলেন, ঐ সময় উক্ত ডেঙ্গু কর্মকার এক ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামী ছিল। সে নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় ঐ মহাপুরুষকে তথায় দেখিতে পাইয়া, তাঁহার নিকট গমন করিয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণনা করিয়া মহাপুরুষের কৃপাপ্রার্থী হয়। মহাপুরুষ তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া বলিয়া দেন, "যা, তুই যাওয়া মাত্রই খালাস হবি।" ডেঙ্গু কর্মকার ঐ মোকদ্দমায় অব্যাহতি লাভ করায়, বাবা লোকনাথকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ স্থির করিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হয়; এবং তাঁহার সঙ্গে বারদী গ্রামে আসিবার জন্য তাঁহার নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করে। মহাপুরুষ তাঁহার কথায় সম্মত হইলে উক্ত কর্মকার তাহাকে বারদী লইয়া আসে। তদবধি বাবা লোকনাথ তাঁহার লীলাসম্বরণ পর্যন্ত বারদী গ্রামেই ছিলেন। প্রায় ২৬ বৎসর তিনি এই স্থানে অবস্থান করেন এবং এই স্থান হইতেই লোকনাথের অপার মহিমা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এইজন্য এই মহাপুরুষ সর্বত্র "বারদীর গোঁসাই" নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

আমরা অতি সংক্ষেপে বাবা লোকনাথের জীবনীর আখ্যায়িকা প্রদান করিলাম। লোকনাথের জীবনের অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনাবলী আলোচনা করিলে মনে হয়, এ যেন এক অভিনব উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক কল্পিত, এবং বর্ণিত ঘটনাবলীও কল্পনা- প্রসূত। কিন্তু এ অভিনব উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা মহাশক্তিধর গুরু ভগবান, নায়ক পরম শিবময় যোগীশ্বর লোকনাথ; ইহার ফল মহাসিদ্ধি এবং চরম লক্ষ্য জগতের মহামঙ্গল- সাধন। অথবা এই অদ্ভুত ঘটনাবলী আলোচনা করিলে মনে হয়, যেন প্রকৃতই এক অপার্থিব অমৃত- কাননে পরিভ্রমণ করিতেছি। গুরু ভগবান এই কাননের রচয়িতা, যোগীশ্বর লোকনাথ ইহার সুচতুর মালী, সাধনা- উদ্যানের তরুরাজি, ফল অমৃত ও মহাসিদ্ধি, চরম লক্ষ্য জগতের মহামঙ্গল- সাধন। লোকনাথের প্রত্যেক কথায়, তাঁহার অদ্ভুত জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, জগদ্বাসিগণের দুঃখ- জ্বালাময় হৃদয়ে শান্তিধারা ঢালিবার জন্যই তিনি অলৌকিক ও অপার্থিব শক্তিসমূহ অর্জন করিয়াছিলেন; এবং সংসার- দগ্ধ অধঃপাতিত মনুষ্যগণের দুর্দশাদর্শনে ব্যথিত হইয়া, তিনি বহু ক্লেশোপার্জিত অমৃতময় সম্পত্তিরাশি পরম বাৎসল্যময় পিতার ন্যায় ব্যয় করিয়াছেন। এই অপার করুণার গভীরতা কত, আমরা ভাবহীন, হৃদয়হীন, আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? লোকনাথ কাতর প্রাণে আশা- সুধা ঢালিবার জন্য কতবারই না বলিয়াছেন, **"আমি পাহাড়- পর্বত পরিভ্রমণ করে, বড় একটা ধন কামাই করেছি, কত বরফ এ শরীরের উপর দিয়া জল হয়ে গিয়েছে, তোরা বসে খাবি।"** আহা, কোন পরম কারুণিক পিতা, স্বোপার্জিত সম্পত্তিরাশি, ঘরে বসাইয়া উপার্জনহীন পুত্রকে খাওয়াইতে পারেন? কোন স্নেহময়ী জননী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অম্লান বদনে নির্গুণ পুত্রের জন্য নিজের যথাসর্বস্ব সমর্পণ করিতে পারেন? এই স্বার্থ ও হিংসা- দ্বেষময় সংসারে এমন মহাপ্রাণ কে আছেন, যিনি পরের দুঃখে আকুল হইয়া স্বোপার্জিত অতুলনীয় রত্নরাশি অকাতরে ব্যয় করিতে পারেন? তাই, আমাদের মনে হয়, জগতের প্রভূত মঙ্গলের জন্যই লোকনাথের আবির্ভাব। জগতের হিতের জন্যই তাঁহার এই মহায়োজন, এবং জগতের হিতের জন্যই তিনি তাহা সম্প্রদান করিয়াছেন।

একদিন গুরুদেব লোকনাথকে বলিয়াছিলেন, "বাবা, আমি আপনার নিকট এত ঋণী যে, আমার জীবনের অবশিষ্টাংশ আপনার জন্য ব্যয়িত হইলেও, সে ঋনের পরিশোধ হয় না।" গুরুদেবের এই কাতরোক্তি শুনিয়া লোকনাথের কঠোর মূর্তি নবনীতের ন্যায় কোমলতা ধারণ করিল, মহাতেজোময় নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, লোকনাথ কত বাৎসল্যের ভাবে উত্তর করিলেন, **"তুই কিসের ঋণী রে, আমি না তোর খাতক হয়েছি, তোকে গাইটেরটা খাওয়াই, তোর পায়ে ধরি, তবু তোকে কিছু দিয়া দিতে পারি কি না।"** আমরা সংসারের কূপমন্ডুক, এই অপার করুণা- সাগরের গভীরতা কি বুঝিব? মনে হয়, এই সাগরের বুঝি তল নাই। এই মহাবাক্যের তাৎপর্য লোকনাথ যেমন অনন্তলীলাময়, তাঁহার করুণা- পারাবারও তেমনি অপরিমেয়- অতলস্পর্শ।

আমরা অনেকের মুখে শুনিয়া থাকি, "যদি জগতে এমনই মহাশক্তিধর সিদ্ধ মহাপুরুষগণ বর্তমান থাকিবেন, তবে সমাজের এই দুর্দশা কেন?" বুঝি এই কাতর প্রার্থনায় লোকনাথের যোগাসন টলিয়াছিল! বুঝি গুরু ভগবানের কানেও এই কাতর ক্রন্দন পৌঁছিয়াছিল! তাই জগতের ভাবী মঙ্গলের বীজ রোপণ করিয়া ভগবান জগৎকে কৃতার্থ করিয়াছেন, সমাজকে ধন্য করিয়াছেন।

লোকনাথ তাঁহার পিতার চতুর্থ পুত্র। তথাপি লোকনাথই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের জন্য মনোনীত হইলেন। লোকনাথের পিতা ইচ্ছা করিলেই তাঁহার অপর পুত্রগণের মধ্যে একজনকে ঐ কার্যে মনোনীত করিতে পারিতেন। বিশেষতঃ যাঁহার সংকল্পই ঐরূপ, তিনি চতুর্থ পুত্রের আশায় বসিয়া থ াকিবেন কেন? ইহা দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, লোকনাথ যে ব্রত উদযাপন করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার অপর কোন ভ্রাতৃ কর্তৃক তাহা হইত না বলিয়া, ভগবানের অমোঘ ইচ্ছা ও শক্তিবলেই লোকনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি তাঁহার পিতা, লোকনাথের জন্মের পূর্বে, তাঁহার অপর কোন পুত্রকে সন্ন্যাসী করিয়া দিতেন তবে যে মহাব্রত উদযাপনের জন্য লোকনাথ আসিয়াছিলেন তাহা হইত না, এবং এই জন্যই ভগবৎ-প্রেরণায় লোকনাথের পিতা অপর কাহাকেও মনোনীত করেন নাই।

এই নিখিল ব্রহ্মান্ড যাঁহার, ইহার মঙ্গলকামনাও তাঁহার। তাই তিনি বুঝিয়াই তাঁহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভগবান রামচন্দ্র যখন রাক্ষসগণের অত্যাচার হইতে যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য ঋষিদের তপোবনে গমন করেন, তখন মারীচও তথায় যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল। রামচন্দ্র অন্য রাক্ষসগণকে বধ করিলেন, কিন্তু মারীচকে বিনাশ করিলেন না- তাহাকে বহুসহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এই মারীচই তৎপরে স্বর্ণমৃগরূপে সীতার সম্মুখ হইতে রামচন্দ্রকে দূরে আকর্ষণ করিয়া সীতাহরণের এবং রাবণবধের সুযোগ করিয়া দিয়াছিল। বস্তুতঃ মারীচের ন্যায় সাহসী এবং মায়াবী নিশাচর আর কেহ ছিল না। সুতরাং, ঋষিদের তপোবনে মারীচ বিনষ্ট হইলে, রামচন্দ্রের রাবণবধরূপ মহোপকারব্রত উদযাপিত হইত না। এই জন্যই রামচন্দ্র সেই সময় সামর্থ সত্ত্বেও মারীচকে বধ না করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিধাতাই এই বিশ্বের সর্বকালের নিয়ামক। তিনি কোন বস্তু দ্বারা কোন কার্য এবং কাহার দ্বারা জগতের কোন হিতসাধন করিবেন, তাহা বুঝিয়া, পূর্ব হইতেই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। আমরা অজ্ঞান, তাই তাঁহার এই সূক্ষ্মলীলা বুঝিতে পারি না।

একাদশ বৎসর বয়সে লোকনাথের উপনয়ন- সংস্কার সম্পাদিত হয়। এই একাদশ বৎসরের মধ্যে লোকনাথ বিশেষ কোন লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাই। আমরাও বাল্যকালে দেখয়াছি ব্রাহ্মণ বালকগণ শিশুকাল হইতে সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র কণ্ঠস্থ করিতে আরম্ভ করে; এবং ১১/১২ বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ ব্যাকরণ তাহাদের কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। পূর্বে এইরূপ রীতি ছিল যে, না বুঝিয়া বালকগণ ব্যাকরণের সূত্র কণ্ঠস্থ করিতে চেষ্টা করিত। লোকনাথের যখন জন্ম হইয়াছিল, সেই সময়েও বালকগণের শিক্ষা- পদ্ধতি অন্যরূপ ছিল না। এমতাবস্থায় ১১ বৎসর পর্যন্ত লোকনাথের শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন থাকা তাঁহার পিতার পক্ষে নিতান্তই অস্বাভাবিক। এমন অনুমানও সঙ্গত নহে যে, লোকনাথকে সন্ন্যাসী করিতে হইবে বলিয়া তাঁহার পিতা মাতা, লোকনাথকে শিক্ষা বিষয়ে পীড়ন করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াই হউক, অথবা অনর্থক তাঁহার জন্য অধ্যাপনার প্রয়াস পাওয়া নিষ্ফল ভাবিয়াই হউক, তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। কারণ, যে পিতা মাতা সেরূপ হীনপ্রকৃতি ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন তাঁহারা কখনও সন্তানের সন্ন্যাসব্রতরূপ মহদুদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন না। গুরু ভগবান সর্বশাস্ত্রপারদর্শী, মহাজ্ঞানী ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, বালক লোকনাথ ভবিষ্যতে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবেই সর্ববিদ্য নিখিলশাস্ত্রজ্ঞ ও মহাপন্ডিত ও মহাপুরুষ হইবেন, মহাযোগবলে সমস্ত শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার জন্মিবে। তিনি ইহাও বুঝিয়েছিলেন যে, তাঁহার স্বোপার্জিত সমস্ত বিদ্যা বিনা অধ্যয়নে তিনি লোকনাথে অণুরনিত করিতে পারিবেন। সুতরাং, এহেন ক্ষণজন্মা জন্মযোগীর বৃত্তিসমূহের স্বাভাবিক পরিস্ফুরণের খর্বতা করা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। এতটুকু পর্যন্ত না বুঝিতে পারিলে, তিনি কখনও নিজের সংসার সুখ, সাধনা, এমন কি জীবনের সর্বপ্রকারের আশা- ভরসা বিসর্জন করিয়া, একমাত্র লোকনাথের ভাবী মঙ্গলের জন্য আত্মসমর্পণ করিতেন না। লোকনাথ দীর্ঘায়ু, মহাযোগী ও সর্বসিদ্ধি- সম্পন্ন হইবেন, ভগবানের এরূপ দৃঢ় সংস্কার না জন্মিলে তিনি অন্ধ অদৃষ্টবাদীর ন্যায় লোকনাথকে লইয়া সমস্ত জীবন বনে, প্রান্তরে, পর্বত- শিখরে কখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেন না। তাই মনে হয়, ভগবানেরই ইঙ্গিতক্রমে লোকনাথের পিতা মাতা লোকনাথের বিদ্যা শিক্ষাবিষয়ে তেমন যত্ন করেন নাই। ভগবানের ইচ্ছা, জগৎ দেখুক, এই ঘোর কলিকালেও ব্রহ্মচর্য ও ব্রহ্মবিদ্যার নিকট পার্থিব বিদ্যা কত অকিঞ্চিৎকর। মহাপ্রাণ ভগবানের মহতী ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছিল। বস্তুতঃ, মানুষ নিরক্ষর ও শাস্ত্রজ্ঞানবিবর্জিত হইয়াও ব্রহ্মচর্য, গুরুভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে কতদূর শক্তিধর, শাস্ত্রজ্ঞ ও মহাপন্ডিত হইতে পারেন, লোকনাথের অলৌকিক জীবনীতে আমরা তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। অবশ্য, মূর্খও সাধনা ও তপোবলে শাস্ত্রার্থবেত্তা ও মহাজ্ঞানী হইয়াছেন,তাহা আমরা জানি; কিন্তু মূর্খ যে আজন্ম ব্রহ্মচর্য ও গুরুভক্তিবলে অশেষ ভাষাবিদ ও নিখিল শাস্ত্রাধ্যাপক হইতে পারেন, তাহা এই ঘোর কলিকালে একমাত্র লোকনাথই জগৎকে দেখাইয়াছেন। মাহাত্মা সর্বানন্দ ঠাকুর মূর্খ হইয়াও অনন্ত শাস্ত্রবেত্তা মহাপন্ডিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সে পান্ডিত্য ও জ্ঞান স্বয়ং জগজ্জননীর বর প্রভাবে হইয়াছিল, ব্রহ্মচর্য ও গুরুসেবার ফলে নহে। লোকনাথ দেখাইয়াছেন যে, অবিভক্ত গুরুভক্তি এবং একনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য দ্বারা মূর্খও জগতে অনন্তজ্ঞানাধার, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষ হইতে পারেন। আমরা বিষ্ঠার কৃমি, নিরন্তর কামিনীকাঞ্চনাসক্ত বদ্ধজীব, আমরা এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের গুরুত্ব কেমন করিয়া বুঝিব?

ইহার পর লোকনথের জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা মানুষের কল্পনাতীত, কলুষতাময় কলিযুগের সম্পূর্ণ বিপরীত। লোকনাথ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছিলেন, তাঁহার তুলনা জগতে মিলে না। এই ব্রহ্মচর্যের মূলে লোকনাথের যে অতুলনীয় অসীম গুরুভক্তি নিহিত আছে, তাহা মনে করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, প্রাণ অপার্থিব গুরুতত্ত্ব- সাগরে ডুব দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। আমরা "গুরুভক্তি বাক্য দ্বারা যাহা বুঝি, লোকনাথের গুরুভক্তি তাহা নহে; লোকনাথের গুরুভক্তি- গুরুতে আত্মবিসর্জন। ব্রহ্মচর্যসময়ে লোকনাথ দুইবার মাসাহব্রত উদযাপন করিয়াছিলেন। একদিন উপবাসী থাকিলে যাহাদের অন্নগতপ্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, লোকনাথের মাসাহব্রত তাহাদের নিকট ধারণার অতীত বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু লোকনাথ তাহা করিয়াছিলেন। মাসাহব্রত অতি কঠোর, ইহাতে জীবন্মৃত হইতে হয়, অথচ ইহার ফল কি হইবে লোকনাথ তখন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। এমতাবস্থায় কেমন প্রাণ, একমাত্র গুরুতে বিশ্বাস করিয়া এমন অসাধ্য ব্যাপারে ব্রতী হইতে ইচ্ছা করিতে পারে? কেমন শিষ্য, ভাবী ফলাফল নিশ্চয় বুঝিতে না পারিয়া এমনভাবে গুরুতত্ত্বে আত্মসমর্পণ করিতে পারে? তাই বলিতেছিলাম, লোকনাথের গুরুভক্তি- গুরুতে আত্মবিসর্জন। লোকনাথ বুঝিয়াছিলেন, গুরুই তাঁহার ব্রহ্মচর্য, গুরুই তাঁহার সাধনা, গুরুই তাঁহার মোক্ষ, গুরুই তাঁহার জীবন; তাই তিনি অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, অসীম গুরুলীলা-বারিধিতে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন; তিনি বুঝিয়াছিলেন তাঁহার গুরুলীলা অমৃত সাগর, এ সাগরে মৃত্যু নাই, অনন্ত জীবন আছে, হলাহল নাই, অমৃত আছে; তাই এ মহাসাগরে ঝম্প প্রদান করিয়া তিনি অমৃতময় হইয়া গিয়াছিলেন; এবং এই গুরুতত্ত্ব- বারিধির পরমামৃত লাভ করিয়াই লোকনাথের জীবন অমন মধুর হইয়াছিল, এবং তাঁহারই ফলে এই বিষদগ্ধ জগতে তিনি এখনও অমৃত বর্ষণ করিতেছেন।

আমরা মহাভারতে একলব্য ও উপমন্যু প্রভৃতির গুরুভক্তির বিষয় পাঠ করিয়াছি; কিন্তু লোকনাথের গুরুভক্তির সঙ্গে উহার তুলনা হয় না। লোকনাথের অসীম গুরুভক্তি কলিযুগে সত্যের আবির্ভাব করিয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, লোকনাথের বারদীতে অবস্থানকালে, গুরু ভগবানের নাম করিতেই তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইত। গুরুর ঋণ অপরিশোধ্য। তাই বুঝি মুক্ত মহাপুরুষ, মুক্ত অশ্রুধারায় তাঁহার মহাগুরু ভগবানের জন্মান্তরীণ ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন! হায়, লোকনাথ, এই কলিকলুষময় সংসারে, এই গুরুবাদ-বিরোধী পশু-সমাজে তোমার এই অতুলনীয় গুরুতত্ত্ব-মহিমা কে বুঝিবে? আশীর্বাদ কর, যেন তোমারি প্রদর্শিত গুরু-মাহাত্ম্য, এই দগ্ধহৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিতে পারে! লোকনাথ বহু বৎসর কঠোর ব্রহ্মচর্য ও তপশ্চর্যার পর পরমসিদ্ধি লাভ করিবার জন্য হিমালয়-শিখরে গমন করেন, এবং তথায় বহু বৎসর কঠোর সাধনা দ্বারা পরমসিদ্ধি লাভ করেন। এ কঠোর সাধনা কিরূপ এবং কোন পথের, সেই সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার অধিকার নাই; এবং মহাপুরুষের মহাসিদ্ধি লইয়া আমাদের ন্যায় সম্পূর্ণ অনধিকারীর আলোচনা করা ধৃষ্টতা মাত্র। তবে এই সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি ও আচরণ দ্বারা আমরা যতটুকু বুঝিতে পারি, বিশেষতঃ এই মহাসিদ্ধি লাভ করিয়া লোকনাথ কিরূপ পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরা ইঙ্গিতে সে সম্বন্ধে দুই- একটি কথা পরে বলিব। এই মহাসিদ্ধি লাভ করিয়াই

লোকনাথ বুঝিলেন যে, তাঁহার গুরু ভগবান তখনও সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। এই সময়েই সিদ্ধ লোকনাথ গুরুমাহাত্ম্য প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারিলেন, এবং নিগূঢ় গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে তখনই তাঁহার পূর্ণজ্ঞান জন্মিল। লোকনাথ অতীব বিস্ময় সহকারে দেখিলেন যে, গুরু ভগবানের অতুলনীয় স্নেহগুণে তিনি আজ এই সিদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত হইলেন যিনি নিজের শীত, গ্রীষ্ম, দুঃখ, যাতনা, এমন কি নিজের জীবন পর্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তাহাকে এই পরম রমণীয় দেবদুলর্ভ অবস্থায় উন্নীত করিয়াছেন, তিনি এখনও তাঁহার অনেক নিম্নস্তরে অবস্থিত আছেন। তাই লোকনাথ এই পরমাদ্ভুত গুরুতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, লোকনাথ যে অদ্ভুত গুরুতত্ত্ব জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, এবং যে নিগূঢ় গুরুমহিমা তিনি জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। আমরা নব্যশিক্ষাভিমানী, আধুনিক সমাজের নেতা হইয়া এই সংসারে গুরুস্থানীয় কাহাকেও দেখিতে পাই না। তাই সকল সময়েই আমরা গুরুকুল গুরুবংশের উল্লেখ করিয়া, তাহাদের নিন্দাপরায়ণ হইয়া নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছি; এবং পর্বত-শিখর হইতে সিদ্ধ মহাপুরুষগণ সর্বদা আসিয়া কেন আমাদের গুরুস্থানীয় হয় না, তজ্জন্য লোকনাথের এই চমৎকার শিক্ষা। এ বিষয়ে আরও অনেক কথা আমাদের পরে বলিবার আছে। এস্থলে তিনি জগৎকে দেখাইয়াছেন, গুরু অসিদ্ধ হইলেও , শিষ্যকে তিনি প্রকৃত পথ দেখাইয়া যোগিজনবাঞ্ছিত পরম-পদলাভের অধিকারী করিতে পারেন। আরও দেখাইয়াছেন, গুরু সিদ্ধিলাভ করিলে যেমন শিষ্য গুরুকৃপায় কৃতার্থ হয়, তদ্রূপ শিষ্য সিদ্ধিলাভ করিলেও গুরু কৃতার্থ হইতে পারেন। এই অদ্ভুত গুরু-শিষ্য-লীলা জগতে দুর্লভ। এই গুরু-ঋণ স্মরণ করিয়াই, সিদ্ধ লোকনাথ ভগবানের জন্মান্তরের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে লোকনাথ যে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন, তাহা মায়ার অশ্রু নহে। কারণ, যিনি জন্মাবধি মায়া-বিকারাতীত, শতাধিক বর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য ও কঠোর তপশ্চর্যা দ্বারা যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এই মায়া অশ্রু বিসর্জন নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক বটে। প্রকৃতপক্ষে এই অশ্রু তাঁহার করুণাবিন্দুরাশি। তাই মনে হয়, লোকনাথের অগাধ করুণা-সাগরের কয়েক বিন্দু মাত্র তাঁহার গুরু ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁহার নয়নদ্বয় প্লাবিত করিয়াছিল এবং মহাপুরুষের এই অমোঘ অশ্রুবিন্দুও ব্রহ্মস্বরূপ সিদ্ধ লোকনাথের অমোঘ ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই গুরু ভাগবান জন্মান্তরে লোকনাথের সান্নিধ্যলাভ করিয়াছেন।

মহাপুরুষগণই শাস্ত্রপ্রণেতা; তাই লোকনাথ কিরূপে এস্থলে শাস্ত্রে সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখাইব। শাস্ত্রে আছে, এক দেহে গুরু, শিষ্যের চরণপ্রার্থী হইতে পারেন না। গুরু অসিদ্ধই হউন, কিম্বা যে অবস্থাপন্নই হউন, তিনি সেই "ব্রহ্মানন্দ, পরম সুখদ" গুরুই বটেন। তাঁহাকে লঙ্ঘন করা, কিম্বা তাঁহাকে চরণে আশ্রয় দেওয়া যোগসিদ্ধ শিষ্যেরও সাজে না। আমরা এই জন্যই শুনিতে পাই, যখন জগজ্জননীর বরপুত্র ব্রহ্মানন্দ গিরি, স্বীয় কর্মদোষে, জগন্মাতার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া হৃত-মন্ত্র হইয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন, সেই সময় তাঁহার প্রিয় শিষ্য, সিদ্ধ বিমানবিহারী পূর্ণানন্দের অমোঘ গুটিকা আকাশমার্গে রুদ্ধ ও অচল হইয়াছিল। এই পূর্ণানন্দই তৎপর ইঙ্গিত মাত্রে প্রাকসিদ্ধ গুরুকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই গুরুমর্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই গুরু ভগবানের পুনর্জন্মের প্রয়োজন হইয়াছিল। নতুবা, লোকনাথের কৃপায় গুরু ভগবান সেই জন্মেই কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিতেন। ব্রহ্মানন্দ প্রাকসিদ্ধ বলিয়াই তাঁহার জন্মান্তরের প্রয়োজন হয় নাই; হৃত-মন্ত্র ব্রহ্মানন্দকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া মাত্রই তাঁহার পূর্বলব্ধ জ্ঞান তিনি পুনরায় লাভ করিয়াছিলেন। লোকনাথ এই গুহ্যাতিগুহ্য গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে জগতে যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাঁহার তুলনা নাই। এই জন্যই শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন- "ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং"। "শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা' গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন"॥

সিদ্ধিলাভের পর লোকনাথ গুরু ভগবানের সঙ্গে কাবুলে যাইয়া কোরান শিক্ষা করেন এবং মুসলমান ধর্মের গূঢ়তত্ত্বসমূহ পরিজ্ঞাত হন, আমরা পূর্বে এইরূপই অনুমান করিয়াছি। এই অনুমানের কারণ এই যে, যে ভগবান লোকনাথের সিদ্ধিলাভের জন্য, তাঁহার জন্মাবধি কিঞ্চিন্ন্যূন এক শতাব্দী কাল পর্যন্ত স্নেহময় পিতার ন্যায় তাঁহা দ্বারা নানাবিধ কঠোর তপশ্চর্যা ও যোগসাধনা অভ্যাস করাইতেছিলেন, তিনি লোকনাথের সিদ্ধিলাভের পূর্বে তাঁহাকে লইয়া ম্লেচ্ছদেশ ভ্রমনে বহির্গত হইয়াছিলেন, ইহা অতি অবিশ্বাস্য কথা। সিদ্ধিলাভের পূর্বে কাবুলে যাইতে হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্বাভ্যস্ত প্রণালী ও সাধনাদির ব্যাঘাত ঘটিত। সুতরাং সর্বদর্শী ভগবান লোকনাথের যোগ ও সাধনাদির ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ইহা অতি অসঙ্গত কথা। সুতরাং লোকনাথের সিদ্ধিলাভের পরই তিনি কাবুলে গিয়াছিলেন, ইহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তবে অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে যে, লোকনাথ যখন সিদ্ধিলাভ করিলেন, তখনই তাঁহার সর্বপ্রকারের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল, মনে করা যাইতে পারে। এমতাবস্থায়, কাবুলে যাইয়া তাঁহার কোরান শিক্ষার কি প্রয়োজন হইয়াছিল? যিনি পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া মহাজ্ঞানের অধিকারী হইলেন, তাঁহার পক্ষে আবার বাহ্য পরধর্মের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিবার জন্য এই প্রয়াস কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা এস্থলে চেষ্টা করিব।

লোকনাথ সিদ্ধিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ম ও মহদুদ্দেশ্য তখনও বাকী। সেই উদ্দেশ্য- জগতের শিক্ষা, অধঃপতিত মানবজাতির সম্মুখে পূর্ণত্বের আদর্শ স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে, যে সমাজের বা জাতির কল্যাণ সাধন করিতে হইবে, সেই সমাজগত বা জাতিগত পূর্ণত্ব লাভ না করিলে প্রকৃত লোকশিক্ষা উপযোগিতা লাভ করা যায়। এই ভারতভূমি, আরব দেশ ও কাবুল হিন্দু-মুসলমানের পূর্ণ লীলাক্ষেত্র। যে মহাপুরুষ, হিন্দু মুসলমান দুই ভাইকে দুই হস্তে সন্তানবৎ ক্রোড়ে তুলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারেন, যিনি স্নেহময় পিতার ন্যায়, হিন্দু মুসলমান দুই ছেলের অশ্রুজল সমকালে মুছাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে এ দুই-এর পূর্ণ শিক্ষকস্থানীয়। লোকনাথ দেখিলেন, হিন্দু মুসলমান দুই ভাই পরস্পর এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও ধর্ম ও সমাজগত বিদ্বেষ-বহ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছে। ধর্মগত জাতিগত পার্থক্য মহাশক্রতায় পরিণত হইতেছে। ভারতে এমন দিন আগত প্রায়, যখন হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া চিনিবার প্রয়োজন হইবে। মহাপুরুষ বুঝিয়াছিলেন যে, এই দুই-এর মিলন ব্যতীত ভারতের মঙ্গল সুদূরপরাহত। তাই তিনি করুণাপরবশ হইয়া একবার মুসলমানের লীলাক্ষেত্র আরব দেশ, অন্যবার হিন্দুর লীলাভূমি ভারতবর্ষে প্রকৃত ধর্মের চরম আদর্শ দেখাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এবং তাঁহারই উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি কাবুলে যাইয়া, লৌকিকাচার অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য কোরান শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং মুসলমানদের জাতি ও কর্মগত নিগূঢ় বিষয়সমূহের পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া, তিনি আরব দেশে যাইয়া তদ্দেশবাসিগণকে ধর্মের চরম আদর্শ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি পরবর্তী সময়ে তিনবার হাঁটিয়া মক্কা মদিনায় গিয়াছিলেন। তথায় মক্কা ও মদিনা বাসিগণ তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মান করিতেন; তিনিও মুসলমানগণের স্বহস্ত-পক্ক অন্ন গ্রহণ করিয়া সার্বভৌমিক ধর্মের আদর্শ তাহাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল দেশভ্রমণার্থে তিনি মক্কা যান নাই। কারণ, তাহা হইলে, তিনবার তথায় যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই তিনবার মক্কা যাওয়ার মধ্যে মহাপুরুষের অবশ্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য সেই উদ্দেশ্য তিনি কি ভাবে ও কি প্রণালীতে সাধন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি। কারণ, সেই সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিতরূপে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, লোকনাথের সিদ্ধিলাভের পর কাবুলে কোরান শিক্ষা, এবং কোরান শিক্ষার পর আরব দেশে গমন, এই সমস্ত

ব্যাপারের মধ্যে এক অতি চমৎকার সূক্ষ্ম সম্বন্ধ ছিল।

মহাপুরুষগণের আচরণ অতি সূক্ষ্ম, তাহাদের কার্যকলাপ সাধারণ মনুষ্যের নিকট দুর্বোধ্য। এই ভারতবর্ষের উন্নতি-অবনতির ভার চিরকালই তাহাদের হস্তে ন্যস্ত আছে। তাহাদেরই অপার করুণাবলে, ভারতবর্ষ এত অধঃপতিত হইয়াও, ধর্মের আদর্শে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং যদি এই ভারতবর্ষ কোনদিন জাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত হয়, তবে পরার্থ চিন্তনশীল মহাপুরষগনের কৃপায়ই তাহা হইবে। তাঁহারাই লোকনয়নের অগোচরে থাকিয়া ধীরে ধীরে ভারতকে সেই উন্নতির পথে চালাইতেছেন; আমরা অজ্ঞান, তাই আমরা মনে করি, ভারতের এই উন্নতি প্রয়াস কালের গতিতে হইতেছে। লোকনাথের বাহ্যলীলা সম্বরণের পর অনেক দিন অতীত হয় নাই, ইতোমধ্যেই ভারতে হিন্দু- মুসলমানের অপূর্ব মিলনের বাতাস বহিতেছে। লোকনাথ নিজের আচরণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, ধর্মের আদর্শে হিন্দু- মুসলমান কোন প্রভেদ নাই। তিনি হিন্দুকে শিখাইয়াছেন- হিন্দু, তুমি ধর্মের আদর্শে মুসলমানকে ভাই বলিয়া চিনিতে শিক্ষা কর, তাহাদের আচার- নীতি বুঝিয়া পরস্পরের ঘৃণা পরিত্যাগ কর।

লোকনাথ উল্লেখিত অমোঘ সত্য অতি কৌশলে প্রচার করিয়াছেন। তিনি একদিকে ঘোষণা করিয়াছেন, "আমি মক্কাতে 'আবদুল গফুর' নামে একজন ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি।" অপরদিকে আবার সার্বভৌমিকতা শিক্ষা দিবার জন্য বলিয়াছেন, "আমি মুসলমান অর্থাৎ মুছল্লম ইমাম ষোল আনা ধর্ম আমাতে আছে।" হয়ত মক্কাতে তিনি নিজেকে হিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। আবদুল গফুর জাতিগত মুসলমানই হউন বা ক্ষত্রিয়ই হউন, লোকনাথের মুখ্য উদ্দেশ্য- হিন্দু- মুসলমানের একতা। তাই, প্রকারান্তরে তিনি ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন- ভারতবাসী, তোমরা পরস্পরের হিংসা-দ্বেষ পরিত্যাগ কর, ভারতের অমোঘ কল্যাণ সাধিত হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "আমি এত পাহাড়-পর্বত ভ্রমণ করেছি, কিন্তু তিনজন বৈ ব্রাহ্মণ দেখি নাই"- মক্কাতে আবদুল গফুর, এবং ভারতে ত্রৈলঙ্গস্বামী ও তিনি স্বয়ং। তিনি একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; নতুবা, ভারত ব্রাহ্মণশূণ্য হইয়াছে, ইহা মহাপুরুষের বচনের লক্ষ্য নহে। মহাপুরুষ বলিয়াছেন, হিন্দু, তুমি ব্রাহ্মণত্বের গৌরব করিয়া মুসলমানকে ঘৃণা কর, কিন্তু মুসলমানের মধ্যেও ব্রাহ্মণ আছেন; পক্ষান্তরে ইহাও বলিয়াছেন, মুসলমান, তুমি হিন্দুকে বিধর্মী বলিয়া ঘৃণা কর, প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর মধ্যে "মুছল্লম, ইমান" অর্থাৎ ষোল আনা ধর্ম আছে, এমন মুসলমান অনেক আছেন। আমরা তাঁহার এই সূক্ষ্ম লক্ষ্য সকল সময় ধরিতে পারি নাই। বস্তুতঃ, ধর্মের আদর্শ যেখানে সেখানে হিন্দু মুসলমান এক। হায়, বাবা লোকনাথ, তোমার এই সূক্ষ্ম আচরণসমূহ মনে করিয়াও আমরা চক্ষুরুন্মীল করি না। আমাদের এই ঘোরান্ধকার তুমি বিনে কে দূর করিবে?

ইহার পর লোকনাথের ভ্রমণবৃত্তান্ত ব্যতীত অন্য কিছু পরিষ্কার রূপ জানা যায় নাই। এই বহু বৎসরব্যাপী ভ্রমণের মধ্যে তাঁহার কি উদ্দেশ্য ছিল- কি জন্য তিনি তুষারাবৃত স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বহু বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং ঐ ভ্রমণ দ্বারা তিনি কোন মহাফল লাভ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা জানি না। তবে, এই ভ্রমণবৃত্তান্ত যে অতি অদ্ভুত ও অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় এবং ইহা যে কেবল মহাপুরুষদের খেয়াল নহে- ইহার মধ্যে যে কোন গূঢ় রহস্য ছিল, তাহা আমরা কতকটা অনুমান করিতে পারি। কারণ, মহাপুরুষগণ পরম সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যে কেবল খেয়ালের বশবর্তী হইয়া ৪০/৫০ বৎসর পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, এরূপ অনুমান করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। লোকনাথ যখন সিদ্ধিলাভ করেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৯০ বৎসর ছিল এবং যখন তিনি বারদীতে আগমন করেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ১৪০ বৎসর। তন্মধ্যে তিনি হিমালয়ে বদরিকাশ্রমে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সুতারং অন্ততঃ ৩০ বৎসর যে তিনি উত্তর ও পূর্ব দিক ভ্রমণে অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহা এক রকম অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক, শুধু দেশভ্রমণই যে লোকনাথের উদ্দেশ্যে ছিল তাহা বলা যায় না, কারণ, যিনি ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মান্ড দর্শনের আনন্দ-উপভোগ অধিক কথা নহে।

শাস্ত্রে দুই প্রকার জ্ঞানীর উল্লেখ আছে। এক প্রকারের জ্ঞানী আছেন যাঁহারা ব্রহ্মান্ড দ্বারা স্বরূপ জানিতে চেষ্টা করেন। এই শ্রেণীর জ্ঞানীগণ এই ব্রহ্মান্ডের বিশ্লেষণ-প্রণালী অবলম্বন পূর্বক "নেতি নেতি" প্রভৃতি বিচার দ্বারা ব্রহ্মপদার্থের জ্ঞান লাভ করেন; তাহাদের অদ্বৈতবাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ইহাদিগকেই জ্ঞানমার্গাবলম্বী বলে। গুরু ভগবান এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। ইঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য কোনরূপ কর্মকান্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় তাহা স্বীকার করেন না; সুতরাং এই শ্রেণীর জ্ঞানীগণের মধ্যে কদাচিৎ কেহ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হন, কিন্তু অধিকাংশকেই চিরকার্যে জীবন যাপন করিতে হয়। গুরু ভগবান এই পন্থা অবলম্বন করিয়াই, কর্মী শিষ্য লোকনাথের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। অপর এক শ্রেণীর জ্ঞানী আছেন যাহারা ব্রহ্মান্ডের বিশ্লেষণে সময়ক্ষেপ না করিয়া গীতোক্ত কর্মমার্গ দ্বারা প্রথম হইতেই ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা করেন। প্রথম শ্রেণীর জ্ঞানীগণের যেমন আরম্ভ ব্রহ্মান্ডে, শেষ ব্রহ্মপদার্থে, দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞানীগণের তেমনি আরম্ভ ব্রহ্মে; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পর, ইঁহাদের ব্রহ্মান্ডের জ্ঞান আপনা-আপনিই হইয়া যায়, ব্রহ্মান্ড নিয়া ইহাদিগকে ব্যাপৃত থাকিতে হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিবঃ

দুইজন লোক বড় এক ধনীর বাড়িতে বেলা দুইপ্রহরের সময় বেড়াইতে গেল। একজন বাড়ির সৌন্দর্য ও মনোহর কারুকার্যে মুগ্ধ হইয়া ঐ সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি বাহিরের লোকদের নিকট প্রশ্ন দ্বারা বুঝিতে লাগিলেন, কোন্ কার্যে কত ব্যায় হইয়াছিল, কোন্ কোন্ কারুকার্যে কোন্ কোন্ শিল্পীর নিয়োগ হইয়াছিল, কত বৎসরে কোন্ কারুকার্য শেষ হইয়াছিল ইত্যাদি। দেখিতে দেখিতে বেলা অবসান হইল। কিন্তু বাড়ির মালিকের সঙ্গে আর সাক্ষাতের সময় থাকিল না। এদিকে অপর ব্যক্তি প্রথমে অট্টালিকার সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হইয়া মনে করিলেন, "প্রথমেই সময় থাকিতে বাড়ির মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যাউক, তৎপর এই সমস্ত সৌন্দর্যের তাৎপর্য বুঝা যাইবে।" তাই তিনি অট্টালিকার মোহে পতিত না হইয়া প্রথমেই মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ধনপতি মহা সমাদরে তাহাকে গ্রহণ করিয়া অভ্যাগতকে উপযুক্ত সম্মানাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া নিজেই তাহাকে অবশেষে অট্টালিকার চমৎকারিত্ব বুঝাইতে লাগিলেন। এই ব্যক্তির প্রকৃতপক্ষে মালিকের সাক্ষাৎও ঘটিল, অথচ অট্টালিকার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানও তাহার মালিকের অনুগ্রহেই জানা হইল। দিবা অবসান হইল বলিয়াও তিনি কোন বিষয়ে বঞ্চিত হইলেন না; কারণ, তখন তিনি মালিকের বন্ধু। এই প্রকার শেষোক্ত জ্ঞানীর জ্ঞান কর্মসম্ভূত, এবং পূর্বোক্ত জ্ঞানীর জ্ঞান বিচারসম্ভূত বলা যায়। পূর্বোক্ত জ্ঞানীর ব্রহ্মদর্শন না ঘটিবারই অধিক সম্ভাবনা। তাই শেষোক্ত জ্ঞানীগণ বহ্মকে দেখিয়া তন্মধ্যেই ব্রহ্মান্ড দেখিতে পান। ব্রহ্মান্ড দেখিবার জন্য তাঁহাদের ব্রহ্মান্ড ঘুরিতে হয় না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আমাদের নাই। এখন বক্তব্য এই যে, লোকনাথ এই শেষোক্ত শ্রেণীর জ্ঞানী। তিনি কর্মমার্গ দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন; সুতরাং ব্রহ্মান্ডের সৌন্দর্য তিনি ব্রহ্মা হইতেই বুঝিয়াছেন। বিশেষতঃ যিনি ব্রহ্মের নিত্য ও অক্ষয় শীলাসৌন্দর্য নয়নগোচর করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মান্ডের অনিত্য ও ক্ষয়িষ্ণু সৌন্দর্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন না এবং তাঁহার তাহাতে তৃপ্তিলাভও হয় না। এরূপ অবস্থায় লোকনাথ ব্রহ্ম-পদার্থের অপরূপ সৌন্দর্য চিরসমাধিনিমগ্ন না থাকিয়া ব্রহ্মান্ডের সৌন্দর্য দেখিবার জন্য লালায়িত হইলেন কেন? এই প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হইতে পারে বৈকি। তাই

আমরা এস্থলে ইহার একটি উত্তরের প্রতীক্ষা করিব।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব উপদেশকালে সর্বদাই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিতেন- একটি "জীবকোটী", অপরটি "ঈশ্বরকোটী"। এই দুটি শব্দ বুঝিতে পারিলেই আমরা পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর পাইব। আমরা জগতে "জীবকোটী" ও "ঈশ্বরকোটী" এই দুই প্রকার "ভক্তসিদ্ধ" দেখিতে পাই। যাহারা "জীবকোটী" তাহারা সাধনাদি দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিলেই পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করেন। তাহাদের ব্রহ্মলাভের পর, আর কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যতদিন তাহারা জগতে অবস্থান করেন, ততদিন ব্রহ্ম-তত্ত্বেই সমাধিস্থ বা মগ্ন থাকিয়া, জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, সুতরাং তাহাদের আর কর্ম থাকে না। কিন্তু যাহারা "ঈশ্বরকোটী", তাহারা ভগবানের অংশে জগতের মঙ্গল ও শিক্ষার্থ জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদেরও লোকশিক্ষার্থ সাধনাদি দ্বারাই ব্রহ্ম-পদার্থ লাভ করিতে হয় বটে, কিন্তু ব্রহ্ম-লাভের পর তাহারা ব্রহ্মতত্ত্বে চিরনিমগ্ন না থাকিয়া জগতের মঙ্গলার্থ আত্মার পৃথক অস্তিত্ব ভগবদিচ্ছায় রাখিয়া দেন, এবং লৌকিকাচারের মধ্য দিয়াই তাহারা জগৎকে শিক্ষা প্রদান করেন। এই শ্রেণীর মহাপুরুষগণ জন্মযোগী। তাহাদের সংসারে কোনদিনও আবদ্ধ থাকিতে হয় না। ইহাদের পূর্বজন্মেই সমস্ত কার্য শেষ হইয়া যায়। কেবল ভগবদিচ্ছায় লোকশিক্ষার্থ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই যোগিগনের জীবনের প্রত্যেক কার্যেই লোকশিক্ষারূপ মহদুদ্দেশ্য সূচিত হয়। ভগবানের দর্শনলাভের পর যাঁহারা তাঁহারই অমোঘ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া লোকশিক্ষার্থ নিযুক্ত হন, তাঁহাদিগকে এই ব্রহ্মান্ড হইতে শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয়। লোকশিক্ষা মুখের কথা নহে; এ কার্যে যাঁহারা ব্রতী তাঁহাদের সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই জন্য, যখন মন্ডণমিশ্রের পত্নী সরস্বতীর সহিত মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্যের কামশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিচার আরম্ভ হয় তখন শঙ্করাচার্য কামশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতাহেতু সরস্বতীর নিকট কিছুদিনের অবকাশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জনৈক রাজার মৃতদেহে প্রবিষ্ট হইয়া কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, তৎপর সরস্বতীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

লোকনাথের এই ভ্রমণও জগন্মঙ্গলরূপ মহাব্রত উদযাপনের জন্য উপকরণ সংগ্রহার্থক সন্দেহ নাই। তিনি বারদী থাকাকালে অনেক সময় বলিয়াছেন, **"আমি শতাধিক বৎসর পাহাড়-পর্বত পরিভ্রমণ করে বড় একটা ধন কামাই করেছি। এ শরীরের উপর কত বরফ জল হয়ে গিয়েছে। তোরা বসে খাবি।"** তাই মনে হয় মহাপুরুষ এই ভ্রমণ দ্বারা জগতের ভাবী শিক্ষার বীজসকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

আর এক কথা। যাঁহারা কর্ম ও ভক্তিমার্গ দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করেন, যদিও তাহাদের ব্রহ্মেই ব্রহ্মান্ডের জ্ঞান হয়, তথাপি জগতের অস্তিত্ব তাহারা স্বীকার করেন; অর্থাৎ যাহারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, তাহারা ব্রহ্মলাভ করিয়াও ব্রহ্মের মহাবিভূতিস্বরূপ এই ব্রহ্মান্ড দর্শন করিয়া ব্রহ্মের লীলা-বিভূতির রসাস্বাদন করিতে বাসনা করিতে পারেন। বিষয়টি আর একটু পরিস্কার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। বেদান্তদর্শনের এক মত শঙ্কারাচার্যের, যাহাকে অদ্বৈতবাদ বলে; অপর মত রামানুজের যাহাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলে। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য; সুতরাং ব্রহ্মান্ড বলিয়া আমরা যাহা দেখি, তাহা সমস্তই ভ্রম-মায়া। বস্তুতঃ তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। এই পথের জ্ঞানিগণই "নেতি নেতি" প্রভৃতি বিচার দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করিতে চেষ্টা করেন। তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বলেন, জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না; যেহেতু, ইহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি আছে, এবং ইহার সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনিই ব্রহ্ম। ইহারা সগুণোপাসনাই করিয়াছেন, আমরা পরে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমাদের বক্তব্য এই যে, যে যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে সে তাহার কার্যাবলী দেখিয়াও পরম সন্তোষ লাভ করে। লোকনাথ বহু বৎসরব্যাপী কঠোর সাধনার ফলে ভগবানের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, **"বহু বৎসর পাহাড়-পর্বত ঘুরিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমার দেখাশুনা হয় নাই। আমি দেখেছি আমাকে, আমি বদ্ধ আছি কর্মে অর্থাৎ সংসারে। সংসার বদ্ধ আছে জিহ্বা আর উপস্থে। যিনি এই দুইটি সংযম করিতে পারিয়াছেন তিনিই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।"**

ভগবান এখন তাহার আপন জিনিস; সুতরাং তাহার এই অনন্ত লীলাক্ষেত্র পরমৈশ্বর্যময় ব্রহ্মান্ড দেখিতে তাহার ইচ্ছা হইবার কথা। লোকনাথ দেখিতেছেন, অসীম ব্রহ্মান্ডময় ব্রহ্মমূর্তি দর্শন করিয়া, ব্রহ্মের অপূর্ব লীলারসামৃত আস্বাদ করিবার জন্যই মহাপুরুষ তদগত চিত্তে ব্রহ্মান্ড ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। বস্তুতঃ এই ভ্রমণ সময়েও লোকনাথ সবিকল্প-সমাধিমগ্ন, শীতোষ্ণাদি জ্ঞানরহিত, ব্রহ্মগতপ্রাণ। এই সমাধি ভঙ্গ হইল তখন, যখন হিতলাল লোকনাথকে বলিলেন, "তোমার নিম্নভূমিতে কার্য রহিয়াছে, অতএব তুমি সেখানে যাও।" লোকনাথ তখনই বুঝিলেন যে, তাহার মহাব্রতের সময় উপস্থিতপ্রায়।

চীনরাজ্যে আসিলে পর চীনরাজকর্মচারিগণ মহাপুরুষদিগকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, একথা পূর্বে বলিয়াছি। স্বচ্ছন্দচারী মহাপুরুষগণের গমনে বাধা জন্মায়, মানুষের এমন সাধ্য নাই। কিন্তু যাঁহাদের হস্তে দেশের শাসনভার ন্যস্ত আছে, লোকনাথ কোন দিনও আত্মশক্তির আশ্রয় লইয়া তাঁহাদের অমর্যাদা করেন নাই, ইহা আমরা তাঁহার বারদী অবস্থানকালে দেখিয়াছি এবং সময়ে আমরা সে-বিষয়ের আলোচনা করিব। অন্তর্যামী মহাপুরুষ নিশ্চয়ই এ ঘটনা পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলেন; সুতরাং ইচ্ছা হইলে, এই বাধা নিশ্চয়ই তিনি এড়াইতে পারিতেন; কিন্তু তাহা করেন নাই।

শ্রী শ্রী লোকনাথ: বারদী প্রয়াণ প্রসঙ্গ

লোকনাথ পূর্বদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভারত বর্ষের পূর্বাঞ্চলস্থিত চন্দ্রশেখর পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হন। এই মহাতীর্থেই কি প্রকারে বাবা লোকনাথের ভাবী জীবনের বীজ উপ্ত হয়, আমরা এস্থলে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

লোকনাথের এই পূর্বাঞ্চলে আগমনের মধ্যে যে এক অদ্ভুত রহস্যময় উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় মহাপুরুষের অচিন্ত্যনীয় মহিমায় পূর্ণ হইয়া যায়। সে মহদুদ্দেশ্য গুরু ভগবানের জন্মান্তরীণ ঋণ পরিশোধের উপায়বিধান। গুরু ভগবান লোকনাথকে কত কষ্টে পরমব্রহ্ম পদবী লাভ করাইয়া নিজে অসিদ্ধাবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কৃতী শিষ্য লোকনাথ তাঁহার দেহত্যাগসময়ে, তাঁহার জন্মান্তরের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ প্রায় ৫০ বৎসর পরে সে ঋণ পরিশোধের দিন আগতপ্রায়। মহাপুরুষ মহাজ্ঞানবলে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন, তাঁহার মহাগুরু ভগবান কোথায় কিভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং কোথায় গেলে সহজে গুরু ভগবানের পুনর্জন্মপরিশোধিত গুরু-শিষ্যমূর্তি প্রত্যক্ষ করিবেন। আহা, এই মহাগুরুর মহাকর্ষণে বুঝি ব্রহ্মলোকও বিচলিত হয়! নতুবা যিনি ব্রহ্মজ্ঞানবলে বহ্মলোকের অধিকারী হইয়াছেন, তিনি অসিদ্ধ, জন্মান্তরের গুরু ভগবানের আকর্ষণে এত বিচলিত হইবেন কেন?
লোকনাথ ইচ্ছা করিলেই ভগবানের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারিতেন। কিন্তু ধর্মজগতের প্রণালী সেরূপ নয়। সাধনজগতের তত্ত্বসমূহ অতি নিগূঢ়; বিশেষতঃ মহাপুরুষের কৃপা সহজে কর্মমার্গে তাঁহাকে এই জন্মেই নূতন পন্থায় অগ্রসর হইতে হইবে। তজ্জন্য তাঁহার প্রস্তুত হওয়ার জন্য সময়ের প্রয়োজন। যখন এই কর্মপথ অনুসরণ করিয়া ভক্তি বিচার প্রভৃতি দ্বারা মহাপুরুষের সঙ্গলাভের ফল লাভ করিতে পারিবেন। ইহাই ধর্ম-জগতের অপূর্ব শিক্ষা। অপার জলধিতলনিহিত মুক্তারাশি কখনই আলস্যপ্রবণ ব্যক্তির ইচ্ছামাত্রেই হস্তগত হয় না। এইজন্য জগতে অতি অল্প লোকই মহামূল্য রত্নলাভে সমর্থ হয়। তাই লোকনাথকে গুরু ভগবানের সাধুসঙ্গলাভোপযোগী সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল। এখন সেই সময় উপস্থিত। তাই মহাপুরুষ, তাঁহার অমোঘ ইচ্ছাশক্তিবলে এই হিন্দুর মহাতীর্থে এক অচিন্ত্যনীয় ব্যাপারের সংঘটন করিয়া জগতের ভাবী

মঙ্গলের বীজ বপন করিলেন। যখন লোকনাথ চন্দ্রশেখর পর্বতের এক শিখরদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় দৈবক্রমে পরমপূজনীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঐ পর্বতের কোন সানুপ্রদেশে ভ্রমণোপলক্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। অকস্মাৎ এক অদ্ভুত ঘটনা গোস্বামী মহাশয়ের নেত্রপথে পতিত হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন, পর্বতপ্রদেশস্থ ব্যাঘ্র মহিষ প্রভৃতি জন্তুগণ নিতান্ত ভয়সন্ত্রস্তভাবে চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিতেছে, বিহঙ্গমগন ভয়সঙ্কুল কলরবে পর্বতমালা মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। যেন এক অভাবনীয় বিপৎসম্পাতে হিন্দুর মহাতীর্থে আজ মহাপ্রলয় উপস্থিত। গোস্বামী মহাশয় কিয়ৎকাল কারণানুসন্ধান করিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, পর্বতে দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অমনি, যেমন কোন নিরাপদ স্থানে পৌছিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, তাঁহার চতুর্দিক অগ্নিময়, কোন রকমেই স্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই। তখন গোস্বামী মহাশয়, উপস্থিত বিপদে অধীর না হইয়া, মনে করিলেন, "যখন নিরাপদ স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, তখন যাহা হয় হইবে, সুতরাং এই স্থানে বসিয়াই ভগবানকে চিন্তা করি।"এই মনে করিয়া গোস্বামী মহাশয় ধীর-শান্তভাবে সেই স্থানে বসিয়া ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় এক মহাশক্তিধর মহাপুরুষ বায়ুগতিতে তথায় আবির্ভূত হইলেন, এবং মহাকার গোস্বামী মহাশয়কে শিশুর ন্যায় বক্ষে ধারণ করিয়া, অনায়াসে ভীষণ অগ্নিব্যূহ ভেদ করিয়া, তাহাকে এক নিরাপদ স্থানে রাখিয়া কোথায় অদৃশ্য হইলেন। ভীষণ অগ্নিব্যূহ মহাপুরুষের অচিন্ত্যনীয় প্রভাবে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শান্ত-শীতল স্পর্শ অনুভূত হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় আর সেইস্থলে মহাপুরুষের সন্ধান পান নাই। পরে যখন গোস্বামী মহাশয় বারদীতে যাইয়া লোকনাথের সাক্ষাৎলাভ করেন, তখন লোকনাথ গোস্বামী মহাশয়কে উক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "জীবনকৃষ্ণ, তোর চন্দ্রশেখরের দাবানলের কথা স্মরণ আছে কি?" গোস্বামী মহাশয় চমকিত হইয়া তখনই বুঝিতে পারিলেন যে, এই মহাপুরুষই তাহাকে সেই ভীষণ অগ্নিব্যূহ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই বিষয় সময়ান্তরে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

যাহা হউক, পরবর্তী সময়ে, লোকনাথের বারদীতে থাকা সময়ে, এই গোস্বামী মহাশয়ই, লোকনাথের অসীম শক্তি ও অপার মহিমার বিষয় ঢাকা এবং তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে প্রচার করেন। ইহা দ্বারাই আমরা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই যে, চন্দ্রশেখর পর্বতের ঐ দাবানল ব্যাপার মহাপুরুষের বারদীলীলার সঙ্গে এক সহস্রময় সূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গোস্বামী মহাশয়, বাবা লোকনাথের অলৌকিক শক্তি ও অচিন্ত্যনীয় মহিমা ঢাকাতে প্রচার করেন বলিয়াই, তাহার ফলে আমরা পরবর্তীকালে বারদীতে এত ভক্তসমাগম ও লোকনাথের অদ্ভুত লীলাবিলাস দেখিতে পাই।

আমি যখন এফ. এ. ক্লাসে পড়ি সেই সময় একদিন গোঁস্বামী মহাশয়ের-গেন্ডারিয়াস্থ আশ্রমে গিয়াছিলাম। তথায় শুনিয়াছিলাম, গোস্বামী মহাশয় একদা মানস সরোবরের নিকটবর্তী কোন হিমালয়-শিখরে যাইয়া কতিপয় মহাপুরুষকে ধ্যানস্থ দেখিতে পান। গোস্বামী মহাশয় ভক্তিনির্ভরচিত্তে তথায় কিছুকাল দন্ডায়মান থাকিলে, একজন মহাপুরুষ চক্ষুরুন্মীলন করিয়াই গোস্বামী মহাশয়কে সম্মুখে দেখিতে পান। তিনি গোস্বামী মহাশয়কে কিছুকাল নিরীক্ষণ করিয়াই বলিলেন, "তুই এখানে আসিয়াছিস কেন? তোর আশ্রমের নিকট আমাদের অপেক্ষা এক শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ আছেন।" গোস্বামী মহাশয় তখন জানিতেন না যে, ঢাকার এত নিকটবর্তী স্থানে লোকনাথের ন্যায় কোন মহাত্মা অবস্থান করিতেছেন। তৎপর, যখন তিনি বারদীতে যাইয়া লোকনাথের সঙ্গলাভ করেন তখন তিনি ঐ বাক্যের সার্থকতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে "ভক্তসমাগম-প্রসঙ্গে" আমরা আমাদের অবশিষ্ট বক্তব্য বলিব।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, বারদীনিবাসী ডেঙ্গু নামক জনৈক কর্মকারের সঙ্গে লোকনাথ বারদী আগমন করিয়াছিলেন। বারদী আসিয়াও তিনি উলঙ্গাবস্থায়ই উক্ত ডেঙ্গু কর্মকারের বাড়িতে থাকিতেন এবং ক্ষুদ ভিক্ষা করিয়া আহার করিতেন। উলঙ্গাবস্থায় রাস্তায় বাহির হইলে, তথাকার বালকগণ অনেক সময় লোকনাথকে উন্মাদগ্রস্ত মনে করিয়া, তাঁহার শরীরে ধূলা ও লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিত; তিনি ঐ সময়ে আত্মরক্ষার জন্য অনেক সময় বৃক্ষাদির আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। লোকনাথের বারদী আসাতে যে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, তাহা এই ঘটনাতেও আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। নতুবা, এই সমস্ত বাহ্য-উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও মুক্ত মহাপুরুষের লোকালয়ে বাস করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি স্বচ্ছন্দচিত্তে যথেচ্ছা চলিয়া যাইতে পারিতেন। চলিয়া গেলে তাঁহার সেই মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইত না। তাই তিনি অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াও, উক্ত ডেঙ্গু কর্মকারের বাড়িতেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়া কেহ চিনিতে পারে নাই। তাই বুঝি তিনি সময় বুঝিয়া, আত্মপ্রকটনমানসে একদিন এক অলৌকিক ঘটনার সংঘটন করিলেন।

একদিন দুইটি ব্রাহ্মণ একস্থানে বসিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রন্থি দিতেছেন, এমন সময় লোকনাথ উলঙ্গাবস্থায় তথায় উপস্থিত হইলেন। দৈবক্রমে যজ্ঞোপবীত জড়াইয়া যাওয়াতে ব্রাহ্মণদের মধ্যে কলহ আরম্ভ হয়। লোকনাথ তখন বলিলেন, **"তোমরা কলহ করিতেছ কেন? যজ্ঞোপবীতে পেঁচ লাগিলে কি প্রকারে তাহা খুলিতে হয়, ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া তাহা জান না?"** ব্রাহ্মণগণ উলঙ্গ পুরুষের মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমরা জানি গায়ত্রী জপ করিলে যজ্ঞোপবীত-সূত্র সরল হয়; কিন্তু এই জড়তা কিছুতেই খুলিবার নহে।" তখন লোকনাথ বলিলেন, **"তোমরা কিরূপ ব্রাহ্মণ-সন্তান! আচ্ছা, আমি গায়ত্রী জপ করিতেছি, তোমরা সূত্রের দুই প্রান্ত ধরিয়া দুইজনে টানিয়া যাও, দেখিবে এখনই যজ্ঞোপবীত-সূত্র সরলতা লাভ করিবে।"** ব্রাহ্মণদ্বয় তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং দুইজনে সূত্রের দুই প্রান্ত ধরিয়া টানিয়া যাইতে লাগিলেন, উলঙ্গ পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে গায়ত্রী পাঠ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে যজ্ঞোপবীতের পেঁচ খুলিয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণদ্বয় উলঙ্গ পুরুষকে এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধ মহাপুরুষ মনে করিয়া তাঁহার চরণে প্রণতঃ হইলেন এবং গ্রামভ্যন্তরে এই অদ্ভুত ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া নানাস্থান হইতে লোক মহাপুরুষকে দেখিবার জন্য যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল।

ঐ সময়, উক্ত ডেঙ্গু কর্মকারের মৃত্যু হয়। লোকনাথ উক্ত কর্মকারের বাড়িতে থাকা সময়ে, তাহার যথেষ্ট সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল, ---তাহার গৃহ ধনে-জনে পূর্ণ হইয়াছিল। ডেঙ্গু কর্মকারের মৃত্যুর পর, তাহার বাড়ির কোন ব্যক্তি, তাহাদের মেয়ে ও বধূদের যাতায়াতের অসুবিধা হয় বলিয়া, লোকনাথকে স্থানান্তরে যাইবার জন্য বলিয়াছিল। লোকনাথ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, **"আমি সন্ন্যাসী, আমার চলিয়া যাইতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তুই ভাল বুঝিস্ নাই।"** বস্তুতঃ, ঐ হতভাগ্য বুঝিতে পারে নাই যে, মহাপুরুষের অবস্থানই তাহাদের সৌভাগ্যোদয়ের কারণ। লোকনাথ ঐ বাড়ি পরিত্যাগ করিলেই কর্মকারদের বিষম দৈবদুর্বিপাক আরম্ভ হয়, এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের ধন জন সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। মাত্র দুই-একজন লোক ঐ বাড়িতে জীবিত থাকে। তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া ঐ বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায়। এখনও দুই ঘর সেখানে বাস করিতেছে।

বারদী গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ বংশীয় নাগ জমিদারগণের বাস। লোকনাথের উপযুক্ত যজ্ঞোপবীতসংক্রান্ত বৃত্তান্ত প্রচারিত হইলে তাঁহারা মহাপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার নানাপ্রকার অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। নাগবাবুগণ যখন জানিতে পারিলেন যে, তিনি কর্মকারদের বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, তখন তাঁহারা মহাপুরুষকে একটি আশ্রম প্রস্তুত করিয়া থাকিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। লোকনাথ তাহাদিগকে বলেন যে, **"যদি তোমরা এমন একটু স্থান দিতে পার, যে স্থানের জন্য কোন কর পাওয়া যায় না, তবে আমি তথায় আশ্রম করিয়া থাকিতে পারি।"** বারদীর বাজারের অব্যবহিত পূর্বদিকে মধ্যম হিস্যা বা পাঁচ হিস্যা ও পশ্চিমের হিস্যার একটু স্থান ছিল। সেখানে শবদাহ হইত বলিয়া ঐ স্থানের কোন কর পাওয়া যাইত না। মালিকগন ঐ স্থানটুকু ছাড়িয়া দেওয়ায় লোকনাথ ঐ স্থানেই আশ্রম প্রস্তুত করাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়েই তাঁহার ইচ্ছাক্রমে, উক্ত নাগবাবুগণ তাহাকে পরিধেয় লেংটি ও বহির্বাস এবং ব্রাহ্মণোপযোগী উপবীত প্রদান করিয়াছিলেন।

পরম ভাগবত বেঙ্কটনাথ

শংকর নাথ রায়
(ভারতের সাধক বই থেকে সংকলিত)

১৩১০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খল্‌জীর লুব্ধ দৃষ্টি এ সময়ে পতিত হইয়াছে দক্ষিণ ভারতের দিকে। এ অঞ্চল জয়ের জন্য বিরাট বাহিনীসহ তিনি প্রেরণ করিয়াছেন মালেক কাফুরকে। তীব্র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর খল্‌জি সেনাপতি এক একটি হিন্দু রাজ্য ছিনাইয়া নিতেছেন আর ছড়াইতেছেন অগ্নিদাহ, হত্যা লুণ্ঠন আর হিন্দুমন্দির ধ্বংসের বিভীষিকা। মালেক কাফুর সেবার প্রবল বিক্রমে মাদুরার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিয়াছেন। পথেই পড়ে বহুলখ্যাত শ্রীরঙ্গমের প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির। ঐতিহ্য, মর্যাদা ও ধনগৌরবে সারা দাক্ষিণাত্য-এ মন্দিরের জুড়ি নাই। এমন একটি মন্দির লুণ্ঠনের সুযোগ কাফুর ছাড়িতে রাজী নন, তাই দুর্দ্ধর্ষ সমর বাহিনীকে চালিত করিয়াছেন সেই দিকে। কাবেরীর অপর তীরে, রাত্রির অন্ধকারে অগ্রসর হইয়া ছাউনি ফেলিয়াছে খলজী বাহিনী। এবার যে-কোনো মুহূর্তে তাঁহারা ঝাঁপাইয়া পড়িবে এই তীর্থনগরের উপর।

কৃষ্ণপক্ষের নিশীথ রাত্রি। ঘন অন্ধকারে চারিদিক সমাচ্ছন্ন। শ্রীমন্দিরে, বাজারে বা পথঘাটে দীপ নির্বাপিত, সর্বত্র বিরাজিত একটা থমথমে ভাব। আতঙ্কে অনেকেই নগর ছাড়িয়া নিরাপদ আশ্রয়ে চলিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে, তাঁহারাও আসন্ন আক্রমনের ভয়ে মুহ্যমান। নগররক্ষী রাজসেনার সংখ্যা অল্প। এই প্রবল শত্রুর প্রতিরোধ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। সংঘর্ষ শুরু হইলেই ঝড়ের মুখে শুষ্ক তৃণের মতো তাঁহারা কোথায় উড়িয়া যাইবে। তারপরই যথারীতি শুরু হইবে খলজি সেনার নারকীয় তাণ্ডব। এই সঙ্কটের রাত্রে একান্ত আপন কুটিরে বসিয়া বৃদ্ধ আচার্য সুদর্শন ভট্ট একরাশ তালপত্রের পুঁথি গুছাইতে ব্যস্ত। সতর্ক হস্তে এগুলি তিনি ডোরবদ্ধ করিলেন, থরে থরে সাজাইয়া রাখিলেন একটি ঝুলির মধ্যে। হঠাৎ কুটিরের দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল। আচার্য যেন ইহারই অপেক্ষা এতক্ষণ করিতেছিলেন। ত্রস্তপদে উঠিয়া দরজা খুলিলেন, কহিলেন, "এসো বেঙ্কটনাথ। তোমার প্রতীক্ষায়ই আমি বসে আছি।"

আগন্তুকের বয়স চল্লিশের কিছুটা উর্দ্ধে। দৃঢ় সমুন্নত দেহ, চোখে মুখে অপূর্ব প্রতিভার দীপ্তি, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক চিহ্ন, গলায় পবিত্র তুলসীর মালা, দেখিলেই মনে হয়–ভক্তিসাধনায় উৎসর্গীত প্রাণ এক নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব। বৃদ্ধ আচার্যের চরণে প্রণত হইয়া তিনি কহিলেন, "আমায় স্মরণ করেছেন। কি আদেশ বলুন?"

"বৎস, তোমাকে আজ আমার বড় প্রয়োজন। স্থির হয়ে আসনে ব'সো, বলছি।" প্রদীপের আলো স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। সলতেটি বাড়াইয়া দিয়া আচার্য বেঙ্কটনাথকে কাছে ডাকিলেন। নিম্নস্বরে কহিলেন, "এখানকার পরিস্থিতি তো সব দেখছো। ইতিহাসে এমনতর দুর্দৈব আর কখনো আসে নি। খল্‌জি সেনা নদীর ওপারে ঘাঁটি স্থাপন করেছে, যে-কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই নগরের ওপর।"

"যে-কোনো উপায়ে এ নরপশুদের প্রতিরোধ করতে হবে। রক্ষা করতে হবে শ্রীবিগ্রহকে," দৃঢ় স্বরে বলেন বেঙ্কটনাথ।

"প্রভু রঙ্গনাথজীর জন্য ভাবনা নেই। তাঁর বিগ্রহ ইতিমধ্যেই নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সুলতানের সেনারা এবার মন্দির ও তীর্থনগর বিধ্বস্ত করবে হাজার হাজার নিরীহ নরনারীকে। আলাউদ্দীন খল্‌জী খল ও নৃশংস। তার সেনাপতি মালেক কাফুর ততোধিক। মাদুরা অধিকারের জন্য বিরাট সেনাদল নিয়ে সে অগ্রসর হচ্ছে, সেই সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ কে করবে? পাণ্ড্যরাজারা নিজেরা গৃহযুদ্ধে দুর্বল, তাছাড়া, এ নগর রক্ষার জন্য খুব কম সংখ্যক রক্ষী তাঁরা রেখেছেন। এ অবস্থায় খল্‌জী সেনার দুর্বার গতিরোধ করা যাবে না।"

"প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের এই লাঞ্ছনা অপমান, তাঁর ভক্তদের ওপর এই নির্মম অত্যাচার চলবেই? এর কোনো প্রতিবিধান নেই? তবে কি অর্চাবতার রঙ্গনাথজীর এতকালের পূজা অর্চনা সব নিষ্ফল?" উষ্মা ও ক্ষোভ ফুটে ওঠে বেঙ্কটনাথের কথায়।

"তুমি শাস্ত্রবিৎ, নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ভক্ত। তোমার এ ক্ষোভ সাজে না বেঙ্কটনাথ। পুরান শাস্ত্রে কি দেখতে পাও? বার বার দেবতারা স্বর্গচ্যুত হয়েছেন দানবদের দ্বারা। অবতার পুরুষ শ্রীরামকে সীতা হরণের অপমান সইতে হয়েছে, রাক্ষসদের সঙ্গে বুঝতে গিয়ে কতবার বিপন্ন হতে হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকেও শিশুপাল জরাসন্ধের হাতে কম লাঞ্ছনা সইতে হয় নি। ঈশ্বরের লীলায়, তার মায়ার খেলায়, ঘাত-প্রতিঘাত উত্থান-পতন তো থাকবেই, বৎস।"

"এখন আমাদের কর্তব্য কি তাই বলুন।" ব্যগ্রস্বরে নিবেদন করেন বেঙ্কটনাথ।

"সব বলছি, মন দিয়ে শোন। তার আগে জানতে চাই তোমার স্ত্রীপুত্রেরা এখন কোথায়?"

"তারা কিছুদিনের জন্য তীর্থদর্শনে বেরিয়ে গেছে।"

"অতি উত্তম কথা। শুনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। শোন এবার। শত্রুসেনা আজ শেষ রাত্রেই নদী পেরিয়ে আক্রমণ করবে, নৃশংস অত্যাচার শুরু হবে। তার আগে তুমি এ নগর থেকে নিষ্ক্রান্ত হও। তোমায় তিনটি গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে, বেঙ্কটনাথ।"

"আপনার আজ্ঞা সতত শিরোধার্য।"

"তা আমি জানি, বৎস। তোমার বাল্যকাল থেকে আমি তোমায় চিনি। আমার গুরু বরদাচার্যের টোলে যখন আমি যেতাম, তখন তুমি বালক মাত্র, সেই টোলে বসে খেলা করতে। কিন্তু তোমার অমানুষী প্রতিভা ও ভবিষ্যৎ জীবনের মহতী সম্ভাবনা আমার আচার্যদেব এবং আমাদের দৃষ্টিকে এড়াতে পারে নি। অসামান্য শাস্ত্রবিৎ ও সাধকরূপে ইতিমধ্যে তুমি গড়ে উঠেছ, অর্জন করেছো শ্রীরঙ্গমের ভক্ত ও বুধমণ্ডলীর প্রশংসা। আমার প্রথম নির্দেশ, তুমি অবিলম্বে অন্যত্র চলে যাও। তোমার মূল্যবান প্রাণরক্ষা করো। দেশের ভক্তসমাজ, বিশেষ ক'রে রামানুজ সম্প্রদায় ভবিষ্যতে তোমার সেবায় অশেষভাবে উপকৃত হবে।

"কিন্তু আচার্যবর, আপনিও তো যাচ্ছেন আমার সঙ্গে?"

"না বেঙ্কটনাথ, আমি শ্রীধাম ত্যাগ করছিনে। প্রভু রঙ্গনাথের সেবায় একদল ভক্তকে যেমন প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে, তেমনি আর একদলকে প্রাণ বাঁচাতে হবে। ভক্তের মৃত্যুবরণ প্রভুর আসনকে টলিয়ে দেয়, আর ভক্তের কাতর প্রার্থনা ধর্মসংস্থাপনের জন্য তাঁকে ক'রে উদ্দীপিত। দুয়েরই প্রয়োজন আছে, বৎস। প্রাণদানের জন্য আমি সংকল্প গ্রহণ করেছি, সে সংকল্প আর ত্যাগ করার উপায় নেই।

বৃদ্ধ আচার্যের আনন দিব্যভাবের ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আয়ত নয়ন দুটি অর্ধ নিমীলিত। একদৃষ্টে তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বেঙ্কটনাথ কহিলেন, "আচার্যবর, এখনো সময় আছে, সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আর একবার আপনি চিন্তা করুন।"

"শোন বৎস, বৃথা বাক্য ব্যয় ক'রে একটি মুহূর্ত নষ্ট করো না। আমার প্রথম নির্দেশটি তোমায় জানিয়েছি, শ্রীরঙ্গম ত্যাগ ক'রে নিজের প্রাণরক্ষা করো, নিজেকে নিয়োজিত করো প্রভুর নির্ধারিত সেবাকার্যে। আমার দ্বিতীয় নির্দেশ, আমার রচিত 'শ্রুতপ্রকাশিকা'র পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এই ঝুলিতে। আমার গুরু বরদাচার্যের শ্রীমুখ থেকে প্রভু রামানুজের শ্রীভাষ্যের যে তাৎপর্য শুনেছি, তা থেকেই রচনা করেছি এই টীকা। ভক্তসমাজের কল্যাণের জন্য এটি রক্ষা করা প্রয়োজন।"

"এ গ্রন্থের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি।"

"উত্তম বৎস। আমার তৃতীয় নির্দেশ, তুমি আমার বালক পুত্র দুটিরও ভার নাও। ওরা মাতৃহীন, আমার অবর্তমানে আর কেউ নেই ওদের দেখবার। পাশের ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে, জানে না যে শিয়রে ওদের শমন দণ্ডায়মান। তুমি আর বিলম্ব করো না, এই টীকা গ্রন্থ ও বালক দুটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাও।"

শাস্ত্রগ্রন্থের জুলি এবং বালক দুটিকে সঙ্গে নিয়া বেঙ্কটনাথ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রণামান্তে আচার্যকে প্রশ্ন করিলেন, "আর্চাবতার প্রভু রঙ্গনাথজীর প্রিয় তীর্থের এই দুর্ভোগ আর কতদিন চলবে?"

প্রশান্ত কণ্ঠে আচার্য উত্তর দিলেন, "প্রভুর কৃপায় আমি জানতে পেরেছি, বৎস, প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল এ অঞ্চল অত্যাচারী বিধর্মীর কবলে থাকবে, তারপর হবে মুক্তির অরুণোদয়। তোমরা, ভক্ত সাধক শাস্ত্রবিদ যাঁরা বেঁচে রইলে, তাঁদের নিত্যকার কাজ হবে প্রভুর কাছে সেই মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা।"

ত্রস্তপদে নিঃশব্দে দীর্ঘ অন্ধকারময় পথ চলিয়া কাবেরীর তীরে আসিয়া দাঁড়ান বেঙ্কটনাথ। এক হাতে গ্রন্থের ঝুলি, আর এক হাতে বেষ্টন করিয়া আছেন বালক দুটিকে।

বালুকা সৈকতের সম্মুখেই পারঘাট। ঘাটে পৌঁছিয়াই বেঙ্কটনাথ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। শত শত মৃতদেহ আশেপাশে ছড়ানো। তীর্থনগরের রক্ষী বাহিনীর একাংশ খল্‌জি সেনার প্রবল আক্রমণে বিধ্বস্ত ও হতাহত। ঘাটে পারাপারের নৌকা একটিও নাই, সবগুলিই ওপারের দিকে রওনা হইয়াছে। বেঙ্কটনাথ বুঝিলেন, পরিস্থিতি ভয়াবহ। মালেক কাফুরের সেনার অগ্রাংশ নগররক্ষীদের প্রাথমিক প্রতিরোধ বিধ্বস্ত করিয়া নিঃশব্দে মন্দির বেষ্টন করার জন্য ধাবিত হইয়াছে। আর ঘাটের নৌকাগুলি ওপারে গিয়াছে মূল সেনাবাহিনীকে আনয়নের জন্য।

বালক দুটিকে নিয়া ওপারে পৌঁছিবার কোনো উপায় নাই। নগরে ফিরিয়া গেলেও মৃত্যু অবধারিত। এখন কি করা যায়?

হঠাৎ বেঙ্কটনাথের মাথায় এক চিন্তা খেলিয়া গেল। সঙ্কট হইতে উদ্ধারের এক উপায় তিনি উদ্ভাবন করিলেন। হ্যাঁ, চাতুর্যের আশ্রয় ছাড়া বাঁচিবার কোনো পন্থা নাই।

ক্ষিপ্র হস্তে রক্ষীদের মৃতদেহগুলি টানিয়া আনিয়া সেগুলি তিনি স্তূপীকৃত করিলেন। বালকদের কহিলেন, "ভয় পেয়ো না। আজ আমরা একটা নূতন লুকোচুরি খেলা খেলবো। নিহতদের স্তূপের ভেতরে এসো আমরা সবাই ঢুকে পড়ি, মৃতের মতো নিঃসাড়ে পড়ে থাকি। ওপার থেকে আগত খলজি সেনারা সবাই যখন মন্দিরের দিকে চলে যাবে, তখন আমরা চট্‌পট্ উঠে পড়বো। ওপারে চলে গিয়ে প্রাণ বাঁচাবো।"

তাড়াতাড়ি সবাই মৃতের স্তূপের মধ্যে আত্মগোপন করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই মূল খল্‌জি বহিনী এপারে আসিয়া উপস্থিত। তাচ্ছিল্যভরে মৃত শত্রুদের দিকে তাকাইয়া মন্দির আক্রমণের জন্যে সোল্লাসে তাঁহারা ধাবিত হইল।

ঘাট নীরব নির্জন হইলে বেঙ্কটনাথ বালকদের নিয়া বাহিরে আসিলেন। নৌকাযোগে কাবেরী পার হইয়া প্রবেশ করিলেন গহন অরণ্যে। অতিকষ্টে ক্রমাগত কয়েক দিন পথ চলার পর মহীশুর অঞ্চলে হিন্দু রাজ্যে আসিয়া হাঁফ ছাড়লেন, শুরু করিলেন নূতনতর সারস্বত জীবন, সাধনাময় জীবন।

পাণ্ডিত্য ও সাধনার, অমানুষী প্রতিভা ও পরাভক্তির যে বীজ রোপিত হইয়াছিল শ্রীরঙ্গমের নবীন পণ্ডিত বেঙ্কটনাথের আধারে অচিরে তাঁহা পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠে।

সমকালীন ভক্তি আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ধারকবাহকরূপে, রামানুজ সম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতারূপে কীর্তিত হন বেঙ্কটনাথ।

ত্যাগ বৈরাগ্যময় ভক্তিসাধনা, কবিত্ব, দার্শনিকতা, এবং তর্কপারঙ্গমতার জন্য শুধু দক্ষিণাত্যেই নয়, সারা ভারতে এ সময় তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে, বেদান্তদেশিক নামে সর্বত্র তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

বেঙ্কটনাথের পিতার নাম অনন্তসূরী। ভক্তিমান, সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। তখনকার দিনে দাক্ষিণাত্যের ধর্মজীবনের মর্মকেন্দ্র ছিল কাঞ্চী। শৈব ও বৈষ্ণব ভক্ত সাধক ও শাস্ত্রবিদ আচার্যদের পূজা অর্চনা ও তাত্ত্বিক বিতর্কে সদা মুখরিত থাকিত এই পুণ্যময়ী নগরী। অনন্তসূরী এখানকার পল্লীতে বাস করিতেন এবং কাঞ্চীর ভক্ত ও পণ্ডিতমহলে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। আচার্য রামানুজ তাঁহার ভক্তিবাদ প্রচারের জন্য চুয়াত্তর জন আদর্শ বৈষ্ণব পণ্ডিতকে নিয়োজিত করেন, ইহাদের অন্যতম ছিলেন অনন্তসুরীর পূর্বপুরুষ। বেঙ্কটনাথের মাতা তোতারম্বার পিতৃগৃহেও ধর্মীয় ঐতিহ্য কম ছিল না। রামানুজের ঐ আদি প্রচারক গোষ্ঠীর অন্যতম আচার্যের বংশে তাঁহার জন্ম। তিনি ছিলেন আদর্শ বৈষ্ণব সাধিকা আর তাঁহার ভ্রাতা রামানুজ অপ্পুলার সমকালীন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্যদের অন্যতম।

এই ভক্তিপরায়ণ নৈষ্ঠিক পরিবারে বেঙ্কটনাথ ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বালককাল হইতেই অত্যাশ্চর্য মেধা ও প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায় তাঁর জীবনে। পুত্রের সারস্বত-জীবনের সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া জনক জননী মহা আনন্দিত। অষ্টম বৎসর বয়সে উপনয়ন সংস্কারের পর মাতুল অপ্পুলার তাঁহাদের কাছে প্রস্তাব করেন, "বেঙ্কটনাথের শিক্ষার দায়িত্ব তোমরা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমার টোলের পড়ুয়াদের অনেকেই খ্যাতনামা ভক্তিশাস্ত্রবিদ্ বলে গণ্য হয়েছে। বেঙ্কটনাথ দৈবী প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে, আমার টোলে পাঠ সমাপ্ত করলে কালে সেও এক প্রখ্যাত আচার্য হয়ে উঠবে।"

অনন্তসূরী নিজে বৈরাগ্যবান পণ্ডিত। তাই নিজের টোলকে বড় করার জন্য কোনো দিনই তিনি উৎসাহী হন নাই। গুটিকয়েক ছাত্র পড়াইয়া কোনোমতে তাঁহার সংসার চলে। ভাবিলেন, রামানুজ অপ্পুলার নিজে ভক্ত সাধক, তাছাড়া, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্যদের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি সুপ্রচারিত। তাঁহার টোলের ছাত্রেরা অনেকেই কৃতী পুরুষ। সেই টোলে নিজে যাচিয়া ভাগ্নেকে তিনি পড়াইতে চান, এ অতি উত্তম কথা। স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া অপ্পুলারের প্রস্তাবে তিনি সায় দিলেন। মাতুলের প্রসিদ্ধ টোলেই শুরু হইল বেঙ্কটনাথের শাস্ত্র অধ্যয়ন।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল, কিশোর বেঙ্কটনাথ তাঁহার অমানুষী প্রতিভার বলে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি ন্যায় প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রদের বিদ্যাবত্তাকেও সে হার মানাইয়াছে অনায়াসে।

রামানুজ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট পণ্ডিত বরদাচার্য এ সময়ে মাঝে মাঝে কাঞ্চীতে আসিয়া বাস করিতেন। সঙ্গে থাকিত শিষ্যপ্রধান সুদর্শন ভট্ট ও অন্যান্য তীক্ষ্ণধী ভক্তিশাস্ত্রবিদ্ শিষ্য। বরদাচার্যের আলোচনা সভায় কাঞ্চীর অন্যান্য বিদ্যার্থীদের সঙ্গে কিশোর বেঙ্কটনাথও এক একদিন উপস্থিত হইতেন। এই সময়কার আলোচনা ও বিতর্কে তাঁহাকে সোৎসাহে

যোগ দিতে দেখা যাইত। তাঁহার প্রতিভার দীপ্তি ও তত্ত্বালোচনায় পারদর্শিতা দেখিয়া বরদাচার্য বিস্মিত নয়নে চাহিয়া থাকিতেন। এই কিশোর ভক্তিবাদী ছাত্রের ভবিষৎ অতি উজ্জ্বল, বরদাচার্যের তাঁহা বুঝিতে দেরী হয় নাই। একদিন শাস্ত্র বিতর্কের আসরে সপ্রশংস দৃষ্টিতে বেঙ্কটনাথের দিকে তাকাইয়া তিনি বলেন, "বৎস, আমি আশীর্বাদ করি উত্তর জীবনে তুমি বেদান্তের ভক্তিবাদী ব্যাখ্যায় সাফল্য অর্জন করো, পতিপক্ষকে করো পর্যদস্ত। ধর্ম দেশ ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন ক'রে জীবন তোমার ধন্য হোক।" প্রবীণ শিষ্য সুদর্শন ভট্টও সেদিন সেখানে উপস্থিত। আচার্যের এই আশিস যে অপাত্রে বর্ষিত হয় নাই এবং কিশোর বেঙ্কটনাথ যে একদিন দক্ষিণ ভারতের সারস্বত সমাজের অন্যতম স্তম্ভরূপে গণ্য হইবেন, এই বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে চিরদিন জাগরূক ছিল।

পরবর্তী জীবনে শ্রীরঙ্গমে তরুণ আচার্য বেঙ্কটনাথের সহিত সুদর্শনের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠে। বেঙ্কটনাথের জীবনে স্বীয় গুরুর আশিসকে রূপায়িত হইতে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন, দিনের পর দিন তাঁহাকে কাছে টানিয়া নেন। মুসলমান সেনা শ্রীরঙ্গম আক্রমণ করার প্রাক্কালে সুদর্শন ভট্ট তাঁহার এই বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ যুবক বন্ধুটিকে নিজের কুটিরে ডকিয়া আনেন। তাঁহারই হাতে শ্রেষ্ঠ অবদান 'শ্রুতপ্রকাশিকা'র পাণ্ডুলিপি ও পুত্রদ্বয়কে সঁপিয়া দেন, নিশ্চিন্তে করেন মৃত্যুবরণ।

বেঙ্কটনাথ কাঞ্চীতে প্রায় বিশ বৎসর বাস করেন। এখন তিনি নবীন যুবা, এই বয়সেই নিজের অসাধারণ শক্তি বলে সর্ববিদ্যায় তিনি পারদর্শী হইয়া উঠেন। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি শাস্ত্র শিক্ষাদানের এক টোল খুলিয়া বসেন। অল্পকাল মধ্যেই চারিদিক হইতে তাঁহার এই টোলে বিদ্যার্থীর সমাগম হইতে থাকে। জননী তোতারম্বার আনন্দের আর অবধি নাই। নবীন অধ্যাপক রূপে পুত্রের যশ তখন চারিদেকে। দলে দলে ছাত্র আসিয়া জুটিতেছে তাঁহার টোলে। অর্থাগমও বাড়িতেছে। এবার বেঙ্কটনাথের বিবাহ দিয়া একটি সুলক্ষণা বধূ ঘরে আনা দরকার। প্রস্তাব শুনিয়াই পুত্র চমকাইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "আমি আমার জীবনের লক্ষ্য স্থির ক'রে ফেলেছি, মা। প্রভু রামানুজের দার্শনিকতা ও বৈষ্ণবীয় সাধন আমি মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছি এবং তা রক্ষা করার জন্য জীবন সঁপে দেবো বলেও স্থির করেছি। কাজেই বিবাহ করার জন্য আমায় তুমি চাপ দিয়ো না।"

ব্যস্তসমস্ত হইয়া মা কহিলেন, সে কিরে, রামানুজপন্থী কত আচার্যই তো দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন, তাঁরা সবাই আদর্শ গৃহী, ঘরসংসার ক'রে শাস্ত্রচর্চা আর সাধনভজন করতে তো তাঁদের বাধে নি। এ তুই কি সব বলছিস।"

"নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের জীবন-যাপন করতে চাই আমি, নইলে শাস্ত্রচর্চা ও সাধনা কোনোটিতেই আমি আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারবো না।" যুক্তি দেখান বেঙ্কটনাথ।

জননী উত্তেজিত হন, যুবক পুত্রকে নানাভাবে বুঝাইতে থাকেন। অবশেষে বলিয়া উঠেন, "তোর বাবা উন্নত বৈষ্ণব সাধকের জীবন-যাপন ক'রে গিয়েছেন, টাকাকড়ি উপার্জন বা সঞ্চয়ে কোনোদিনই মন দেন নি। বেশ তো, বাবা, তুইও সেই পথে চলবি। ইচ্ছে হয়তো নৈষ্ঠিক অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণরূপেই তুই দিনাতিপাত করবি। কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা তুই গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ কর। বংশধারায় ছেদ পড়তে দিস্‌নে বাবা, দেখিস্ পিতৃপুরুষ যেন পিণ্ডজল পায়।"

মাতৃভক্ত বেঙ্কটনাথ জননীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। অচিরে থুপ্পিলের নিকটস্থ গ্রামের এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি সংসারী হন।

পত্নী ছিলেন পতিব্রতা। তাই পতির ত্যাগপুত আদর্শকে তিনিও একান্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরেন। অযাচক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া পরম আনন্দে উভয়ে পুত্রকলত্রসহ দীর্ঘ গার্হস্থ্য জীবন অতিবাহিত করেন।

কাঞ্চীর শাস্ত্রবিদদের মধ্যে আচার্য বেঙ্কটনাথ তখন এক কৃতী পুরুষরূপে সম্মানিত। শ্রীসম্প্রদায়ের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা বলিয়া সবাই যেমন তাঁহাকে জানেন, তমনি সমাদর করেন ন্যায়, সাংখ্য ও অদ্বৈতবেদান্তের মর্মজ্ঞ এবং প্রতিভাধর ব্যাখ্যাতারূপে। এই অল্প বয়সেই 'সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র' পণ্ডিত বলিয়া অনেকে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতে আসেন।

এই সময়ে আচার্য বেঙ্কটনাথ এক নবীন বিদ্যার্থীর সহিত পরিচিত হন। বয়সে কনিষ্ঠতর হইলেও প্রতিভা ও প্রাণশক্তি তাঁহার বিস্ময়কর। এই বিদ্যার্থীর নাম মাধব সায়ন। সেদিনকার এই পরিচয় উত্তরকালে পরিণত হয় দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বে।

বেঙ্কটনাথ রামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য। প্রধানত বিষ্ণুকাঞ্চীকে কেন্দ্র করিয়া তিনি বসবাস করিতেন। আর মাধব ছিলেন অদ্বৈতব্রহ্মবাদী গুরুর ছাত্র, শিবকাঞ্চীতে থাকিয়া তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। উভয়ের মতবাদ ও জীবন পরিবেশে পার্থক্য প্রচুর, তবুও তাঁহাদের মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধুত্বের বন্ধন গড়িয়া উঠিতে দেরি হয় নাই। তখকার দিনে জ্ঞানবাদী ও ভক্তিবাদীদের মধ্যে বাদ বিসম্বাদ নিতান্ত কম ছিল না, কিন্তু বেঙ্কটনাথ ও মাধব ছিলেন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। উভয়ে উভয়ের ত্যাগবৈরাগ্য ও প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিতেন, সনাতন ধর্ম ও স্বদেশের উজ্জীবনের স্বপ্ন উভয়েই দেখিতেন। এমনি করিয়া দুইটি উজ্জ্বল ব্যক্তি একে অন্যকে আকৃষ্ট করিত, গভীরভাবে ভালবাসিত।

উত্তরকালে বেঙ্কটনাথ সারা দাক্ষিণাত্যে রামানুজ প্রবর্তিত শ্রীসম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতারূপে খ্যাত হন, শ্রীরঙ্গমের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে অগণিত ভক্তহৃদয়ে আসন পরিগ্রহ করেন। আর মাধব কীর্তিতে হন তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্য মুনি রূপে। শিষ্য হরিহর ও বুক্করায়কে প্রেরণা ও সাহায্য দিয়া তিনি গঠন করেন বিজয়নগরের হিন্দুসাম্রাজ্য, ভারতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি রাখিয়া যান। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে, সেই সুপরিণত বয়সেও বেঙ্কটনাথ ও মাধবাচার্য তাঁহাদের পুরাতন বন্ধুত্বকে এতটুকু ম্লান হইতে দেন নাই।

কাঞ্চীর জনতার ভিড় ও বিদ্যা-কোলাহল বেশীদিন বেঙ্কটনাথের ভাল লাগে নাই। কিছুদিনের জন্য নিজের চতুষ্পাঠীকে তিনি কুড্ডালোরের অন্তর্গত তিরুবাহিন্দ্রপুরে নিয়া যান, সেখানকার শান্ত নিভৃত পরিবেশে চলিতে থাকে তাঁহার সাধনা, শাস্ত্রগবেষণা ও শিক্ষাদান।

অতঃপর ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের আহ্বানে আচার্য তিরুক্কইলুর নামক স্থানে গিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। অবশেষে কাঞ্চীর বন্ধুবান্ধব ও শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব প্রধানদের আহ্বানে আবার তাঁহাকে সেখানে ফিরিয়া আসিতে হয়।

ইতিমধ্যে বেঙ্কটনাথ সংস্কৃত ও তামিল ভাষার কতকগুলি দার্শনিক ও স্তোত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভক্তিবাদের ব্যাখ্যাতা ও বিচারমল্লরূপে যেমন তাঁহার প্রসিদ্ধি রটিয়াছে, তেমনি তিনি দেশের সর্বস্তরের মানুষদের কাছে বরণীয় ও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহার কাব্যপ্রতিভার জন্য। কাঞ্চীর জ্ঞানী-গুণী ও ভক্তসমাজে তখন তিনি অতিশয় জনপ্রিয়। চরিত্রে শুচিতা ও স্নিগ্ধতার গুণে বিরুদ্ধমতবাদী পণ্ডিতেরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, ভালবাসিতেন।

সনাতন ধর্মের উৎসস্থান উত্তর ভারত। বিশেষ করিয়া পুণ্যতোয়া গঙ্গা ও যমুনার তীরে তীরে এদেশের শ্রেষ্ঠ তীর্থগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। বেঙ্কটনাথ স্থির করিলেন, এই সব তীর্থ দর্শন করিবেন, প্রাণের আশা মিটাইয়া বিগ্রহসমূহের পূজা অর্চনা করিবেন।

একদল ভক্ত যাত্রী তিরুপতি হইয়া গয়া কাশী বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাঁহাদের সহিত বেঙ্কটনাথ ভিড়িয়া পড়িলেন। অর্থের কোনো সঙ্গতি নাই, সারা পথে অবলম্বন করিলেন আকাশ বৃত্তি। ইষ্টদেব শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় তাঁহার এই দীর্ঘ তীর্থ পরিক্রমা কিন্তু সহজে ও নির্বিঘ্নে হয় এবং কয়েক মাস পরে কাঞ্চীতে তিনি ফিরিয়া আসেন।

এই সময়ে আচার্য বেঙ্কটনাথের জীবনে ঘটে এক বিরাট পটপরিবর্তন।

শ্রীরঙ্গম রামানুজী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। কিছুদিন যাবৎ সেখানে এক দিগবিজয়ী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে। শাস্ত্রের তীক্ষ্ণ বিচার বিশ্লেষণে, তর্ক যুদ্ধে বৈষ্ণব পণ্ডিতদের তিনি প্রায়ই কোণঠাসা করিয়া ফেলিতেছেন। এ বিপদে সেখানকার ভক্তিবাদী পণ্ডিতেরা বেঙ্কটনাথের সাহায্য পাঠাইলেন।

বেঙ্কটনাথ সর্বশাস্ত্র পারঙ্গম, 'সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র' মহাপণ্ডিত বলিয়া চারিদিকে তাঁহার বিরাট খ্যাতি। অদ্বৈতবাদের যুক্তি তর্কের পদ্ধতি তাঁহার ভালভাবে জানা আছে। সর্বোপরি শ্রীসম্প্রদায়ের ভক্তদের বিশ্বাস, বেঙ্কটনাথ অমানুষী প্রতিভার অধিকারী এবং রামানুজের মতবাদের পুষ্টি সাধনের জন্যই ঈশ্বরের কৃপায় তিনি আবির্ভূত।

সম্প্রদায়ের আচার্যদের আহ্বান বেঙ্কটনাথ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। অচিরে তিনি শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হন।

প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের দর্শন ও অর্চনার শেষে আসিয়া দাঁড়ান অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর সম্মুখে। উভয়েই অসামান্য শাস্ত্রবিদ, তীক্ষ্ণধী ও কুশলী বিচারমল্ল। কিন্তু এই তর্কযুদ্ধে বেঙ্কটনাথই অবশেষে জয়লাভ করেন। শ্রীরঙ্গমের পুণ্যক্ষেত্রে এই নবীন আচার্য ধন্য হন সর্বজনের অভিনন্দনে। ভক্তিবাদী বেদান্তের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে এবার তিনি বিপুল প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ভক্তসমাজ তাই এখন হইতে তাঁহাকে অভিহিত করিতে থাকেন বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ নামে।

মাত্র কয়েক দিনের জন্য কাঞ্চী ছাড়িয়া আসিয়াছেন বেঙ্কটনাথ। কিন্তু শ্রীরঙ্গনাথ বিগ্রহ ও শ্রীরঙ্গমের ভক্তিময় পরিবেশ তাঁহার মন কাড়িয়া নিল। স্থির করিলেন, কাঞ্চীর বসবাস তুলিয়া দিবেন, সপরিবারে চিরদিনের জন্য এই তীর্থনগরীতেই গ্রহণ করিবেন আশ্রয়। শ্রীবিগ্রহের অর্চনা, শাস্ত্র রচনা ও বিদ্যাদান নিয়াই কাটাইয়া দিবেন জীবনের অবশিষ্ট কাল।

বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথের বয়স তখন মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর। সৃষ্টিধর্মী রচনা ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রেরণা তাঁহার জীবনে অফুরন্ত। সেইসঙ্গে রহিয়াছে দেশ ও ধর্মের কল্যাণ সাধনের প্রবল ইচ্ছা। ভক্তিরসের ধারাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়াইয়া দিবার ব্রতটি তিনি গ্রহণ করিতে চান। শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণব প্রধানেরাও একাজে তাঁহাকে উৎসাহ দিলেন। পিলাই লোকাচার্য, সুদর্শন সুরী প্রভৃতি একদিন কহিলেন, "বেঙ্কটনাথ তুমি পরম ভাগ্যবান। পিতা মাতা উভয় কুল থেকেই শ্রীবৈষ্ণববাদের সংস্কার তুমি পেয়েছো। তদুপরি আবির্ভূত হয়েছো ঈশ্বরদত্ত অলৌকিকী প্রজ্ঞা ও প্রতিভা নিয়ে। আমাদের ইচ্ছা, দুটি মহতী কর্ম তুমি সত্বর উদযাপন করো। তুমি সর্ববিদ্যায় বিশারদ, জটিল দার্শনিক রহস্যভেদে অদ্বিতীয়। সেই সঙ্গে তুমি অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার অধিকারী বটে। আমরা তোমার লেখনী থেকে দুই পর্যায়ের রচনা আশা করি।"

"আদেশ পালনে আমি সতত প্রস্তুত।" জোড়হস্তে সবিনয়ে উত্তর দেন বেঙ্কটনাথ।

"মায়াবাদীরা শ্রীসম্প্রদায়ের উপর চারিদিক থেকে প্রবল আঘাত হানছে। অদ্বৈতবাদ নিরসনের জন্য তুমি কয়েকটি তাত্ত্বিক ও যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করো। সহজভাবে ব্যাখ্যা করো প্রভু রামানুজের পরম তত্ত্ব। সেই সঙ্গে ভক্ত জনসাধারণের জন্য লিখতে থাকো ভক্তি রসাত্মক কাব্যগ্রন্থ এবং সুমধুর শ্লোকরাজী।

বৃদ্ধ সর্বজনমান্য আচার্যের নির্দেশ স্মরণ রাখিয়া বেঙ্কটনাথ শুরু করিলেন তাঁহার নতুনতর সারস্বত জীবন। শ্রীরঙ্গনাথের সেবা পূজা, আন্তর সাধনা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যানে সর্বতোভাবে নিজেকে তিনি নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু ঐশ বিধানে, অচিরে তাঁহার এই নবতর জীবনসাধনার উপর পতিত হইল এক প্রচণ্ড আঘাত। মালেক কাফুরের হিংস্র আক্রমণের প্রাক্কালে পরম প্রিয় ইষ্টস্থান শ্রীরঙ্গম হইতে নিজেকে তিনি সরাইয়া নিতে বাধ্য হইলেন।

কিন্তু শ্রীরঙ্গমের এই বিপর্যয় এবং মুসলমান সেনার নারকীয় তাণ্ডব বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথকে তাঁহার জীবনসাধনা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। দুর্দৈবের দারুণ আঘাত তাঁহার মধ্যে সৃষ্টি করে এক বলিষ্ঠ প্রতিক্রিয়ার। নিরলস লেখনী চালনা ও জীবনসাধনার মধ্য দিয়া দক্ষিণভারতের ভক্তিবাদকে বেঙ্কটনাথ আরো প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন। চরম দুঃখ, ভীতি ও হতাশার দিনে জনগণকে শোনান তিনি আশা ও আশ্বাসের বাণী, নবতর প্রেরণায় তাঁহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন।

শ্রীরঙ্গম ছাড়িয়া আসার পর বেঙ্কটনাথ কিছুদিনের জন্য মহীশুরের সত্যকালম-এ আসিয়া বাস করিতে থাকেন। মালেক কাফুরের সেনাবাহিনীর ধ্বংসলীলা ও ঘৃণ্য অত্যাচারের অনেক কাহিনীই ইতিমধ্যে তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে। লোকমুখে শুনিয়াছেন-রঙ্গনাথজীর মন্দির শ্রীমন্দির বিধ্বস্ত, শ্রীসম্প্রদায়ের বর্ষীয়ান আচার্য সুদর্শন সূরী সহ শত শত ভক্ত নরনারী নিহত হইয়াছেন। শুধু তাঁহাই নয়, এবার মাদুরার পতনও আসন্ন।

দীর্ঘ পথশ্রমে দেহ অবসন্ন, অন্তর বিষাদখিন্ন। কিন্তু যে গুরুদায়িত্ব বেঙ্কটনাথের সম্মুখে পড়িয়া আছে তাঁহা উপেক্ষা করার উপায় নাই।

সর্বপ্রথমে তিনি সুদর্শন সূরীর পুত্র দুইটিকে উপনয়ন সংস্কার করাইলেন। এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। তারপর শ্রীসম্প্রদায়ের স্থানীয় আচার্যদের কাছে গচ্ছিত রাখিলেন সুদর্শন ভট্টের রচিত 'শ্রুত প্রকাশিকা'র পাণ্ডুলিপিটি।

অল্পদিনের মধ্যেই চারিদিকে সংবাদ রটিয়া গেল, শ্রীরঙ্গমের প্রসিদ্ধ আচার্য বেঙ্কটনাথ মুসলমান সেনার বেষ্টনী এড়াইয়া শ্রীরঙ্গম হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। নবীন ছাত্র ও ভক্ত বৈষ্ণবেরা তাঁহার কাছে সমবেত হইতে লাগিলেন।

দেশের সম্মুখের সঙ্কটের ঘন কালো মেঘ ঘনায়মান। একের পর এক হিন্দু রাজ্য সুলতানী সেনার সম্মুখে ভাঙিয়া পড়িতেছে! রাজাদের কোষাগার ও মন্দিরের ধনৈশ্বর্য লুণ্ঠনেই আক্রমণকারীদের তাণ্ডব শেষ হইতেছে না, উন্মত্তের মতো যেখানে যে দেববিগ্রহ দেখিতেছে তাঁহা ভগ্ন করিতেছে, কলুষিত করিতেছে। সম্মুখে পড়িলে ভক্ত বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী ও আচার্যদের নিষ্কৃতি নাই, নির্বিচারে করিতেছে তাঁহাদের শিরশ্ছেদ।

এই দুঃসহ অবস্থার প্রতিকার কি করিয়া হইবে? কে করিবে দুর্গতদের পরিত্রাণ?

বিষ্ণুপূজা সমাপন করিয়া সেদিন ধ্যানে বসিয়াছেন বেঙ্কটনাথ। সহসা কানে আসিল মৃদু মধুর দিব্য কণ্ঠস্বর, "বৎস, অনাদি অনন্ত কালচক্রের আবর্তন যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন, এ সঙ্কটে তার কৃপার জন্য প্রার্থনা জানাও। অন্ধকার যিনি দিয়েছেন, তিনিই যে সম্ভাবিত করবেন নব অরুণোদয়। তার স্তব রচনা করো তুমি, আর তোমার সে স্তব হয়ে উঠুক নির্জিত আতঙ্কিত মানবের কাছে কল্যাণকর অভয়বাণী।"

এ প্রত্যাদেশ পাইয়া নুতনতর আত্মিক বলের সঞ্চার হইল বেঙ্কটনাথের মনে। পূজাকক্ষে বসিয়া ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সেই দিনই রচনা করিলেন বরাভয়-ভরা অপরূপ শ্লোকরাজী। এই শ্লোকের নাম দিলেন তিনি 'অভীতিস্তব'। অন্তরের আকুতি জানাইয়া প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রভু রঙ্গনাথ, তোমার ভক্তদের মুক্ত করো কলির কলুষ সন্তাপ থেকে, যবন ভয় থেকে। হে করুণাসাগর, তোমার দিব্য করুণার মহাপ্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যাও সেই দনুজদের যারা কলঙ্কিত করছে তোমার সুমহান সৃষ্টিকে।"

এই অভীতিস্তব ক্রমে বিস্তার লাভ করে ভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে। পরম ভাগবত বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ যেমন প্রতিদিন শ্রীবিগ্রহের চরণে নিবেদন করিতেন এই স্তবমালা, তেমনি সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর কণ্ঠেও উচ্চারিত হইত এই আর্তিময় বাণী।

কৌতুহলী বৈষ্ণবেরা বেঙ্কটনাথকে প্রশ্ন করিতেন, "আপনার এই স্তব তো নিত্যই পঠিত হচ্ছে দেশের দিকে দিকে, কিন্তু আপনার ইষ্টস্থান শ্রীরঙ্গম ক্ষেত্রের মুক্ত হবার লক্ষণ তো কই দেখছিনে।"

উত্তরে আশ্বাস দিতেন বেঙ্কটনাথ, "ভগবান করুণার উৎস ভক্তাধীন। তোমাদের আর্তি পৌঁছেছে তার কাছে, মুক্তির বীজ অবশ্যই অঙ্কুরিত হচ্ছে। অর্চাবতার প্রভু রঙ্গনাথ তাঁর পুণ্যপীঠকে অবশ্যই কলুষমুক্ত করবেন।"

সমকালীন ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, খলজি সেনার আক্রমণের সম্মুখে খণ্ডিত ও দুর্বল হিন্দুরাজ্যগুলি একর পর এক পদানত হইলেও, খলজি শাসন দক্ষিণ ভারতে স্থায়ী হয় নাই, শিকড়ও গাড়িতে পারে নাই কিন্তু হত্যা, অগ্নিদাহ ও লুণ্ঠনের মধ্য দিয়া মালেক কাফুর দিকে দিকে বর্বর অভিযান চালাইয়াছে। ফলে হিন্দু রাজা এবং জনগণের মনোবল প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

রামগিরির রাজা রামচন্দ্র ইতিপূর্বেই খলজি সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। ওয়ারেংগেলের শক্তিমান অধিপতি প্রতাপরুদ্রের পক্ষেও যবন সেনাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। বহু সংখ্যক হস্তী অশ্ব এবং কোষাগারের সমস্ত ধনরত্ন ভেট দিয়া সুলতান আলাউদ্দীন খলজিকে তিনি খুশী করিয়াছেন। হয়শাল-রাজ তৃতীয় বল্লালও খলজি সেনার কাছে পরাস্ত হইয়াছেন, পরিণত হইয়াছেন করদ নৃপতিরূপে।

এই সময়ে দ্বারসমুদ্র রাজ্যের ধনৈশ্বর্যের লোভে মালেক কাফুর বিরাট বাহিনী নিয়া সেখানে উপস্থিত হন এবং রাজ-কোষাগার লুণ্ঠনের পর অগ্রসর হন পাণ্ড্যরাজদের মালাবার ভূখণ্ডের দিকে।

সুন্দরপাণ্ড্য ও বীরপাণ্ড্য এই দুই রাজতনয় তখন গৃহযুদ্ধে লিপ্ত। কাফুরের পক্ষে এ এক পরম সুযোগ। কিন্তু পাণ্ড্যরাজদের ধরা তাঁহার পক্ষে সহজ হইল না, সেনাদল সহ তাঁহারা অরণ্য অঞ্চলে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন, সুচতুর কাফুর তাঁহাদের পশ্চাৎধাবনে বৃথা কালক্ষেপ করেন নাই। ব্রহ্মস্থপুরী বা চিদম্বরমের স্বর্ণমন্দির লুণ্ঠন করিয়া এটিকে তিনি ধুলিসাৎ করেন। অতঃপর বিরধূল ও কান্নানুর-এর মন্দিরসমূহ বিধ্বস্ত করিয়া বিরাট বাহিনীসহ খলজি সেনাপতি ঝাঁপাইয়া পড়ে শ্রীরঙ্গমের তীর্থনগরীর উপর। অবশেষে মাদুরা ও শোক্কনাথের মন্দির তিনি লুণ্ঠন করেন।

কাফুর দক্ষিণ ভারতের যত রাজ্যই পদানত করুন আর যত প্রতাপ ও নৃশংসতাই দেখান না কেন, খলজি প্রাধান্যকে সেখানে তিনি স্থায়ী করিতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে দিল্লীর তুঘলক শাহীও এ কার্য সাধনে অসমর্থ হয়।

অতঃপর ১৩৩৬ খ্রীষ্টব্দে দক্ষিণ ভারতে শুরু হয় হিন্দুশক্তির এক স্বর্ণযুগ। মহারাজা হরিহর রায় তুঙ্গভদ্রার তীরে প্রতিষ্ঠা করেন এক ধর্মরাজ্য। বিজয়নগরের দুর্গশিরে সনাতন ধর্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করা হয়। এই সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা, প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের পিছনে দণ্ডায়মান দেখিতে পাই এক সর্বত্যাগী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীকে। এই সন্ন্যাসীই বেঙ্কটনাথের যৌবনকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু মাধব সায়ন, শৃঙ্গেরী মঠের বর্ষীয়ান আচার্য এবং ইতিহাসের বহু কীর্তিত পুরুষ বিদ্যারণ্যস্বামী।

বিজয়নগর বাহিনীর প্রতাপে পুণ্যক্ষেত্র শ্রীরঙ্গম মুক্ত হয়। সারা দাক্ষিণাত্যের ভক্ত বৈষ্ণবদের প্রাণে বহিয়া যায় অনাবিল আনন্দের জোয়ার।

মুসলমান উপদ্রুত স্থান এড়াইয়া বেঙ্কটনাথ এতদিন বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহার সাধনকেন্দ্র স্থাপন করিয়া বাস করিতেছিলেন। এবার তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। এই শুভলগ্নের প্রতীক্ষায় যে তিনি আজো বাঁচিয়া আছেন। শ্রীরঙ্গমের পুণ্যক্ষেত্রে আবার তিনি বাস করিবেন, ইষ্টদেব রঙ্গনাথের নিত্য দর্শন ও পূজা ধ্যানে বাকী জীবনটি তাঁহার মধুময় হইয়া উঠিবে, এই আনন্দে তিনি তখন বিভোর।

খলজি সেনার ভয়ে শ্রীবিগ্রহকে পূর্বেই সরাইয়া নেওয়া হইয়াছিল। নিরাপত্তার জন্য এতদিন কোথাও কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বেশীদিন রাখা যায় নাই। কখনো কোনো দুর্গম অরণ্য কখনো বা জনমানবহীন কোনো শৈলগুহায় তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন রাখা হইত।

শেষ পর্যায়ে প্রভুর বিগ্রহকে রাখা হয় তিরুপতির পবিত্র তীর্থে। কিছুদিন পরে এখান হইতে তাঁহাকে জিনজীতে স্থানান্তরিত করা হয়। রাজা গোপ্পন তখন দুর্ভেদ্য দুর্গ জিনজীর শাসক, তাছাড়া এসময়ে রামানুজ সম্প্রদায়ের এক প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপেও তিনি অনেকের আস্থাভাজন। রঙ্গনাথ বিগ্রহের রক্ষনাবেক্ষণ ও সেবাপূজার ভার সানন্দে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিগ্রহকে কোথায় কখন লুকাইয়া রাখা হইতেছে, শ্রীরঙ্গমের পরিস্থিতি কিরূপ, লুণ্ঠনকারী খলজি সেনাবাহিনী কখন কোন, পথে তাঁহাদের বর্বর অভিযান চালাইতেছে, সব খবরই বেঙ্কটনাথের জানা ছিল। আরও জানা ছিল, শ্রীরঙ্গনাথের মহাপীঠ হইতে যবন নিষ্কাশনের আর বেশী দেরি নাই। কিছুদিনের মধ্যেই বিজয়নগরের সেনাবাহিনী শ্রীরঙ্গম দখল করিল। এ সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বেঙ্কটনাথ তাঁহার ভক্ত শিষ্যদের নিয়া পরমানন্দে সেখানে উপস্থিত হইলেন।

জিনজীর দুর্গ হইতে শ্রীবিগ্রহকে সাড়ম্বরে প্রাচীন মন্দিরে নিয়া আসা হইল। অর্চক ও বৈষ্ণব নেতারা একবাক্যে বেঙ্কটনাথকে অনুরোধ জানাইলেন, "রামানুজের ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা আপনি। আপনার সাধনা ও শাস্ত্রজ্ঞানের গৌরবে সারা দক্ষিণ ভারত গৌরবান্বিত। পণ্ডিত ও ভক্তসমাজের মুখপাত্ররূপে আপনি সদলবলে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত থাকুন। আপনার নির্দেশ নিয়েই আমরা অর্চা বিগ্রহের অভিষেক ও পুনঃস্থাপনের কাজ সুসম্পন্ন করবো।"

বর্ষীয়ান আচার্য, বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ সেদিন আনন্দে মাতোয়ারা বুধমণ্ডলী ও ভক্তদের পুরাভাগে দাঁড়াইয়া ভাবাবেগ-কম্পিত দেহে প্রভুর অভিষেক উৎসবে তিনি যোগদান করেন।

মন্দিরের ভট্টার এসময়ে সবিনয়ে অনুরোধ জানান, "বেদান্তদেশিক, আজকের দিনের এই মহান পুণ্যকর্মে আমরা চাই আপনার কবিকণ্ঠের প্রাণউন্মাদনাকারী স্তবমালা। নিজ নগরে, নিজ বেদীতে প্রভুজীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলো, এই কাহিনীটি আপনার কণ্ঠনিঃসৃত স্তবের ভেতর দিয়ে কালজয়ী হয়ে থাকুক-এই আমরা চাই।"

বেঙ্কটনাথ তখন দিব্য আনন্দরসে বিভোর। পুলকাঞ্চিত দেহে ভাবনিমীলীত নয়নে, যুক্তকরে তিনি গাহিয়া চলিলেন প্রভুর পুনঃপ্রতিষ্ঠার জয়গান। সিদ্ধ বৈষ্ণব ও ভক্ত কবীর এই স্বতোৎসারিত শ্লোকরাজী প্রভুর সেবকেরা পরম আগ্রহে লিখিয়া নিলেন। তারপর মন্দির পরিচালকদের নির্দেশে উহা খোদিত হইল মন্দিরস্থ শিলাপটে।

আজিও রঙ্গনাথ বিগ্রহ দর্শন করিতে গিয়া ভক্ত বৈষ্ণব ও তীর্থচারীরা এই খোদিত স্তবলিপি শ্রদ্ধাভরে পাঠ করে, হৃদয় তাঁহাদের দিব্য অনুভূতির রসে উদ্বেল হইয়া উঠে।

রামানুজের ভক্তিধর্ম ও দার্শনিক মতবাদ ছিল বেঙ্কটনাথের প্রিয় পরম বস্তু। সহজ ও সরস ভাষায় এই ধর্মের জটিল তত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি উহাকে জনমানসে জাগ্রত করিয়া তোলেন, শ্রীসম্প্রদায়ের প্রচার ও পুষ্টি সাধিত হয় তাঁহার রচিত শাস্ত্রগ্রন্থ, কাব্য ও জীবন সাধনার মধ্য দিয়া।

ন্যায়পরিশুদ্ধি, ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন, শতদূষণী, তত্ত্বমুক্তাকলাপ ও রহস্যসার গ্রন্থে বেঙ্কটনাথ তাঁহার দার্শনিক মতবাদ বিস্তারিত করিয়াছেন। এই মতবাদ রামানুজেরই অনুরূপ। চিৎ, অচিৎ ও পুরুষোত্তম এই বস্তুসমূহের স্বরূপ ও তত্ত্বের মীমাংসা তিনি করিয়াছেন। জীব অণু বিভু নহে, সে শ্রীভগবানের চির দাস-শরণাগতি ও ভগবৎকৃপা ছাড়া তাঁহার অন্য গতি নাই। রামানুজের এই মতবাদই বেঙ্কটনাথ নানা নূতনতর যুক্তি দিয়া বুঝাইয়াছেন, পরিবেশন করিয়াছেন সহজবোধ্য ও কবিত্বময় ভাষায়।

উপরোক্ত তাত্ত্বিক গ্রন্থ ছাড়া বহু সংখ্যক মূল্যবান ভক্তিরসাত্মক নাটক ও স্তবমালা রচনা করিয়াও তিনি সহস্র সহস্র ভক্তের অন্তরে প্রজ্বলিত করিয়াছেন ঈশ্বরীয় প্রেম ভক্তির দীপশিখা। তাঁহার সংকল্প সূর্যোদয়, যাদবাভ্যুদয়, হংস সন্দেশ প্রভৃতি নাটক ও কাব্য চিরকালের ভক্তসমাজের পরম আদরের ধন। শতশ্লোকী সুমধুর স্তবমালা তিরভয়মলি আজো শত শত রামানুজপন্থী সাধক ভক্তিভরে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন।

ত্যাগ তিতিক্ষা, শরণাগতি এবং শুদ্ধাভক্তির ঔজ্জ্বল্যে ও তেজস্বিতায় সাধক বেঙ্কটনাথের সমগ্র জীবন ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল।

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ও মনীষী লেখক প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী তাঁহার জীবন ও রচনার মূল্যায়ন করিতে গিয়া লিখিয়াছেনঃ

"তিনি মূর্তিমান বৈরাগ্য ও ভক্তিস্বরূপ। একাধারে তেজস্বিতা ও দীনতার অপূর্ব মিলন তাঁহাতে সাধিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহার এই তেজস্বিতাকে অহঙ্কারের ফল বলা যায় না। শ্রীরামানুজের মতের প্রতি সমাধিক শ্রদ্ধাই এই তেজস্বিতার মূলে সঞ্চিত ছিল। তিনি তাঁহার জীবনের সমস্ত শক্তিই ঈশ্বরদত্ত বলিয়া জানিতেন। তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থগুলিও ভগবৎশক্তির বিকাশ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাবত্তাকে শ্রীভগবানের দান বলিয়া তিনি মনে করিতেন। অপর দিকে তিনি দার্শনিকতা ও কবিত্বের অপূর্ব সমন্বয় দেখাইয়াছেন। দেশিকের গ্রন্থগুলি যদি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত, তাঁহা হইলে তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইয়া সমস্ত দেশ মুগ্ধ হইত সন্দেহ নাই। এরূপ অসাধারণ মনীষা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ধর্মোপদেষ্টার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক তৎসমস্তই তাঁহাতে ছিল।

সরস্বতী মহারাজ এ প্রসঙ্গে আরও লিখিয়াছেন, "ইতিবৃত্ত বাদ দিলেও কেবল গ্রন্থ বলেই তাঁহাকে পৃথিবীর মধ্যে একজন মহাপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী, তিনি একাধারে কবি ও দার্শনিক। তাঁহার কবিতার প্রাণ ধর্ম। শ্রীরামানুজের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া তাঁহার দার্শনিক প্রতিভার স্ফুর্তি হইয়াছে। বরদাচার্যের (সুদর্শন সূরীর গুরু) প্রভাবও তাঁহার জীবনে ও দর্শনে পরিস্ফুট। রামানুজ হইতে এক বিষয়ে বেদান্তদেশিকের পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য ভাষায়। রামানুজের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল নয়। কিন্তু দেশিকের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, বাচস্পতি মিশ্রের ভাষার ন্যায় উদার। বিচারমল্লতায় রামানুজ ও দেশিক উভয়েই সমান। রামানুজের অন্তর্ধানের পরে দেশিকের প্রতিভায়ই শ্রীসম্প্রদায় সজীব রহিয়াছে।"

একদিন রাত্রে রঙ্গনাথ মন্দিরের ভজন পূজন শেষে অর্চক, ভট্টার আচার্যেরা মিলিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। কথাপ্রসঙ্গে একজন হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, "আজ রাত্রের ভেতর যদি কেউ প্রভু রঙ্গনাথকে উদ্দেশ্য করে ভাব সমৃদ্ধ এক সহস্র শ্লোক রচনা করতে পারেন তবে বুঝবো, তিনিই প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তিনিই উচ্চকোটির ভক্তিসিদ্ধ সাধক।

শ্রীসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ নেতা পিলাই লোকাচার্যের ভাই পেরুমল নয়নার তখন সেখানে উপস্থিত। সুকবি ও ভক্ত-সাধক বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। সবিনয়ে তিনি কহিলেন, "প্রভুর চরণ-পদ্মের প্রশস্তি রচনা সমাপ্ত করতে হবে এক রাত্রের মধ্যে? বেশ তো আমি চেষ্টা করে দেখবো।

একদল বৈষ্ণব ভক্ত একসময়ে বেঙ্কটনাথকেও চাপিয়া ধরিলেন, "আচার্য, আপনার লেখনীর ভেতর দিয়ে শ্রীরঙ্গনাথ এ যাবৎ সহস্র সহস্র সুমধুর শ্লোক উৎসারিত করেছেন। আমাদের একান্ত ইচ্ছা, ভক্তসমাজের কল্যাণে এ পুণ্যকর্মটি আপনিই সম্পন্ন করুন।"

বেঙ্কটনাথ সম্মতি দিলেন। স্থির হইল, তিনি ও পেরুমল নয়নার দুজনেই নিজ নিজ কবিকল্পনা অনুযায়ী একাজ করিবেন।

সারা রাত্রির মধ্যে পেরুমল পাঁচশতের বেশী শ্লোক রচনা করিতে পারিলেন না। এদিকে মন্দিরের কোণে বসিয়া ভাবাবিষ্ট সাধক বেঙ্কটনাথ কয়েক ঘন্টার মধ্যে প্রভুর চরণকমল উপলক্ষ করিয়া সমাপ্ত করিলেন তাঁহার 'পাদুকা সহস্র'। ভাব মাধুর্যে ভাষার লালিত্যে ও ভক্তিরসের উচ্ছলতায় এই শ্লোকরাজি অতুলনীয়।

পরদিন প্রভাতে শ্রীমন্দিরে প্রভুর মঙ্গলারতির পর সর্বসমক্ষে এই শ্লোকরাজি বেঙ্কটনাথ ভক্তিভরে পাঠ করিলেন। বৈষ্ণব আচার্যদের মধ্যে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সবাই মিলিয়া বৃদ্ধ বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথকে এক নূতন উপাধি দিলেন-কবি তার্কিক সিংহ।

বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য এসময়ে, দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত হইয়াছে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্ররূপে। শাঙ্কর বেদান্তী, রামানুজী বৈষ্ণব, রামাইৎ, পান্ধারপুরী ভক্ত সবাই সোৎসাহে জড়ো হইতেছেন রাজধানী হাম্পির রাজসভায়। রাজগুরু বিদ্যারণ্যস্বামী সেই রাজসভার প্রাণপুরুষ। রাষ্ট্রীয় জীবন ও ধর্মান্দোলনের শক্তিকে, এই বীর সন্ন্যাসী পরিচালিত করিতেছেন। জনমানসে জাগাইয়া তুলিয়াছেন অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা।

বিদ্যারণ্য অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী, শৃঙ্গেরীর মঠাধীশের প্রধান ও প্রবীণ শিষ্য। কিন্তু ধর্ম সংস্কৃতির নব আন্দোলনকে তিনি দেখিতেছেন এক উদার সার্বভৌম দৃষ্টিতে। তাঁহার নির্দেশে রাজকোষের সাহায্য সম্প্রদায় ও মতবাদ নির্বিশেষে আচার্য ও সাধু-সন্তদের মধ্যে বিতরণ করা হইতেছে। শুধু দক্ষিণ ভারতেরই নয়, উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধক, দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারকেরাও আসিয়া ভিড় করিতেছেন হাম্পির রাজসভায়।

বিদ্যারণ্য স্বামীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার শিষ্যদ্বয় রাজা হরিহর এবং তাঁহার ভ্রাতা বুদ্ধরায়কে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু ধর্ম ও সাধনার শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহকেরা বিজয়নগরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকুন। ইহার ফলে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার যেমন বাড়িবে তেমনি বাড়িবে রাজসিংহাসনের গৌরব ও মর্যাদা।

শ্রীরঙ্গমের শ্রেষ্ঠ ধর্মনেতা, বর্ষীয়ান শ্রীবৈষ্ণব আচার্য বেঙ্কটনাথের উপর বিদ্যারণ্যের দৃষ্টি বহু বৎসর যাবৎ নিবদ্ধ। অনেকবারই তিনি ভাবিয়াছেন, বিজয়নগর রাজসভা অলঙ্কৃত করার জন্য তাঁহাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাইবেন। যে মহান হিন্দুরাজ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা বিদ্যারণ্য করিয়াছেন, যে রাজাকে ধর্ম সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দুর্গরূপে গড়িয়া তুলিতে তিনি বদ্ধপরিকর, সেখানে বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথের মতো দিকপাল আচার্য না থাকিলে মানাইবে কেন? বেঙ্কটনাথ ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ, ত্যাগ বৈরাগ্য ও চরিত্র নিষ্ঠায়ও তাঁহার সমকক্ষ কেহ আছেন বলিয়া বিদ্যারণ্যের জানা নাই। যৌবনকাল হইতে এই সাধক ও শাস্ত্রবিদকে ঘনিষ্ঠভাবে তিনি দেখিয়া আসিতেছেন। নিস্পৃহ নিষ্কিঞ্চন এই আচার্যকে কি হাম্পির রাজসভায় আনয়ন করা যায় না? একবার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতে দোষ কি?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিদ্যারণ্য বেঙ্কটনাথের কাছে এক পত্রী পাঠাইলেন। পত্রীর বাহক তাঁহার এক বর্ষীয়ান কৃতবিদ্য সন্ন্যাসীশিষ্য। বেঙ্কটনাথের সঙ্গে কোন কৌশলে কথা বলিতে হইবে, কিভাবে তাঁহাকে আমন্ত্রণের তাৎপর্য বুঝাইতে হইবে, সব কিছু বিশদভাবে এই সন্ন্যাসী দূতকে বলিয়া দিলেন।

বিদ্যারণ্যের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি অচিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন শ্রীরঙ্গমে। পত্রীসহ নিবেদন করিলেন স্বামীজীর বক্তব্য।

বেঙ্কটনাথ সসঙ্কোচে কহিলেন, "কিন্তু আমার মতো ব্যক্তি, উঞ্ছবৃত্তি করে যে বেঁচে আছে, কোনো মতে নিজের সংসার প্রতিপালন করছে, তাকে দিয়ে বিজয়নগরের নৃপতির কি কাজ, বলুন তো?"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "মহাত্মন, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে ঐশ্বরীয় কৃপায়, ঈশ্বরের আদিষ্ট ধর্মযজ্ঞ উদযাপনের জন্য। সেই পুণ্যভূমিতে আপনার মতো মহাপুরুষ ও শাস্ত্রবিদ আচার্যকেই তো চাই।"

"শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের এক কোণে আমি আমার আর্তি নিয়ে পড়ে আছি। আমার সাধনা ও শাস্ত্রচর্চা একান্তভাবে ক'রে যাচ্ছি। রাজসভার কোলাহলের ভেতরে থেকে আমার কি লাভ বলুন তো?"

"লাভ যথেষ্ট, আচার্য।"

"বেশ তো আমায় বুঝিয়ে বলুন।"

"আপনি রামানুজের পরম ভক্ত এবং তার শ্রীসম্প্রদায়ের কল্যাণকামী, এটা তো ঠিক?"

"তা বটে।"

"তাহলে আমি আপনাকে বলছি, হাম্পির রাজসভায় গেলে রামানুজীয় তত্ত্ব প্রচারের পাবেন আপনি পরম সুযোগ। সারা ভারতের দিকপাল পন্ডিতেরা সেখানে আনাগোনা করছেন। আপনার মতবাদ প্রচারের সেটাই উপযুক্ত স্থান। এর ফলে আপনার সম্প্রদায়ের যথেষ্ঠ কল্যাণও হবে বৈ কি।"

"সন্ন্যাসীবর, পুণ্যপীঠ শ্রীরঙ্গমে থেকে যে সাধনা ও শাস্ত্ররচনা আমি

করেছি, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে শ্রীসম্প্রদায়ের ভক্ত বৈষ্ণবদের যে সেবা করতে পারছি, তার মূল্য আমার কাছে অনেক বেশী। রাজধানীর বহিরঙ্গ প্রচারের চাইতে আমার এই অন্তরঙ্গ সেবা অনেক বেশী কল্যাণবহ।"

"রাজা ও রাজগুরু বিদ্যারণ্যের সাদর আমন্ত্রণ নিয়ে আমি আপনার দ্বারে এসেছি। অন্তত একটিবারের জন্য আপনি আমার সঙ্গে বিজয়নগরে চলুন, রাজসভার বিরাট কল্যাণকর কর্মোদ্যোগ নিজ চক্ষে দেখে আসুন। স্বামী বিদ্যারণ্য একথাও আপনাকে জানতে বলেছেন, ভারতের সকল শ্রেষ্ঠ সাধক ও আচার্য বিদ্যানগরের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে তার গৌরব বাড়িয়া গেছেন, আপনিও সেখানে একবার পদার্পন করুন।"

"আমার পক্ষে তা সম্ভব নয় যতিবর। রাজা ও রাজগুরুর সাদর আমন্ত্রণ আপনি নিবেদন করেছেন এজন্য আপনার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। এবার আমার পরম বন্ধু বিদ্যারণ্য স্বামীর পত্রীর উত্তর আমি আপনার হাতে দেব।"

পত্রীটি সন্ন্যাসীর হাতে দিয়া বেঙ্কটনাথ কহিলেন, "আমি দীনহীন কাঙাল বৈষ্ণব, রাজসভার নয়ন ধাঁধানো ঐশ্বর্যে আমার কি প্রয়োজন? স্বামী বিদ্যারণ্যকে বলবেন, তাঁর সদিচ্ছা ও সাদর আহ্বানের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু শ্রীরঙ্গমকেই যে আমি আমার জীবনের পরম আশ্রয়রূপে আঁকড়ে ধরেছি। রাজার রাজা, পরম প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের দাস আমি, তেমনি দাস বিদ্যানগরের রাজা হরিহর রায়। তবে শ্রীরঙ্গনাথের এই সান্নিধ্য ও আশ্রয় ছেড়ে, বিদ্যানগর রাজের আশ্রয়ে আমি কেন যাবো, বলুন তো?"

সন্ন্যাসী দূত বিদ্যানগরে ফিরিয়া গেলেন। পত্রী পড়িয়া এবং সব কথা শুনিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে বিদ্যারণ্য কহিলেন, "বৈরাগ্য ও শরনাগতির সাধনা সার্থক হয়েছে বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথের। জীবনপ্রভু রঙ্গনাথকে প্রাপ্ত হয়েছে সে । তাই তো শ্রীরঙ্গম থেকে অন্যত্র আশ্রয় নেবার প্রশ্ন তার কাছে আজ অবান্তর।"

সিদ্ধবৈষ্ণব বেঙ্কটনাথ ছিলেন দৈন্য, পবিত্রতা ও সরলতার মূর্ত বিগ্রহ। আবার রামানুজীয় মতবাদের প্রতিপক্ষের সম্মুখে, শাস্ত্রীয় বিচার-সভায় দেখা যাইত তাঁহার ভিন্ন রূপ। যুদ্ধরত গাণ্ডীবীর মতো তিনি গর্জিয়া উঠিতেন, শাস্ত্রীয় তথ্য ও তত্ত্বের শরজালে অপর পক্ষের আচার্যদের করিতেন ধরাশায়ী।

আবার দেখা যাইত এই সব বিরুদ্ধ মতবাদী পণ্ডিত ও সাধকদের সঙ্গে সহাবস্থান করিতে বা ঘনিষ্ঠতা করিতে তাঁহার বাধিত না। সারা বিশ্বসৃষ্টি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে নিঃসৃত, এবং সৃষ্ট জীব তা সে ভক্তিপন্থী হোক বা জ্ঞানপন্থী হোক, স্বরূপত সেই শ্রীবিষ্ণুরই দাস তো বটে। তাই ইহাদের সহিত বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে বেঙ্কটনাথের দিক হইতে কোনো সঙ্কোচ ছিল না।

শাস্ত্রবিদ তর্কশুর বেঙ্কটনাথ আর বৈষ্ণবীয় দীনতার প্রতিমূর্তি বেঙ্কটনাথ, এই দুই চিত্র অনেক সময়ে শ্রীরঙ্গমের কোনো কোনো আচার্যের মনে বিভ্রম জাগাইয়া তুলিত।

সে-বার শ্রীরঙ্গমের কয়েকটি ঈর্ষাপরায়ণ আচার্যের মনে ইচ্ছা জাগিল সিদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত বেঙ্কটনাথকে তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। দেখিবেন সত্য সত্যই তাঁহার জীবন হইতে অহংবোধ দূর হইয়াছে কিনা, ভক্তি ও প্রপত্তির সাধনায় তিনি সফলকাম হইয়াছেন কিনা।

ঐ আচার্যদের একজন বেঙ্কটনাথের কাছে গিয়া যুক্তকরে কহিলেন, "বেদান্তদেশিক, আমার মনের বাসনা আপনি একদিন আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন। কালই আপনি দয়া করে আসবেন শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদান্ন গ্রহণ করবেন। আরো কয়েকজন বৈষ্ণব সাধুপুরুষও আসবেন।"

বেঙ্কটনাথ সানন্দে রাজী হইলেন, কহিলেন, "প্রভুর প্রসাদান্ন পাবো, সেতো পরম সৌভাগ্যের কথা। জানেন তো সংসারে থেকেও, আকাশবৃত্তিই আমার একমাত্র অবলম্বন। ভালই হলো, প্রভু আপনার গৃহে কাল আমার অন্নের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন।"

পরদিন মধ্যাহ্নে ভোগপ্রসাদ গ্রহণ করিতে গিয়া বেঙ্কটনাথ বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, অন্যান্য সাধু ভক্তদের ভোজ শুরু হইয়াছে, শুধু তাঁহার জন্য এক ভিন্ন ব্যবস্থা। ঠাকুরঘর সংলগ্ন এক ক্ষুদ্র কুটিরে তাঁহার আহারের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে আর সেই কুটিরের প্রবেশপথে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে কয়েক জোড়া জীর্ণ পাদুকা। যে বৈষ্ণবেরা পাশের ঘরে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন, বুঝা গেল-এ পাদুকাগুলি তাঁহাদেরই।

নির্দিষ্ট কুটিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া বেঙ্কটনাথ একে একে প্রত্যেকটি পাদুকা টানিয়া নিয়া ভক্তিভরে নিজের মস্তকে স্পর্শ করাইলেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "আজ আমার কি সৌভাগ্য। পরম-প্রভুর ভোগ প্রসাদের ব্যবস্থা যেমন হয়েছে আমার জন্য, তেমনি রয়েছে প্রভুর নিজ্জন বৈষ্ণবদের পদরজ-লিপ্ত এই পাদুকাগুলো।"

নিমন্ত্রণকারী আচার্য এবং তাঁহার কুচক্রী সহযোগীরা এতক্ষন একদৃষ্টে বেঙ্কটনাথের দিকে চাহিয়া আছেন। ভোজন কুটিরের প্রবেশ পথে পাদুকা ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে বেঙ্কটনাথকে অপমান করার জন্য। সর্বজনমান্য, অশীতিপর বৃদ্ধ বেঙ্কটনাথ এ অপমানের যড়যন্ত্র মুহূর্তে বুঝিয়া নিবেন এবং তাঁহার রোষবহ্নি তৎক্ষণাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, ইহাই সবাই আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কার্যকালে দেখা গেল, ভিন্ন চিত্র। শ্রীসম্প্রদায়ের অদ্বিতীয় পণ্ডিত, প্রাচীন সিদ্ধপুরুষ বেঙ্কটনাথ আবেগভরে বারবারই পাদুকাগুলি মস্তকে স্পর্শ করাইতেছেন, আর ভক্তি-আবিষ্ট দেহখানি থর্থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

চক্রান্তকারী আচার্যের অনুতাপের অবধি রহিল না, জোড়হস্তে মহাপুরুষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন তাঁহার চরণে।

ভাবাবেগ প্রশমিত হইলে শান্ত স্নিগ্ধ স্বরে বেঙ্কটনাথ কহিলেন, "যার যেমনতর পথ পরমপ্রভু নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সেই পথই তার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কেউ আছেন কর্মযোগের পথে, কেউ জ্ঞানযোগী বেদান্তী, কেউবা সাধনায় লিপ্ত রয়েছেন শ্রীহরির দাসানুদাস হয়ে। আমার মতো দীনভক্তের পথ হচ্ছে সেই 'দাস-আমি' সাধনার পথ। আপনারা বৈষ্ণব ভক্তদের পদরজ সমন্বিত পাদুকা এখানে আমার জন্য সংগ্রহ করে রেখে আমার পরম কল্যাণ সাধন করেছেন।"

উপস্থিত সকলেই উপলব্ধি করিলেন, রামানুজীয় প্রপত্তির সাধনায় বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ সত্যই অতুলণীয়।

বেঙ্কটনাথের কবিত্ব, দার্শনিকতা ও সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল তাঁহার সমকালীন আচার্যদের কাছে পরম বিস্ময়। যাদবাভ্যুদয় নাটকের ভূমিকায় শ্রী এ. ভি. গোপালচারিয়ার তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেনঃ

"বেদান্তাচার্য বেঙ্কটনাথ ছিলেন সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর সময়কার জ্ঞান বিজ্ঞানের অনেক কিছুর উৎসে এই শক্তিধর পুরুষ ছিলেন বিরাজমান। উচ্চস্তরের কবি যেমন তিনি ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিতর্কমূলক নানা তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা। প্রাঞ্জল ও সুমধুর কবিতা যেমন তাঁহার লেখনী হইতে নিঃসৃত হইত তেমনি পাওয়া যাইত দার্শনিক জটিলতার মীমাংসা। বেঙ্কটনাথের ধর্মীয় ও দার্শনিক রচনার ভিত্তি ছিল ন্যায়ের নিখুঁত বিচারশীলতা, যে কোন মননশীল গবেষকের দৃষ্টিতে তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িবে। তাঁহার প্রত্যেকটি রচনায় বর্তমান রহিয়াছে এক মহান, প্রতিভাধর পুরুষের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। কবিত্ব এবং দার্শনিকতা দুই-ই যেন তাঁহার কাছে ছিল খেলা বস্তুর মতো, যে-কোনো মুহূর্তে এইসব অবলীলায় তিনি সৃষ্টি করিতে পারিতেন।"

সাধনজীবনে বেঙ্কটনাথ ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। প্রকৃত বৈরাগ্য, সত্যনিষ্ঠ ও সত্যকার প্রেমভক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। তাই দেখা যায়, শতাধিক বৎসরের দীর্ঘ জীবনে এক দিনের তরেও বিরোধী সম্প্রদায় বা ভিন্ন মতবাদী পণ্ডিত ও সাধকদের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধে নাই।

'সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র' মাহাপুরুষরূপে তিনি খ্যাত ছিলেন। সর্ব মত ও পথের সন্ধান তিনি জানিতেন, তাই শাস্ত্রে প্রকৃত লক্ষ্য এবং পরম পুরুষের নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণয়ে তাঁহার ভুল হইত না। সকল জীবকেই ঈশ্বরের দানরূপে গ্রহণ

করিয়া সকলের সহিত একাত্ম হইতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই দেখা যাইত, অদ্বৈতবাদী ভেদাভেদবাদী বা তেলেঙ্গল সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকেরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, ভালবাসিতেন।
শীর্ষস্থানীয় অদ্বৈতবাদীদের দৃষ্টিতে বেঙ্কটনাথের স্থান কত উচ্চে ছিল, সমকালীন একটি ঘটনা হইতে তাঁহা বুঝা যাইবে।

সেবার বিজয়নগরের রাজধানী হাম্পিতে এক প্রতিভাধর বৈষ্ণব আচার্যের আগমন হইয়াছে। নাম তাঁহার অক্ষোভ্য মুনি। তর্ককুশল আচার্য দার্শনিক বলিয়া দক্ষিণ ভারতে তাঁহার প্রচুর খ্যাতি।
রাজসভায় পৌঁছিয়া অক্ষোভ্য রাজা হরিহর রায়কে কহিলেন, "মহারাজ, আমি বিষ্ণু উপাসক, দ্বৈতমতবাদের প্রচারক। বিজয়নগর সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ হিন্দু সাম্রাজ্য, এখানে ভক্তিধর্মের পতাকা আমি উত্তোলন করতে চাই। এজন্য তর্কদ্বন্দ্বে আহ্বান করছি রাজগুরু, শৃঙ্গেরী মঠের প্রবীণ নেতা, অদ্বৈতবাদী বিদ্যারণ্য স্বামীকে।"
বিদ্যারণ্য সভাতে উপস্থিত। অক্ষোভ্যকে সংবর্ধনা জানাইয়া কহিলেন, "আচার্য, সানন্দে আমি আপনার তর্কযুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করছি। আমি নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী। যুক্তিতর্ক দিয়ে যদি আপনি আমায় পরাস্ত করতে পারেন, আমি আপনাকে জয়পত্র অবশ্যই লিখে দেবো।"
"তবে বিচার অবিলম্বে শুরু হোক।" দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠেন অক্ষোভ্য মুনি।
"আচার্য, আপনি মধ্বমতের শ্রেষ্ঠ আচার্য, শক্তিমান বিচারমল্ল বলেও আপনাকে সবাই জানে। আর আমিও শৃঙ্গেরী মঠের একজন বর্ষীয়ান সন্ন্যাসী, শাঙ্কর বেদান্তের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতারূপে আমি দক্ষিণ ভারতে সুপরিচিত। আমাদের এই তর্কযুদ্ধের মধ্যস্থ করা হবে কাকে? বলুন, আপনি কাকে মনোনীত করতে চান?"
দুইজনেই শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক ও বিচারনিপুণ। সমপর্যায়ের কোনো প্রতিভাধর আচার্য ছাড়া কে তাঁহাদের শাস্ত্র বিতর্কের মূল্য নিরূপণ করিবেন? তাছাড়া যিনি মধ্যস্থ হইয়া বিচার করিবেন, সততা, নীতিজ্ঞান ও সর্বোপরি নিরপেক্ষতা থাকা চাই।
সহসা এমন কোনো লোকের নাম মনে আসিতেছে না। অক্ষোভ্য তাই সবিনয়ে কহিলেন, "যতিবর, এমন কোনো উপযুক্ত ব্যক্তির নাম আমার জানা নেই। আপনি বরং ভেবে দেখুন এজন্য কাউকে পাওয়া যায় কিনা।"
"আমার তো মনে হয় এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য সারা দক্ষিণ ভারতে শুধু একজনেরই নাম করা যায়। তিনি হচ্ছেন বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ। রামানুজীয় ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা এবং শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবীণতম নেতা তিনি। সত্যনিষ্ঠ ও বৈরাগ্যময় সাধনায় তিনি অতুলনীয়। তাছাড়া; সর্বশাস্ত্রে তিনি পারঙ্গম। আপনার সমর্থন থাকলে তাকেই একাজের জন্য আহ্বান করা হোক।"
বিদ্যারণ্যের কথা শেষ হইতে না হইতেই সভার অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতদের মধ্যে গুঞ্জন ও প্রতিবাদ উঠিল। তাঁহারা কহিলেন, "বেঙ্কটনাথ তাঁহার দীর্ঘ সাধনজীবন কাটিয়েছেন ভক্তি ও প্রপত্তি নিয়ে, ভক্তিবাদী শাস্ত্রচর্চা নিয়ে। শুধু তাই নয়, তাঁহার শতদূষণী গ্রন্থে অজস্র শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক ও প্রমাণ দিয়ে তিনি কি নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ বাতিল করতে চান নি? কাজেই বিচারে বসে অক্ষোভ্য মুনির বৈষ্ণববাদের সমর্থনেই তিনি বেশী ঝুঁকবেন। এবং এটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক।"
বিদ্যারণ্য নিজ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়ান, দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলিয়া উঠেন, "বেঙ্কটনাথকে আমি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য থেকে দেখেছি। তার সাধনা ও সিদ্ধির কথা আমি জানি। ন্যায়নীতি ও সত্যনিষ্ঠা থেকে এই মহাপুরুষ কখনো এক চুল বিচ্যুত হন নি। এ তর্কদ্বন্দ্বে বাদী ও প্রতিবাদী যে সব শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিতর্ক উপস্থিত করবেন, শুধু তার ভিত্তিতেই বেঙ্কটনাথ স্থির করবেন তার সিদ্ধান্ত। এই তর্কবিচারে তার চাইতে সৎ, দক্ষ ও নিরপেক্ষ আর কাউকে তো আমি খুঁজে পাচ্ছিনে।"
প্রতিবাদকারী পণ্ডিতেরা চুপ করিয়া গেলেন। অক্ষোভ্যের মত নিয়া বিদ্যারণ্য সেই দিনই এক বিশেষ বার্তাবহকে বেঙ্কটনাথের কাছে পাঠাইয়া দিলেন।
এবারও বেঙ্কটনাথকে বিজয়নগরের রাজধানী হাম্পিতে আনয়ন করা গেল না। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া দিলেন, উভয় তর্কশূরের আমন্ত্রণে তিনি নিজেকে কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত মনে করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মতো কাঙাল বৈষ্ণবের পক্ষে রাজসভার আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের মধ্যে ক্ষণেকের তরেও অবস্থান করা সম্ভব নয়।

অগত্যা বিদ্যারণ্য ও অক্ষোভ্যকে এক নূতন প্রস্তাব দিতে হইল। তাঁহারা লিখিলেন-বেশ, বেঙ্কটনাথ রাজসভায় আসিতে না চান, ভাল কথা, কিন্তু এই তর্কদ্বন্দ্বের মধ্যস্থতা তাঁহাকে করিতেই হইবে। উভয়পক্ষ তাঁহাদের যুক্তিতর্ক ও শাস্ত্রপ্রমাণ রাজপুরুষদের মাধ্যমে শ্রীরঙ্গমে প্রেরণ করিবেন। বেঙ্কটনাথ সেখানে বসিয়া তর্কযোদ্ধাদের বক্তব্যের মূল্য নিরূপণ করিবেন এবং নিজ সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিবেন পত্রযোগে।
এই বিচারদ্বন্দ্বে বেঙ্কটনাথ কাহাকে জয়ী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন সে তথ্য স্পষ্টরূপে জানা যায় না। ভক্তিবাদী অক্ষোভ্য মুনির ভক্ত শিষ্যেরা দাবী করেন, বেঙ্কটনাথ তাঁহাকেই জয়মাল্য দিয়াছিলেন। অপর দিকে অদ্বৈত বেদান্তীরা দাবী করেন, তাঁহাদের প্রতিনিধি বিদ্যারণ্য স্বামীর অনুকূলেই দেওয়া হয় বর্ষীয়ান মধ্যস্থ, মহান শাস্ত্রবিদ, বেঙ্কটনাথের সিদ্ধান্ত।
তর্কযুদ্ধের ফলাফল যাহাই হোক, উপরোক্ত ঘটনা হইতে এই সত্যটিই প্রমাণিত হয় যে, আচার্য বেঙ্কটনাথকে সমকালীন মহাত্মা ও শাস্ত্রবিদেরা এক অনন্য পুরুষরূপেই দেখিতেন। তাঁহার সততা ও নিরপেক্ষতা ছিল সকল কিছু মতবিরোধ ও নিন্দা সমালোচনার উর্দ্ধে।

বেঙ্কটনাথ শতাধিক বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। সুপরিণত বয়সের এই সিদ্ধপুরুষ ও অসামান্য শাস্ত্রবিদ অদ্বৈতবাদী ও ভক্তিবাদী উভয় দলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তবে বিশেষ করিয়া রামানুজীয় ভক্তিবাদই তাঁহার জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়া জনমানসে আরো প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে।
মাদুরার মুসলমান রাজ্য ধ্বংস করার পর হইতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পরিধি ও প্রভাব বিপুলভাবে বাড়িয়া যায়। এসময়ে বিদ্যারণ্য এবং তাঁহার শিষ্য হরিহর ও বুক্ক রায় বাছিয়া বাছিয়া সুশিক্ষিত ও প্রতিভাধর ব্যক্তিদের নিয়োগ করিতে থাকেন সামন্তরাজ ও শাসনকর্তারূপে।
সাম্রাজ্যের কয়েকটি সামন্ত আচার্য বেঙ্কটনাথেরই অনুরাগী হইয়া পড়েন, কেহ কেহ তাঁহার নিকট বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণও করেন। এই সামন্তদের, বিশেষ করিয়া রাজমহেন্দ্রীর সামন্তরাজ সর্বজ্ঞের অনুরোধে বেঙ্কটনাথ তাঁহার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রচনা দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করেন। ফলে সাধারণ ভক্ত নরনারীর মধ্যে তাঁহার বাণী জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং অধ্যাত্ম-প্রভাবও অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়।
দক্ষিণী বৈষ্ণবসমাজের এক ভাস্বর জ্যোতিষ্করূপে শ্রীরঙ্গমের অধ্যাত্ম-আকাশে অর্ধ শতকেরও বেশীকাল বেঙ্কটনাথ দীপ্যমান থাকেন। তারপর ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, একশত দুই বৎসরে পদার্পণ করার পর এই মহাপুরুষের জীবনে আসিয়া যায় চির বিরতির পালা।

জীবনদ্বীপ নিভিবার আভাস সেদিন আসিয়া গিয়াছে। সিদ্ধ বৈষ্ণব এবার প্রস্তুত হইয়া নিজ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পুত্রদের মধ্যে ভক্তিমান ও সুপণ্ডিত-নয়নার আচার্য। তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বেঙ্কটনাথ প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, "বৎস, আমার প্রিয় 'পাদুকা সহস্রম' আবৃত্তি করো। পরম প্রভুর চরাণাশ্রয় নেবার জন্য এবার আমি যাত্রা করছি এই মরধাম থেকে।" স্বরচিত প্রভু-প্রশস্তি শুনিতে শুনিতে নয়ন দুটি তাঁহার নির্মীলিত হইয়া আসে, তারপর মহাবৈষ্ণব প্রবেশ করেন নিত্যলীলা ধামে।

শ্রী শ্রী রামঠাকুর

অরুনাংশু হোর

বিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে যেক'জন মহাপুরুষ মানুষের কল্যাণে ধরায় এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিরাট অনন্যতার অধিকারী ছিলেন শ্রীশ্রীরামঠাকুর। শ্রীশ্রীঠাকুর পৃথিবীতে অন্তহীন ও অসহনীয় দুঃখ ও যন্ত্রণা থেকে মানুষকে পরিত্রাণ ও রক্ষা করতে এসেছিলেন; সঠিক পথ দেখিয়ে তাদের দুঃখ দুর্দশা মুক্ত করাই ছিল তাঁর কাজ। ভগবানের অবতার শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেব সম্পর্কে কোনো কিছু বলা বা লেখা তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়। আত্মপ্রচার তিনি অপছন্দ করতেন - এতটাই যে, কোনও বিশেষ মুহূর্তেও যদি কারো কাছে ঘটনাক্রমে তাঁর দিব্যশক্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ত, ব্যাপারটাকে লঘু করার জন্য তিনি বলতেন, 'এরকম তো হয়ই'। একবার তাঁর মূল্যবান উপদেশ দেবার পর ঠাকুর বলেছিলেন, 'আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন। আমি উপদেষ্টা নই, দৃষ্টান্তমাত্র'। সত্যি তিনি ছিলেন জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন বিপুল মহাকাশের মতোই বিশাল, উদার, গভীর, দরাজ, স্থির ও শান্ত - যাঁকে টলাতে পারত না কোনও ঝড়ঝাপটা, উত্তেজনা, দুর্ঘটনা, যশ, অপযশ, আনন্দ বা দুঃখ। কোনও ঋতুর কোনও প্রভাব তাঁর উপর পড়ত না। অসীম অনন্ত মহাকাশের মতোই তিনি ধনী গরীব সব ভক্তদের কাছে সমানভাবে বিতরণ করতেন তাঁর স্নেহ- ভালোবাসা। এমন কী তাঁকে যদি কেউ অর্থহীন সব প্রশ্ন করত, বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে পরম ধৈর্যের সাথে তিনি তাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতেন।

অপরিসীম আধ্যাত্মিক শক্তির মূর্ত প্রতীক শ্রীশ্রীঠাকুর সবসময় সাধারণ মানুষের হিতসাধন করতে ব্যাস্ত থাকতেন। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে চিরকাল উদাসীন থাকলেও, কোথাও তাঁর ভক্তদের কোন অনাদর হলে তিনি বিরক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যেতেন। কাউকে ডাকার সময় তিনি সবসময়ই 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন - এমনই ছিল তাঁর ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধ। তাঁর কোনো শিষ্য বা অনুগামী ভক্তের বাড়িতে থাকাকালে তিনি সেই বাড়ির সবার সাথে পরম আত্মীয়ের মতো মিশে যেতেন। কোনও সংস্কার বা অহংবোধ ছিল না বলে কায়িক শ্রমদান করতেও ইতস্তত করতেন না। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। তা ছাড়া কোনও রকম আতিশয্য তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। পড়ার জন্যে আটপৌরে একটা 'ধুতি' অর সাধারণ একটা 'চাদর'; আর সারাদিনের খাবার বলতে নামমাত্র একটু দুধ বা শুকনো ফল কিংবা সেদ্ধ কিছু সব্জিই ছিল যথেষ্ট। তিনি ছিলেন পরিশ্রমী স্বাবলম্বী। অকারণে কোন কথা বলা বা কোথাও যাওয়া ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। খুবই সহজ সরল উপদেশ দিয়ে তিনি তাঁর অনুগামী ভক্তদের দেখিয়ে দিতেন জ্ঞান ও আলোর পথ। সবসময় তিনি বলতেন, "যেখানেই থাকুন নাম স্মরণ করবেন আর নিজের কর্তব্য পালন করবেন। শুধু নাম স্মরণ করেই পূর্বনির্ধারিত ভবিতব্যকেও অতিক্রম করা যায়।"

শ্রীশ্রী ঠাকুরের পৈত্রিক আদিনিবাস ছিল ফরিদপুরের জেলার জপসা গ্রামে। জপসা ডিঙ্গামানিক থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় দশ মাইল দূরে। সে সময়ে জপসা গ্রামের অনেক সুখ্যাতি ছিল। বিদ্যালঙ্কার পরিবার ছিল সেই গ্রামের এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পরিবার। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাবা শ্রীরাধামাধব চক্রবর্তীর বাবার নাম ছিল শ্রামজয় চক্রবর্তী। তিনি জপসা গ্রামেই মারা যান। পদ্মার শাখানদী কীর্তিনাশার করাল গ্রাসে বাপদাদার ভিটেমাটি নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর শ্রীশ্রী ঠাকুরের বাবা জপসা গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন ডিঙ্গামানিক গ্রামে। সেখানেই তিনি শ্রীমতী কমলাদেবীকে বিয়ে করেন। কমলাদেবী খুবই সহজ সরল, উদার আর পরোপকারী ছিলেন। তিনি নিজের সুখ সুবিধার কথা কখনও চিন্তা করতেন না। তাঁর পিতামহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন একজন প্রখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি রাজা রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত রাজনগরের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন।

ছেলেবেলায় শ্রীশ্রী ঠাকুর অন্যান্যদের মত চঞ্চল ছিলেন না। ছোট-বড় সকলেই তাঁর সরলতা, ও সুমধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যেতেন তিনি শিশুকাল থেকেই অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি সংসারের সব কষ্টসাধ্য কাজগুলো নির্বিকার চিত্তে করে যেতেন। ছেলেবেলায় তিনি বন্ধুদের নিয়ে মাটির দেব-দেবী মূর্তি তৈরি করে কীর্তনে নেচে-গেয়ে পরমানন্দে পূজার্চনা করতেন। আধ্যাত্মিক গান শুনতে খুবই পছন্দ করতেন তিনি। শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ মন দিয়ে শোনার পরে সেগুলো হুবহু আবার বলে দিতে পারতেন। শ্যামাসংগীত শুনতে খুবই ভালবাসতেন তিনি। কেউ ভক্তিগীতি গাইলেই তন্ময় হয়ে শুনতেন।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের উপনয়নের পর মা কমলাদেবীকে নিয়ে দণ্ড ভাসানোর সময় হঠাৎ এক সৌম্য সন্ন্যাসী এসে অপলক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে তাকিয়ে মা কমলাদেবীকে অনুরোধ করেছিলেন, "তোমার এ ছেলেটি আমাকে দিয়ে দাও"। মা বললেন, এ আবার কি অলক্ষুনে কথা? রাম যে আমার নয়নের মণি। এমন ছেলেকে কি কেউ সন্ন্যাসীর হাতে তুলে দেয়! কিন্তু সেদিন সেই সন্ন্যাসী খালি হাতে ফিরে গেলেও তাঁর হৃদয়ে গ্রথিত হয়ে গেছিলো শ্রীশ্রী ঠাকুরের নাম। বাবার দেহত্যাগের পর প্রায় চার বৎসর পরে শ্রীশ্রী ঠাকুর একদিন হঠাৎ স্বপ্নযোগে দেখলেন তাঁর

সামনে দাঁড়িয়ে একজন সন্ন্যাসী। তাঁর কানের কাছে সেই সন্ন্যাসী তখন বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে বললেন, 'রাম, রোজ নিবিষ্টমনে এই শক্তিমন্ত্র জপ করে যাও, মুক্তির পথ তোমার অচিরেই উন্মুক্ত হয়ে যাবে"। এই ঘটনার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। সিদ্ধ পুরুষের মতো তিনি মাঝে মাঝেই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। বালক রাম প্রচ্ছন্নে থাকতে চাইলেও দৈবকৃপাপ্রাপ্ত ঐশ্বরীক প্রসাদের নতুন স্বরূপটি ক্রমে বাড়ির সবার কাছে প্রকাশ হতে থাকে। এর কিছুকাল পরেই তিনি পৃথিবীর অন্যতম মহাশক্তির আধার শক্তিপীঠ কামরূপ কামাখ্যায় যান। সেখানে শ্রীশ্রী ঠাকুরের সাথে তাঁর গুরুদেব "শ্রীঅনঙ্গদেব" -এর সাথে প্রথম সশরীরে দেখা হয়। সেখানে শ্রীশ্রী ঠাকুর আনুষ্ঠানিক দীক্ষা নেয়ার পরে গুরুর সাথে হিমালয় পরিভ্রমণ শুরু করেন। এই সময় তাঁর গুরুদেবের অতিপ্রাকৃত অলৌকিক শক্তির কৃপাবলে তিনি অনেক তীর্থক্ষেত্র, দেব-দেবী, আর মহাপুরুষদের দুর্লভ সান্নিধ্যলাভ করে নিজেকে পরিপূর্ণ এক ব্রহ্মবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে গুরুর আদেশে তিনি মানুষের সেবা করার জন্যে আবার লোকালয়ে ফিরে আসেন।

তিনি সংসারের পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে আধ্যাত্মিক মহামুক্তি তথা কৈবল্যপ্রাপ্তির জন্য "শ্রীনাম" বিতরণ শুরু করেন। "কলিকালে মহামন্ত্রই একমাত্র জীবাত্মা ও পরমাত্মার মহামিলনের পথ" এটাই ছিল শ্রীশ্রী ঠাকুরের অন্যতম বেদবাণী। শ্রীশ্রী ঠাকুরের আদর্শকে লালন ও ধারণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁর অসংখ্য একনিষ্ট ভক্তরা আজ "শ্রীনাম" এর মহাশক্তিকে অবলম্বন করে তাদের নিত্য- জীবনকে কলুষমুক্ত করার জন্যে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করে যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সংসার ত্যাগে ইচ্ছুক ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরে বলতেন, "আপনি সংসার ছাইড়া অরন্যে যাইয়া তপস্যা করতে চান? অরন্য কাকে বলে? টিলা কঙ্করময় বহু গাছ, লতা পাতার স্থানকে অরণ্য বলে। সেই খানে বাঘ, ভালুক প্রভৃতি বহু প্রকারের হিংস্র জন্তু বাস করে। তার সঙ্গে বাস করার যোগ্যতা আপনে অর্জন করেছেন কি? আপনে হিংসা, দ্বেষ দূর করিয়া সমভাবাপন্ন হইতে পারছেন কি? যদি তা না হইয়া থাকে তবে তাগ সঙ্গে বাস করবেন কি কইরা? আপনের হিংসা তার আকর্ষণ কইরা আনব।

তপস্যা করতে উপযুক্ত স্থান হইল সংসার অরণ্য। বহু তরুলতা, জন্তু-জানোয়ার যেখানে থাকে সেটা যেমন অরণ্য হয়, ঠিক তেমনি বহু জনের সমাবেশকেও সংসার অরণ্য বলা হয়। এই সংসার অরণ্যে আপনে আপনের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, আত্মীয়স্বজন, আড়া, পাড়া, পরশী, গ্রামবাসী, দেশবাসীর সঙ্গলাভ করছেন। এই সকলের নিকট আপনি ঋণী বইলাই তার সঙ্গ পাইছেন। তা না হইলে আপনে পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানেও জন্ম নিতে পারতেন। কিন্তু তা হয় নাই। কারন আপনে অন্যত্র ঋণী নন। আপনে এর নিকট ঋণী বইলাই এর ঋণ শোধ করবার জন্য এর সঙ্গ লাভ হইছে।

এর ঋণ যে কোন সময়, যে কোনো কালেই হউক আপনের শোধ করতে হইব। এই ভিন্ন গতি নাই। এদের প্রাপ্য এরা যে যেভাবে পারে, সেইভাবে আপনের নিকট থাইকা কড়ায় গন্ডায় আদায় কইরা তা লইব। তাই গঞ্জনা, দুঃখ, কষ্ট পাইবার ভয়ে এর ঋণ শোধ না কইরা এগোরে ফাঁকি দিয়া বনে জঙ্গলে গিয়া কি তপস্যা হইব? তপস্যা তো হইবই না, বরং আপনের ঋণের বোঝা আরও ভারী হইয়া যাইব। এইটা শুধু তপস্যা না, এইটা নিত্য তপস্যা।"

চট্টগ্রামে প্রয়োজন মতো এক খন্ড জমি পাওয়ার পর তাঁর আশ্রিত ভক্তদের অনেকেরই ইচ্ছা হয়েছিল বাংলা বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়ার শুভ দিনে যেন কৈবল্যধাম উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর ঘোষণা করলেন যে, আশ্রম উদ্বোধন করা হবে শনিবার, ১৯৩০-এর ২৬শে জুলাই (বঙ্গাব্দ ১৩৩৭, ১০ই শ্রাবণ)। কারণ, কয়েকজন শিষ্যের অনুমান - আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর আগেই দেখতে পেয়েছিলেন যে, ১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম বিদ্রোহ হবে এবং তারপরই তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঘটতে থাকবে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে ভয়াবহ সব নিপীড়নের ঘটনা। সেই কারণেই, তাঁর আশ্রিতেরা যাতে প্রতিকূল পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতে পারে, তিনি তাই তারিখটা পিছিয়ে দিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কয়েকদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত উপেনবাবু কলকাতা থেকে বাংলাদেশের ফরিদপুরে এসেছিলেন শ্রীশ্রীরামঠাকুরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। একদিন ভোরে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বলেন: 'চলুন, আজ রাতেই আমরা কলিকাতায় যাই'। উপেনবাবু রাজী হলেন কিন্তু ঠাকুরের প্রস্তাবের তাৎপর্য বুঝতে পারলেন না। ওদিকে, আগের দিন রাতে একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর গুলিতে নিহত হওয়ায় শহরের পরিস্থিতি তখন অত্যন্ত অস্থির, উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। পরেরদিন রাতে উপেনবাবুকে নিয়ে ঠাকুর কোলকাতায় পৌঁছে এন্টালীতে ডাক্তার নরেন ব্রহ্মচারীর বাড়িতে ওঠেন। কাকভোরে পুলিশ নরেনবাবুর বাড়িতে হানা দেয় এবং প্রত্যেককে জেরা করা শুরু করে। ঠাকুরও নিষ্কৃতি পাননি। পুলিশ উপেনবাবুকে লর্ড সিনহা রোডের কুখ্যাত কেন্দ্রীয় দফতরে নিয়ে যায়। যাওয়ার আগেই উপেনবাবু বাড়ির উপরতলায় উঠে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন। ঠাকুর তাঁকে বলেন, 'পাপ না করিলে তাপ লাগে না, আপনিত কোন পাপ করেন নাই; চিন্তা করিবেন না, আপনি নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিবেন'। ডাক্তার নরেন ব্রহ্মচারী সঙ্গে যান। একদিনের হয়রানির পর ডেপুটি কমিশনারের সামনে হাজির করা হলে, উপেনবাবুকে দু-তিনটি প্রশ্ন করা হয়। উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হয়ে ডেপুটি কমিশনার উপেনবাবুকে অযথা অসুবিধার মধ্যে ফেলার জন্য পুলিশ অফিসারকে তিরস্কার করেন এবং বিকেল পাঁচটায় উপেনবাবু অক্ষত অবস্থাতেই নরেনবাবুর এন্টালীর বাড়িতে ফিরে আসেন।

শ্রীশ্রী রামঠাকুর একান্তভাবে প্রচারবিমুখ এক পরমপুরুষ ছিলেন। তাঁর উপদেশ ও আধ্যাত্মিক পথ নির্দেশ পেতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাঁর চারপাশে সমবেত হয়েছেন। অবিভক্ত বাংলার মানুষ ঠাকুরের দিব্য ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন তাঁর দেহত্যাগের পরে কতিপয় ভক্তের লেখনী থেকে। তিনি আমাদের পরমারাধ্য 'শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ' বা 'শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ'। ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সর্বসাধারণের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ঘটাতে তিনি মানবদেহ ধারণ করেছিলেন। পার্থিব জীবনের অসহনীয় যন্ত্রণা, দুঃখ, অন্যায়-অবিচার ও নীতিদূষণ থেকে মানুষকে রক্ষা তথা উদ্ধার করতে তিনি ধরাধামে এসেছিলেন। জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ পেতে তাদের দিয়েছিলেন সঠিক পথের সন্ধান। তাঁর অনুগামী ভক্তদের মধ্যে বহুসংখ্যক মানুষ ছিলেন তথাকথিত 'অচ্ছুৎ' ও অন্য ধর্মাবলম্বী। তাঁরা প্রায় সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসেছিলেন তাঁর চৌম্বিক দিব্যসত্তা, তাঁর প্রেম ও মহানুভবতা আর তাঁর মধুর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের আধারটি ছিল নরের, কিন্তু ভেতরে ছিলেন স্বয়ং সত্যনারায়ণ। একমাত্র জীবের কল্যাণ আর মুক্তির জন্যেই তিনি দেহধারণ করেছিলেন। তিনি সবাইকে সবসময় নাম করার উপদেশ দিয়ে গেছেন। বলেছিলেন, নিজ কর্তব্যে কখনও অবহেলা করতে নেই । কর্তব্যে ক্রুটি হলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন। কর্ম্মও একটি যোগ, এটিও ঈশ্বরের কর্ম্ম। এখানে ফাঁকি দিরে ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়না। তিনি আরও বলেছেন, সততঃ সকল ভার গুরুর উপর দিয়ে সংসারের কাজ যখন যা উপস্থিত হয় করে যেতে হবে। পরিণামে গুরুই উদ্ধার করবেন। গুরুর ভরসা ছাড়া কলিতে শুধু তপস্যা দ্বারা শক্তি আহরণ করার ক্ষমতা কারুর নেই। ঠাকুরের কাছ থেকে দীক্ষা নেবার পরে এক শিষ্য জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই ছোট্ট মন্ত্র জপলে কি হবে? ঠাকুর সহাস্যে বলেছিলেন বিশ্বেস করে জপলে যা চান তাই হবে, দেখুন বটগাছের বীজ কত ছোট, কিন্তু তা যত্ন করে লালন

করলে কত বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়। কথাটা ওই ভদ্রলোকের ঠিক বিশ্বেস হয়নি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এই নাম জপলে আমি কি চোখ বন্ধ করে আমার বাড়ী যেতে পারবো? ঠাকুর বললেন, পরখ করেই দেখুন না। ভদ্রলোক তখন উত্তর কোলকাতায় দিনে দুপুরে অত গাড়ী আর লোক চলাচলের মধ্যে প্রায় ১ মাইল পথ ঠাকুরের দেয়া নাম সরল বিশ্বাসে জপতে জপতে চোখ বন্ধ করে হাঁটতে থাকেন। কিছুক্ষন পর তিনি হঠাৎ হোঁচট খাওয়াতে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেন তার বাড়ীর সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। পরের দিন এসে তিনি ঠাকুরের কাছে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ ধরনের বহু বহু ঘটনা আছে যা এখানে লিখে শেষ করা যাবে না।

একদা যুক্তিবাদী ডাঃ যতীন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত কথা প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রী শ্রী রামঠাকুরের আধ্যাত্ম জগতের দু'খানি পত্র পড়তে দেন। পত্রগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "যতীন! মানুষে বলে সমুদ্রের কোন কূল কিনারা নাই। আমি বলি সমুদ্রেরও একটা কূল আছে। কিন্তু তোমার ঠাকুরের কোন কূল কিনারা নাই।" কথা সাহিত্যিক শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসলে আর উঠতে ইচ্ছে করেনা, বড় অসময়ে তাঁর সাথে আমার দেখা হয়ে গেল।" আধুনিক সমাজ সংস্কারের এক সার্থক রূপকার ছিলেন শ্রীশ্রী রামঠাকুর। ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানসূচক জবাব তিনি যে সব চিঠিতে দিয়েছেন, তা নিয়ে ডক্টর ইন্দুভূষণ বন্দোপাধ্যায়, পিআরএস, পিএইচডি তিন খণ্ডে "বেদবাণী" হিসেবে সংকলন করে গেছেন। শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের যে কোন শাখায় ঠাকুর সম্পর্কে লেখা প্রচুর বইও অত্যন্ত সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। উৎসাহী পাঠক অনায়াসে শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম থেকে এসব বই সংগ্রহ করতে পারেন কিংবা বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু তথ্য জেনে নিতে পারেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মস্পর্শী মধুর কথাগুলো আমাদের প্রাণে সবসময় আনন্দধারা বইয়ে দেয়। জন্ম জন্মান্তরে আমি যেন তাঁর শ্রীচরণের দাসানুদাস হতে পারি, এই প্রার্থনা। জয় গুরু জয় রাম। সর্বং রামময়ং জগৎ।

নমঃ শ্রীরামচন্দ্রায় অজ্ঞানতমোহারিণে।
কলিকলুষবিনাশকায় তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।
নমস্তে কৈবল্যনাথায় শিবশক্তি স্বরুপিণে।
আশ্রিতানাং মুক্তিদাত্রে তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।

ঋণঃ
১) রামঠাকুরের কথা - ডঃ ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি আর এস
২) শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেব - শ্রী শুভময় দত্ত
৩) সাধুদর্শন ও সৎসঙ্গ - ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ, পদ্মবিভুষণ
৪) শ্রীশ্রী রামঠাকুর - শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম, যাদবপুর, কলকাতা।
৫) শ্রীশ্রী কৈবল্যধাম আশ্রম, চট্টগ্রাম।
৬) লীলা মাধুরী

(লেখক: অধ্যাপক, সেন্টেনিয়াল কলেজ, টরন্টো)

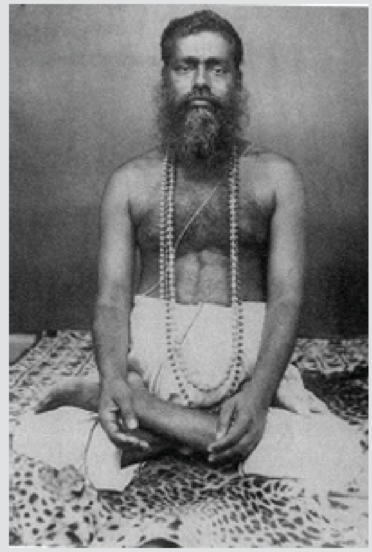

বহু সরার পূর্ণ জলে এক সূর্য্য যে বহু হয়,
তেমনি মায়ার খেলায় মায়ার মেলায়
সবই দেখি মায়াময়।

আমার আমার করি মিছে কিছুই তো রে আমার নয়,
বিপদ হলে যাবে ফেলে পাবে না আর খুঁজে তায়;
বিপদ গেলে আসবে ছলে, সে ছল ধরা বিষম দায়
ধরতে গেলে পড়বে ফেরে কান্নার জোরে ভুলাবে তোমায়॥

শ্রী শ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব